সংখ্যা-১-৪
P 36,233
UNIVERSITY OF CALCUTTA
LIBRARY
THE ADVANCEMENT OF LEARNING
UNIVERSITY OF CALCUTTA

৫ম ভাগ।] [২য় সংখ্যা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য।

দ্বিজ রামচন্দ্র একজন সৎকবি, তাঁহার দুর্গামঙ্গল কাব্যের কতিপয় কবিতা আমার নিকটে বড়ই মধুর বোধ হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি এই কাব্যের বিষয়টী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের াননীয় সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণের গোচরে আনয়নের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি।

এই কাব্য খানি প্রাচীন, কিন্তু 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'-লেখক র্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য' নামক গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার বিষয় কিছু উল্লেখ করেন নাই, সম্ভবতঃ এই পুস্তকখানি উক্ত দুই গ্রন্থকারের হস্তগত হয় নাই। এই কাব্যখানি গোয়ালন্দ উপবিভাগের অন্তর্গত হমদমপুর পোষ্ট আফিসের অধীন মূলঘর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে হস্তলিখিত বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে চাপা পড়িয়া ছিল, বিগত অগ্রহায়ণ মাসে আমি তাঁহার নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছি। এই পুস্তকখানি তাঁহার পিতা স্বর্গীয় —গালোকচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় পাঠ্যাবস্থায় নবদ্বীপ কিংবা ত্রিবেণী হইতে নকল করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী হইয়াও ইহার ভাষা-বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ১৭৪২ শকাব্দে বাচস্পতি মহাশয় ৭১ বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন, যদি তিনি পাঠ্যাবস্থায় ২৫ বৎসর বয়সে এই গ্রন্থখানি নকল করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময় হইতে ১২৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

এই কাব্যের রচয়িতা কবিবর রামচন্দ্র আপন জন্ম সময় অথবা গ্রন্থ-রচনার কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। এই গ্রন্থের লেখা হইতে যাহা অনুমান করা গিয়াছে, নিম্নে তাহাই বিবৃত হইল।

কবিবর রামচন্দ্র তাঁহার কাব্যের মধ্যে এক স্থানে ফিরিঙ্গী ও ফরাসী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ;—

"কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস।
দেখে কাঁপে কায়, যায় জীবনের আশ॥"

এখানে ফিরিঙ্গী শব্দে পোর্ত্তুগীজ, আর ফরাস অর্থে ফরাসী অথবা ফিরিঙ্গি-ফরাস্ বলিতে শুধু ফরাসী জাতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, উহা ঠিক বুঝা যায় না। এই কাব্যের কোথাও ইংরেজ কিংবা ইংরেজ রাজত্বের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, প্রত্যুত যে ভাবে যবন শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, উহাতে এই কাব্যখানি যে মুসলমান রাজত্বের সময়ে ফরাসীদিগের বঙ্গদেশে আগমনের পর বিরচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। মুসলমান সম্রাট্ অরঙ্গজেবের অধিকার-কালে সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশ শাসন করেন, তখন অর্থাৎ * ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা চন্দন-নগরে কুঠী স্থাপন করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান, সময় হইতে ২২৫ বৎসর অথবা উহার ২। ১ বৎসর পরে এই কাব্যখানি প্রণয়ন করা হইয়াছিল। উক্ত দুই পংক্তি পদ্য ও ভাষা দৃষ্টে বোধ হয় দুর্গামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবিবর রামচন্দ্র অন্নদামঙ্গল-প্রণেতা কবিবর ভারতচন্দ্রের অনেক পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ উভয়েই যদিও সংস্কৃত কাব্য অলঙ্কার-শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, তথাপি পরস্পরের ভাষার অনেক তারতম্য আছে। কবিবর রামচন্দ্রের রচনা ভারতচন্দ্রের রচনার ন্যায় সুমার্জ্জিত নহে। আর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ১১১৯ সালে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ১৮৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন †। তিনি যদি অনুমান ৩০ বৎসর বয়সে অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময় হইতে ১৫৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্নদামঙ্গল প্রণীত হইয়াছিল। অতএব এই কাব্য যে অন্নদামঙ্গল অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ হইতে পারে না। কবিবর রামচন্দ্র দুর্গামঙ্গল কাব্যের মধ্যে যেরূপে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল ;—

"গরিটি সমাজ ধাম, গোপাল মুখুটী নাম, তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় তিন, জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন, গৌরী-গুণ করিল রচন॥"

অন্য একস্থলে লিখিয়াছেন ;—

"জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ, মেদন-মল্লানুরাগ, তার মধ্যে হরিনাভি গ্রাম।
তাতে কবি নিজ বাসে, শ্রীদুর্গামঙ্গল ভাষে, দ্বিজ কুলে রামচন্দ্র নাম।"

অপর একস্থলে লিখিত আছে ;—

"হরিনাভি ধাম, দ্বিজ বিনোদরাম, তাহার তনয়াসুত।
পাঁচলী প্রবন্ধে, কহে রামচন্দ্রে, সদাই বিনয়যুত।"

---

* "সায়েস্তা খাঁ তিন বৎসর ব্যতীত ১৬৬৪ খৃঃ হইতে ১৬৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করেন। তাঁহার সময়ে ফরাসীরা চন্দন নগরে (১৬৭৩ খৃঃ) এবং ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় কুঠী স্থাপন করেন।"

(রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস ৪১ পৃঃ)

† "ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। ইনি ১১১৯ সালে (১৭১২ খৃঃ) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'ভুরসুট' পরগণার মধ্যে পাণ্ডুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন।" (শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত চরিতাষ্টক)

এই সকল লেখা হইতে বুঝা যাইতেছে, কবি রামচন্দ্র অনুমান ২২৩ কি ২২৪ বৎসর পূর্ব্বে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ হরিনাভি গ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের মুখুর্য্যে কি মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতামহের নাম গোপাল মুখুটী, পিতার নাম রামধন মুখুটী। ইঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন, তন্মধ্যে কবিবর রামচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ। তাঁহার মাতামহ দ্বিজ বিনোদরামও হরিনাভিতেই বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় বলেন, "পূর্ব্বে জাহ্নবী হরিনাভির পশ্চিমভাগ দিয়া প্রবাহিত ছিলেন, এখন সরিয়া গিয়াছেন, উহার সামান্য চিহ্নমাত্র আছে।" কবির পরিচয় এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে।

এখন দেখা যাউক, এই কাব্যের 'দুর্গামঙ্গল' নাম কেন হইয়াছে? শাস্ত্রবাক্যে ও হিন্দুধর্ম্মে একান্ত আস্থাবান্ কবিবর রামচন্দ্র বঙ্গসমাজে পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা ও দুর্গানবমীব্রতের উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর মধ্যে দুর্গাপূজা ও দুর্গানবমীব্রতের বর্ণনা করিয়াছেন, এই জন্য কাব্যের দুর্গামঙ্গল নাম হইয়াছে।

এই কাব্যখানি হস্তলিখিত পুঁথির পাতার ১১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত প্রসিদ্ধ নলোপাখ্যান অবলম্বনে মহাকবি শ্রীহর্ষ প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় 'নৈষধ-চরিত' নামে প্রসিদ্ধ মহাকাব্য রচনা করেন। কবিবর রামচন্দ্র ঐ বিবরণ অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা ভাষায় 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যের উপাখ্যান মহাভারতে যেরূপ আছে, শ্রীহর্ষ মনোহর কল্পনার সাহায্যে উহাকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ও নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। কবিবর রামচন্দ্র উহার উপর আর একটু কল্পনা ও তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজের একটী নিখুঁত চিত্র সম্বলিত করিয়া 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের অবয়ব গঠন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ নলদময়ন্তীর বিবাহ-বর্ণন করিয়াই 'নৈষধ-চরিত' শেষ করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত কবি 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যে নলোপাখ্যানের সমুদয় অংশই গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদাচার এবং হিন্দুরীতিনীতিপরিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে স্বধর্ম্মে আকর্ষণ করাই 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য রচনার উদ্দেশ্য। 'নৈষধ-চরিত'-প্রণেতা যে সময় তাঁহার কাব্য রচনা করেন, বোধ হয় তখন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল, শ্রীহর্ষ তাহার একটি চিত্র 'নৈষধ-চরিতের' ১৭শ সর্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কলির মুখে নাস্তিক বৌদ্ধগণের যুক্তি এবং দেবগণের মুখে আস্তিক ও হিন্দুগণের যুক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কলি বলিতেছে*,—কোনও বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকারের নিমিত্ত যাহা সৎবস্তু তাহাই ক্ষণিক, এই অনুমান দ্বারা জগৎকে অনিত্য বলিয়াছেন। আর বৃহস্পতি বলেন, অগ্নিহোত্র কর্ম্ম, তিন বেদ, মীমাংসা শাস্ত্র, ভস্ম দ্বারা তিলক,

---

* "কেনাপি বোধিসত্ত্বেন জাতং সত্ত্বেন হেতুনা। যদ্বেদমর্ম্মভেদায় জগদে জগদস্থিরম্॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ী তন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্। প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবো জল্পতি জীবিকাঃ॥
শ্রুতিস্মৃত্যর্থবোধেষু নৈকমত্যং মহাধিয়াং। ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা সা নোপেক্ষ্যা সুখোন্মুখী॥

এ সমুদয় বিবেকপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের জীবিকার উপায় মাত্র। মহাবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের শ্রুতি স্মৃতির অর্থ গ্রহণ বিষয়ে ঐকমত্য হইতেই পারে না, কেননা ব্যাখ্যা-বুদ্ধিবলে অপেক্ষা করে, যাহা সুখকর ব্যাখ্যা, উহা কোন প্রকারেই উপেক্ষা করা উচিত নহে। মৃত ব্যক্তি পরলোকে গিয়া স্বকীয় কৃতকর্ম্ম স্মরণ করে, তাহার শুভাশুভ কর্ম্ম পরলোকেও তাহার অনুসরণ করে, শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইলে মৃতব্যক্তির তৃপ্তি হয়, এ সকল ধূর্ত্ততামূলক কথায় কাজ নাই। সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী চাটুবাদকুশল পাণ্ডবদিগের কবি যে ব্যাস তাঁহার কথায়ও শ্রদ্ধা করা উচিত নহে; যেহেতু পাণ্ডবেরা যাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন, তিনিও তাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন, পাণ্ডবেরা যাহাদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকেই প্রশংসা করিয়াছেন। কলি এইরূপ বহু তর্কের দ্বারা আস্তিক মত-খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। উহার উত্তরে ইন্দ্রাদি দেবগণও অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকবি শ্রীহর্ষ ইচ্ছা করিয়াই যেন ঐ সকল যুক্তিকে তত দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন নাই। দেবগণ বলিতেছেন,—হে নাস্তিকগণ! পুত্রেষ্টিযাগ করিলে যে পুত্র জন্মে, ইহা ত সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহাদ্বারাও কি তোমাদের সন্দেহ নিরাস হইতেছে না? বেদোক্ত জল ও অগ্নি পরীক্ষা দিতে যে প্রত্যয় উহাই ত তোমাদের নাস্তিকী বুদ্ধিকে গলহস্ত প্রদান করিয়া নিষ্কাশিত করিতেছে, অতএব তোমাদিগকে ধিক্। কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্মদৈত্যাদি ভূতযোনি আশ্রয় করিয়া যে গয়া শ্রাদ্ধ যাচ্ঞা করে, সকল দেশেই ত এ প্রমাণ পাওয়া যায়, ইহাতে বিশ্বাস কর না কেন নাম ভ্রমে কোন ব্যক্তিকে যমদূতেরা যমসদনে উপস্থিত করিলে, যম তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন, সেই ব্যক্তি পুনরায় স্বদেহে উপস্থিত হইয়া জীবনলাভ করতঃ প্রতিবেশিদিগের নিকটে যে যমলোকের কথা বলে, তাহাতেও কি তোমাদের পরলোকে বিশ্বাস হয় না * দেবগণ এইরূপ অনেক যুক্তি নাস্তিক ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী কলির নিকটে বর্ণনা করিয়াছিলেন। কবিবর রামচন্দ্র ওরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পর বিতর্ক বর্ণনা না করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, কি মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়াছেন। প্রকারান্তরে হিন্দু সাধারণের স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পরে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

মৃতঃ স্মরতি কর্ম্মাণি মৃতে কর্ম্মকলোর্ম্ময়ঃ। অন্নভুক্তে মৃতে তৃপ্তিরিত্যলং ধূর্ত্তবার্ত্তয়া॥
পণ্ডিতঃ পাণ্ডবানাং স ব্যাসশ্চাটুপটুঃ কবিঃ। নিনিন্দ তেষু নিন্দৎসু স্তুবৎসু স্তুবতাং সকিং॥"

* "পুত্রেষ্টিপ্রেতকারীরী মুখা দৃষ্টফলা মুখা। নবঃ কিং ধর্ম্ম সন্দেহ সন্দেহ জয় ভানবঃ॥
জলানলপরীক্ষাদৌ সম্বাদো বেদবেদিতে। গলহস্তিত নাস্তিক্যাং ধিক্ ধিয়ং কুরুতে নতে॥
যাচতঃ স্বং গয়া শ্রাদ্ধং ভূতস্মাবিশ্য কঞ্চন। নানাদেশে জলো পঞ্চাঃ প্রত্যেবিন কথাঃ কথং
মীতানাং যমদূতেন নাম ভ্রান্ত্যেরপাগতৌ। শ্রদ্ধৎসে সংবদন্তীং ন পরলোককথাং কথং॥"

(নৈষধচরিত ১৭শ সর্গ

নল শরীরে কলির প্রবেশ।

"কলির হইল বশ, ত্যজে ধর্ম্ম কর্ম্ম রস,
বিষম স্বভাব ভাবে ভূপ।
ক্ষণে ক্ষণে হয় ক্রোধ, ধর্ম্ম পথ কৈল রোধ,
কামে চিত্ত মজে নল ভূপ॥
মুড়ায় মাথার কেশ, দেব কর্ম্মে সদা দ্বেষ,
পিতৃলোকে নাহি দেয় জল।
বলে ভণ্ড যত দ্বিজ, মিথ্যা কর কার পূজো,
প্রবঞ্চনা করয়ে কেবল।
মরা মাতা পিতা তরে, ভ্রমে লোক শ্রাদ্ধ করে,
সে কেবল বুঝিবার চুক।
মদনমঙ্গল গীত, শুনে সদা আর্দ্রচিত,
প্রজার হিংসায় নাহি সুখ॥
রাজার পাপেতে রাজ্য, বিষম হইল কার্য্য,
ধর্ম্ম নাহি মানে প্রজাগণে।
ব্রাহ্মণ আচার ভ্রষ্ট, পাপেতে পূর্ণিত রাষ্ট্র,
বেদপাঠ করে শূদ্রগণে॥
স্বামীনিন্দা করে ভার্য্যা, কামিনী হইল পূজ্যা,
পরভাবে জনক জননী।
মিথ্যাকথা প্রবঞ্চনা, ভ্রষ্ট নষ্ট সর্ব্বজনা,
কুলবধূ নীচেতে গামিনী॥
গোহিংসা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা, চৌর্য্য কর্ম্মে সদা চেষ্টা,
ব্রাহ্মণের যবন আচার।
যাগ যজ্ঞ সদা হীন, ধর্ম্মে রসবীর ক্ষীণ,
শূদ্রের তপস্যা ব্যবহার॥
নব বধূ ঘরে আসি, শাশুড়ীকে করে দাসী,
সুত পিতায় নাহি দেয় অন্ন।
ব্রাহ্মণে বেচয়ে দুগ্ধ, পরদারে সদা মুগ্ধ,
নাহি বাছে জাতিভেদ ভিন্ন॥
বিষম হইল নীত, দেখি কলি হরষিত,
সমুচিত ফল দিব নলে।

দ্বিজ রামচন্দ্র কয়, গৌরী গুণ সুধাময়,
রহ মন চরণ-কমলে ॥

উদ্ধৃত কবিতায় যে মস্তক-মুণ্ডন, দেবকর্ম্মে দ্বেষ, পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে অবিশ্বাস প্র যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহা কোন্ কোন্ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া ঠিক বুঝিতে পারা না। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে এক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত বৌদ্ধভিক্ষু ও ভে ধারী বৈরাগীগণ মস্তক মুণ্ডন করেন, পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন না। কিন্তু এক বৌদ্ধ ভিন্ন বৈ সম্প্রদায়কে দেবকর্ম্মে দ্বেষ করিতে দেখা যায় না। আবার ২০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গদে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এমতও অনেকে বিশ্বাস করেন না। কবি বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্বন্ধে মত পোষণ করিতেন, তাহাও অনুমান করা দুরূহ। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন ;—

'সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবপ্রিয়,
মহেন্দ্র সমান ক্ষিতিপতি।'

এখানে বৈষ্ণব অর্থে যদি বিষ্ণুর উপাসক বা বিষ্ণুভক্ত এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ ক যায়, তাহা হইলে বোধ হয় শাক্ত কবি মহাত্মা চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ভেকধা বৈরাগীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান স- বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা, যখন এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়, ত সাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ছিল না।

কাব্যের সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় একরূপ বর্ণিত হইল, এখন এই কাব্যের উপাখ্যানাতিরি ঘটনা, নায়ক, নায়িকা, রস, গুণ, দোষ, রীতি ও অলঙ্কার প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে

নিষধনগরের অধিপতি রাজা বীরসেন সন্তান না হওয়ায় দুঃখিত। প্রতিদিন মহাদে আরাধনা করেন। শিব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্র বর প্রদান করিলেন, কিন্তু দিয়াই তাঁহার মনে চিন্তা হইল, সর্ব্বগুণান্বিত কোন্ ব্যক্তি ভূতলে জন্মগ্রহণ করি একদা কুবেরপুত্র জয়ৎসেন স্বীয় প্রিয়তমা চন্দ্রমালার সহিত কৈলাসশিখরে মহাদে কাননে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময় মহাদেব পার্ব্বতী সহিত সেখানে উপস্থিত, কুবেরপুত্রের চপলতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কৈলা অবস্থানের যোগ্য নহ, যেহেতু তুমি পাপে আসক্ত, অতএব ভূতলে গিয়া জন্ম পরি কর।" অভিশাপ শ্রবণে কুবেরপুত্র কাঁদিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন, তাহাতে পার্ব্বতী দয়া হইল, তিনি জয়ৎসেনকে বলিলেন, 'বাছা ভয় নাই, তুমি ভূমণ্ডলে গিয়া জন্মগ্র কর, তোমার কীর্ত্তি ভুবন-বিখ্যাত হইবে।' চন্দ্রমালাকেও বলিলেন, 'সতি ? পৃথিবীতে জন্মিয়াও নিজ পতি প্রাপ্ত হইবে, তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি আমার প্রকাশ করিও।' তাহার পর জয়ৎসেন ও চন্দ্রমালা যথাক্রমে নিষধদেশে ও বিদর্ভে জন্মগ্র করিলেন। নলোপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং বাহুল্যভয়ে এখানে উ সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম না। মহাভারতে আছে, দময়ন্তীর গর্ভে নলের ইন্দ্রসেন না

পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। 'দুর্গামঙ্গলে' আছে, নলের জয়ন্ত নামে পুত্র ও চন্দ্রমুখী নামে কন্যা জন্মিয়াছিল; জয়ন্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া নল ও দময়ন্তী কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন।

এখন মহাভারতে ও নৈষধচরিতের সহিত এই কাব্যের কল্পনাগত যে সকল সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, উহার কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। নলোপাখ্যানে আছে, বিরহাতুর নল বনমধ্যে সুবর্ণের ন্যায় সুন্দর কতকগুলি হংসকে দেখিয়া উহার একটী ধরিয়াছিলেন*। নৈষধকার শ্রীহর্ষ স্বীয় কল্পনার সাহায্যে হংসগণের মধ্যস্থ একটী মাত্র সুবর্ণময় হংস তাহাদের স্বাভাবিক বিচরণস্থল কেলি-সরোবরে ক্রীড়া করিতেছিল, এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন†। এই হংসই নলরাজার বিবাহের ঘটক। কেন যে হংসের সুবর্ণময় দেহ হইয়াছে, তাহাও কবি হংসের মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন‡। কবিবর রামচন্দ্র এ স্থলে কল্পনা সঙ্গিনীর প্রিয়বন্ধু শ্রীহর্ষেরই অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন;—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা সরোবর-তীরে। অপূর্ব্ব হংসের মালা খেলা করে নীরে॥
লোহিত চরণ চঞ্চু সুবর্ণের পাখা। সরোবরে খেলা করে নিরমল রাকা॥
হংস দেখি আনন্দিত নৃপসুত সুখে। অল্পে অল্পে এক হংস ধরিল কৌতুকে॥"

আবার হংসের সহিত প্রথম কথোপকথনে কবি রামচন্দ্র শ্রীহর্ষের কথাগুলির প্রায় অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। নল হংসকে ধরিলে হংস বলিতেছে,—

"আমার দুঃখের কথা নাহি দিতে ওর। পক্ষিজাতি বটি কিন্তু বহুপোষ্য মোর॥
জনক জননী জরাগতিশক্তিহীন। নবীনপ্রসূতা বধূ অতি অল্পদিন॥
খুঁটে না খাইতে পারে যমক শাবকে। আমার বিহনে সবে বাঁচিবে কি শোকে॥§
কাতরে কহিছে হংস শুন মহারাজ। আমাকে বধিলে তোমার কিবা হবে কাজ॥
দেখিয়া সুবর্ণপক্ষ যদি বধ পাছে। এ হেন সুবর্ণ তোমার কত পড়ে আছে॥
সশৈল কানন পৃথ্বী তব অধিকার। লইতে আমার সোণা কিবা উপকার¶॥

---

* "স দদর্শ ততো হংসান্ জাতরূপ পরিষ্কৃতান্। বনে বিচরতাং তেষামেকং জগ্রাহ পাণিনা॥"
(মহাভারত বনপর্ব্ব)

† "পয়োধি লক্ষ্মীমুখি কেলিপল্বলে বিরংসুহংসীকলনাদসাদরম্।
স তত্র চিত্রং বিচরন্ত মস্তিকে হিরণ্ময়ং হংস মবোধি নৈষধঃ॥" (নৈষধচরিত ১।১১৭ শ্লোক)

‡ "স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অস্মাসুরূপাং তনুরূপকর্ত্তুং কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥" (নৈষধচরিত ৩।১৩ শ্লোক)

§ "মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।
গতিস্তয়োরেষ জনস্তমর্দ্দয়ন্ অহোবিধে ত্বাং করুণা ঋণদ্ধি ন॥" (নৈষধচরিত ১।১৩৫ শ্লোক)

¶ "ধিগস্তু তৃষ্ণাতরলং ভবন্মনঃ সমীক্ষ্য পক্ষাত্মম হেমজন্মনঃ।
ভবার্ণবস্তেব দুরাশয়ীকরৈঃ ভবেদমীভিঃ কমলোদয়ঃ কিয়ান্॥" (নৈষধচরিত ১।১৩০ শ্লোক)

হংস দময়ন্তীর নিকটে গিয়া নলের রূপ গুণের বর্ণনা করিলে, দময়ন্তী মনে মনে নলে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং যাহাতে নল নরপতি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন, তজ্জন্য হংসে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখানে কবি রামচন্দ্র যে যে স্থলে নৈষধকা কথার অনুকরণ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলেই মনোহর বোধ হয়, অন্যান্য স্থলে শ্রীহর্ষের হ নায়িকার মনের গভীর আবেগ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দময়ন্তী বলিতেছেন ;—

"তোমারে করিয়া সাক্ষী করিলাম পণ। সঁপিলাম তাঁর কাছে যৌবন জীবন ॥
সেই নরপতি যদি নাহি পাই স্থির। নাহি যদি মিলে মোরে ত্যজিব শরীর ॥
আপনি দেবেন্দ্ররাজ মোর কাছে আইসে। করিলাম সত্য নাহি যাব তার পাশে ॥
সময় বিশেষে কবে মনোযোগ রয়। অসময়ে কহিলে বিফল পাছে হয় ॥
যদি মুখ তিক্ত থাকে নাহি থাকে ক্ষুধা। সকল বিরস লাগে যদি খায় সুধা ॥
ক্রোধের সময় কিংবা অন্য মনে থাকে। হেনকালে মোর কথা না কহিবে তাঁকে ॥
স্বকার্য্য হইলে হংস কহে অতঃপর। পূর্ণ হবে অভিলাষ পাবে তাঁর বর ॥"

এই স্থলে নৈষধকার যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন নিম্নে টীকায় ঐ কয়টী কবিতা উদ্ধৃ করা হইল *।

মহাভারতে আছে, স্বয়ম্বর-সভায় ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণ এই চারি দেবতা নলের রূপধা করিয়া উপবেশন করিলে একাকৃতি পঞ্চপুরুষ বিলোকনে দময়ন্তী সন্দেহে আকুল হই দেবগণের শরণাগত হইয়াছিলেন। পরে দেবগণ দময়ন্তীর কাতর-প্রার্থনায় প্রসন্ন হই স্ব স্ব রূপ ধারণ করিলে দময়ন্তী নলের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন †। এ স্থলে নৈষধক

---

* "অনৈষধায়ৈব জুহোতি তাতঃ কিং মাং কৃশানৌ ন শরীরশেষাম্।
ইষ্টে তনূজন্মতনোঃ স নূনং মৎপ্রাণনাথস্তু নলস্তথাপি ॥
তদেকদাসীত্ব পদাদুদগ্রে মনীপ্সিতে সাধু বিধিৎসুতা তে।
অহেলিনা কিং নলিনী বিধত্তে সুধাকরেণাপি সুধাকরেণ ॥
শুদ্ধান্তসঙ্কোষনিতান্ততুষ্টে ন নৈষধে কার্য্যমিদং নিগাদ্যম্।
অপাংহি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা ॥
ত্বয়া নিধেয়া ন গিরো মদর্থাঃ ক্রুধা কদুষ্কে হৃদি নৈষধস্য।
পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস ॥
ধৃয়াতুরাসাহি মদর্থযাচ্ঞা কার্য্যা ন কার্য্যান্তরচুম্বিচিত্তে।
তদার্থিতস্থানবরোধনিদ্রা বিভর্ত্যবজ্ঞাচরণস্য মুদ্রাম্ ॥
বিজ্ঞেন বিজ্ঞাপ্যমিদং নরেন্দ্রে তস্মাত্ত্বয়াস্মিন্ সময়ং সমীক্ষ্য।
আত্যন্তিকাসিদ্ধিবিলম্বসিদ্ধ্যোঃ কার্য্যস্য কার্য্যস্য শুভা বিভাতি ॥"

(নৈষধচরিত ৩।৭৯-৮০, ৯৩-৯৬ শ্লোক

† "তান্ সমীক্ষ্য ততঃ সর্ব্বান্ নির্ব্বিশেষাকৃতীন্ স্থিতান্। সন্দেহাদথ বৈদর্ভী নাভ্যজানন্নলং নৃপম্ ॥
শ্রুতানি দেবলিঙ্গানি তর্কয়ামাস ভারত। দেবানাং যানি লিঙ্গানি স্থবিরেভ্যঃ শ্রুতানি ৫
তানীহ তিষ্ঠতাং ভূমাবেকস্থাপি ন লক্ষয়ে। সা বিনিশ্চিত্য বহুধা বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥"

শ্রীহর্ষ দময়ন্তীর সখীরূপে সরস্বতীকে স্বয়ম্বরস্থলে আনয়ন করিয়া সুন্দর কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন*। বাঙ্গালা মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন, দময়ন্তীর প্রার্থনায় দেবগণ স্ব স্ব চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনিমিষ নয়ন, স্পন্দহীন দেহ এবং অঙ্গের ছায়া না দেখিয়া দময়ন্তী তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও তত্তৎ চিহ্ন-বিহীন নলকে বরমাল্য দান করিয়াছিলেন†। কবিবর রামচন্দ্র নৈষধকারের অনুকরণ করিতে গিয়া সরস্বতীর পরিবর্ত্তে ভগবতী কাত্যায়নীকেই দময়ন্তীর সখীরূপে স্বয়ম্বর-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন, যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করা গেল—

"বাসব বরুণ বহ্নি যম চারিজনে। ভীমের তনয়া প্রতি কোপ আছে মনে॥
যথায় বসিয়া আছে নল নরপতি। বসিল দেবতা তথা নলের আকৃতি॥
একাকৃতি পঞ্চ নল বসিয়া সভায়। দেখিয়া ভীমের কন্যা হইল বিস্ময়॥
একাকৃতি পঞ্চ নল সভা মধ্যে বসি। ভাবিত হইল বড় হেরিয়া রূপসী॥
কারে দিব বরমাল্য কেবা হবে নল। বুঝিতে না পারি আমি কে করিল ছল॥
শ্রবণে কহেন তার হরের গৃহিণী। কি লাগিয়া অন্যমনা হইলা স্বজনি॥
পৃথিবীমণ্ডল মাঝে নাহি যার ছায়া। কখন সে নল নহে দেবতার মায়া॥
সভা মাঝে বিরাজে নরেন্দ্র দক্ষ মুখে। মাল্যদান কর সখি পরম কৌতুকে॥"

এতক্ষণ এই কাব্যের কল্পনাগত বিষয় সকল বিবৃত হইল। সংপ্রতি এই কবির বর্ণনা-শক্তি ও ভাষার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। কবি রামচন্দ্রের রচনায় মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই ত্রিবিধ গুণই দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচনার উৎকৃষ্ট অংশগুলি স্বাদিরসে পরিপূর্ণ—সুতরাং ইচ্ছানুসারে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। মাধুর্য্য-গুণ-বিশিষ্ট বর্ণনা যথা,—

"এক দিন সখী সঙ্গে, দময়ন্তী মনরঙ্গে,
পুষ্প-বনে করিল প্রবেশ।
স্তবকে স্তবকে ফুল, ভ্রমে গন্ধে অলিকুল,
গন্ধবহ গমন-বিশেষ॥

শরণং প্রতি দেবানাং প্রাপ্তকালমমন্যত।
নিশম্য দময়ন্ত্যাস্তৎ করুণং পরিদেবিতম্।
যথোক্তকক্রিয়ে দেবা সামর্থ্যং লিঙ্গধারণে॥" (মহাভারত বনপর্ব্ব।)

* "সাক্ষাৎ কৃতাখিল জগজ্জনতা চরিত্রা তত্রাধিনাথমধিগত্য দিবস্তথা সা।
উচে যথা স চ শচীপতিরভ্যধায়ি প্রাকাশি তস্য ন চ নৈষধকায়মায়া॥" (নৈষধচরিত ১৩শ সর্গ।)

† "বৈদর্ভীর নির্ণয় জানিয়া দেবগণ। আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন॥
অনিমিষ নয়ন যে স্পন্দহীন কায়া। অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া॥
বৈদর্ভী জানিলা তবে এ চারি অমর। নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥"
(কাশীরামদাসের মহাভারত—বনপর্ব্ব।)

পাতিয়া অঞ্চল পাঁতি, তুলে পুষ্প নানা জাতি,
কেহ দিল খোপায় চম্পক।
বকুল কুসুমে মালা, গাঁথে হার কোন বালা,
কোন সখী তুলিল অশোক॥
কোন সখী গিয়া তুলে, মল্লিকা মালতী ফুলে,
হার গাঁথি পরিল গলায়।
কোন সখী হার নিল, দময়ন্তী গলে দিল,
কোন সখী সখীরে সাজায়॥
বদ্ধ ছিল হংস সত্যে, হেনকালে গেল মর্ত্যে,
উপনীত দময়ন্তী কাছে।
হংস হেরি রাজকন্যা, সঙ্গে কেহ নাহি অন্যা,
ধরিতে ধাইল পাছে পাছে॥"

ওজোগুণের সামান্য উদাহরণ যথা,—

"উপনীত হইল গিয়া গড়ের দুয়ার। মাতঙ্গ তুরঙ্গ বাঁধা হাজার হাজার॥
শেফাই সঙ্গীন চড়া পাহারা ফটকে। কাওয়াজ্ আওয়াজ্ ঘন ধড়কে ধড়কে॥
কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস্। দেখে কাঁপে কায় যায় জীবনের আশ॥
ঘন ঘন গোলা ছোটে চোটে ফাটে মাটী। ক্ষণেকে ক্ষণেকে জয়ঢাকে মারে কাটী॥
দ্বিতীয় গড়েতে গিয়া দেখে নরপতি। দুয়ারেতে দ্বারপাল বসিয়া সংহতি॥
রাহুত মাহুত কত শত রজপুত। বিষম ভীষণ কায় শমনের দূত॥
মাথায় পাগড়ী টেড়ি লাল কালা পীত। সঘনে মোচড়ে গোঁফ জুলপী-শোভিত॥
জবা জিনি দুই আঁখি আসবে আকুলি। গভীর বচন সদা অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি॥
কটি-ধটি-ধরা ঘোড়া করে তলোয়ার। ঢালি পাকি খেলে কেহ ঘুরাইয়া ঢাল॥
ঘন ঘন ফেলে লড় ঘুরায় মুদ্গর। মালশাটে ফাটে মাটী ভেঙ্গে হয় চুর॥
গগনে উড়ায় বাঁশ ঘন ঘন লোফে। কিলাকিলি হুড়াহুড়ী পরস্পর কোপে॥
ক্রমে ক্রমে সাত থানা করিল পশ্চাৎ। পুরী মাঝে উপনীত হইল নরনাথ॥"

প্রসাদগুণের উদাহরণ যথা,—

"নিদ্রাচ্যুত রূপবতী, নিকটে না দেখি পতি,
দময়ন্তী হইল বিস্ময়।
রাজীব কম্পিত তনু, রাহুগ্রস্ত যেন ভানু,
শুকাইল সরস হৃদয়॥
আছিলাম একসাথ, কোথা গেলে প্রাণনাথ,
ভয়ে প্রাণ স্থির নহে ধড়ে।

শরীর হইল ক্ষুণ্ণ, চারি দিকে দেখি শূন্য,
মোহ হয়ে ভূমিতলে পড়ে ॥
ডাকে রামা অবিশ্রান্ত, কোথা গেলে প্রাণকান্ত,
শান্ত কর দেখা দিয়ে মোরে।
ক্ষমা কর পরিহাস, যায় হে জীবন আশ,
মরি আমি কানন ভিতরে ॥"

কাব্যের গুণের কথা বলা হইল। এখন ইহার দোষের কথা কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে। এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে ২।৪টী ব্যাকরণ দোষ দৃষ্ট হয় যথা,—

১—প্রসব হইল কন্যা শরদের কান্তি।
২—দময়ন্তী হইল বিস্ময়।
৩—মোহ হয়ে ভূমিতলে পড়ে।
৪—পাপেতে পূর্ণিত রাষ্ট্র।

উদ্ধৃত স্থলসমূহে "প্রসব, বিস্ময়, মোহ" প্রভৃতি বিশেষ্য পদগুলি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। "পূর্ণিত" এই পদটী ব্যাকরণদুষ্ট। কারণ পূর্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে, পূরিত আর পূর্ণ এই দুই পদ হইবে। এতদ্ভিন্ন এই কাব্যে অশ্লীলতাদোষও যথেষ্ট, তবে এই কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের স্থলবিশেষের বর্ণনার ন্যায় কুত্রাপি অনবগুণ্ঠন আদিরসের অবতারণা করেন নাই। অনেক স্থলে অতি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ কবিতাগুলি অনাবশ্যকীয় আদিরসে কলুষিত করা হইয়াছে। আর এই কাব্যের নায়িকা দময়ন্তীকে অত্যন্ত তরলমতির ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বিরহে অধীর হইয়া কোকিল ভ্রমর প্রভৃতির উপর বড়ই নির্ম্মাস্তিক তিরস্কার করিয়াছেন, সে তিরস্কারের বর্ণনা অতি দীর্ঘ এবং উহার ভাষাও অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং লজ্জাজনক, এ সমুদয়ই নৈষধকাব্যের অনুকরণের ফল।

বলা বাহুল্য এই কাব্য আদিরস-প্রধান। ইহাতে গৌণভাবে করুণরস প্রভৃতির বর্ণনা আছে। এই কাব্যের নায়ক নল। অলঙ্কারশাস্ত্রে ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরললিত নামে যে চারি শ্রেণীর নায়কের বিষয় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে নল ধীরপ্রশান্ত নায়কের লক্ষণাক্রান্ত। কবি নায়কের চরিত্র বেশ কোমল- ও উদারতা পূর্ণ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইনি কোন অবস্থায়ই আপন মহত্ত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। নল দেবগণের দৌত্যভার গ্রহণপূর্ব্বক বিদর্ভরাজের অন্তঃপুরে গিয়া দময়ন্তীর নিকট দেবগণের প্রার্থনা জানাইলে তিনি কোন প্রকারেই উক্ত প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। তখন নল বলিতেছেন,—

"ঈষৎ হাসিয়া নল কহিছে বচন। অতি অনুচিত কথা কহ কি কারণ ॥
ইহলোকে যাগযজ্ঞ ব্রত লোক করে। কামনা সবার অন্তে স্বর্গভোগ পরে ॥
শত অশ্বমেধ ফলে হয় বজ্রধারী। তাহার রমণী হবে মান ভাগ্য করি ॥"

নল যাঁহার লাভের আশায় ব্যাকুলভাবে দ্রুতগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক বিদর্ভ নগরে

গমন করিতেছিলেন, দেবগণের দৌত্যকার্য্যে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সেই একমাত্র প্রিয়তমা দময়ন্তীর নিকটে দেবতাদের অসমক্ষে ঐরূপ অকপটভাবে প্রার্থনা করা অতি মহত্ত্বের পরিচায়ক। এই কাব্যের নায়িকা দময়ন্তী,—তিনি স্বীয়া নায়িকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দোষের মধ্যে বড় প্রগল্‌ভা, যে সকল কথা সখীদের নিকটে বলিতে গিয়াও লজ্জায় মস্তক নত করা উচিত, তিনি অনায়াসে হংসের নিকটে ও দৌত্যকার্য্যে ব্রতী নলের নিকটে সেই সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সখীগুলি আবার ততোঽধিক নির্লজ্জ। নলের বিরহে দময়ন্তীর ভাবান্তর দর্শনে তাহারা উদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে এমন ভাবে তিরস্কার করিয়াছিল যে, তাহাদের বয়সের অযোগ্য ঐ সকল কথা পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দুর্গামঙ্গল-কাব্য-রচয়িতা একজন কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই কাব্যে অনুপ্রাস, উপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অনেক অলঙ্কারযুক্ত পদ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল। এই প্রকার উৎপ্রেক্ষাকে মালারূপিণী উৎপ্রেক্ষা বলা যাইতে পারে। যথা,—

"সভা মধ্যে আসিয়া বসিল গুণাকর। তারকার মাঝে যেন শোভে শশধর॥
পতঙ্গ উদয়ে যেন পতঙ্গ লুকায়। গরুত্মান্-মাঝে গরুত্মান্ শোভা পায়॥
গর্দ্দভ নিকটে যেন তুরঙ্গের শোভা। মক্ষিকা নিকটে যেন গুঞ্জে মধুলোভা॥
ছাতারিয়া মাঝে যেন খঞ্জনের নৃত্য। প্রভুর অগ্রেতে যেন শোভা পায় ভৃত্য॥
খদ্যোতের তেজ লুপ্ত হয় দিবাভাগে। কুরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ কুক্কুরের আগে॥
নলের তেজেতে সবে হইল বিবর্ণ। রাঙ্গ মাঝে রূপা যেন পিতলে সুবর্ণ॥
কাচ মাঝে হীরা যেন স্ফটিকে মুকুতা। শেকুল কণ্টক মাঝে মালতীর লতা॥
সারসের শোভা ক্রৌঞ্চ কুমুদের মাঝে। রাজহংস শোভা পায় কাদম্বসমাজে॥
হেন্তাল কানন মাঝে শোভে নারিকেল। গাবের নিকটে যেন শোভা পায় বেল॥
গ্রহরূপ সভামাঝে শোভা পায় নল। রামচন্দ্র কহে দুর্গা পদে দেহ স্থল॥

এই কাব্যের বর্ণনায় ছন্দের চাতুর্য্যও নিতান্ত অল্প নহে। পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, ভঙ্গপয়ার, চৌপদী, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অনেকগুলি ছন্দ এই কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাহুল্যপ্রযুক্ত ছন্দের উদাহরণ উদ্ধৃত হইল না।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এই কাব্যে দুইশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীসমাজের একটী সুন্দর চিত্র আছে। এখানে দময়ন্তীর বিবাহের বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমান সময়ের দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় আচার ব্যবহারে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। আলিপনা দেওয়া, জলসাধা, গায়ে হলুদ, আইবড়-ভাত, চেদিরাজ বসুর পূজা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সাতপাক প্রদক্ষিণ প্রভৃতি সমুদয়ই বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ছিল। যথা,—

"প্রভাতে উঠিয়া, হুলাহুলী দিয়া,
চলিল সহিতে রাণী॥
হুলাহুলী মুখে, রমণী কৌতুকে,
হেমঘট কার করে।
তৈল গুয়া পান, করিতে সম্মান,
চলে প্রতিবেশী ঘরে॥
আলিপনা দিয়ে, হেমঘট লয়ে,
জোড়-করে রাণী কয়।
কৃপা করি সবে, মোর বাড়ী যাবে,
দময়ন্তী-পরিণয়॥
গৃহস্থের নারী, ঘটে দিল বারি,
লৈল তৈল গুয়া পান।
হর্ষে রাজরাণী, লয়ে সয়া পানী,
নিজালয়ে পরে যান॥"

জলসাধার কথা শেষ হইল, বিবাহের বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে,—

"কদলীর তরু আরোপিল আগে আগে। বসাইল দময়ন্তী তার মধ্যভাগে॥
সাতপাক প্রদক্ষিণ করি রামাগণে। স্নান করাইল পরে মহাহর্ষ মনে॥
মঙ্গল আচার রমণীর কোলাকুলি। বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি জয় হুলাহুলি॥
দিবা অবসানকালে লগ্ন উপস্থিত। নলের বরণ করে নৃপতি ত্বরিত॥
বরণ করিয়া নলে লৈল নিজালয়। প্রাঙ্গনের মাঝে নল পীঠোপরি রয়॥
কুলবধূ কুলকন্যা লইয়া নৃপরাণী। বরণ করিতে যায় করে হেম ঝারি॥
ধুতূরার ফলখণ্ডে প্রদীপ জ্বালিয়া। কোন সহচরী লইল মাথায় তুলিয়া॥
গুড় চাল্ দিল অঙ্গে ঝালি ঝাড়া পাত। বাঁধিল নলের মন দময়ন্তী সাথ॥
বরণ করিয়া নিছাইয়া ফেলে পান। কোন কোন সহচরী পাক দিল কাণ॥
রাজার রমণী তবে খান মনকলা। নলের নিকটে দময়ন্তী লয়ে গেলা॥
সাতপাক ভ্রমি পরে নাড়িল ছায়নী। বদল করিয়া মাল্য করিল ছাড়নি॥
বর কন্যা দোঁহাকে আনিল সভামাঝে। রতির সহিত যেন অনঙ্গ বিরাজে॥
সতিল গঙ্গার জল কুশ দূর্ব্বা ফল। আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আর জল॥
দধি দুগ্ধ মধুর সহিত মধুপর্ক। বসন ভূষণ দিল যেন তুল্য অর্ক॥
অভয়ার প্রীতে রাজা কন্যা দান করে। শেষে নল দময়ন্তী চাহে পরস্পরে॥"

বিবাহ শেষ হইল, এখন বাসর ঘরের রঙ্গরসের কথার দুই চারি পংক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। ইাতে বিশেষ কোন অশ্লীলতা নাই, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাসরঘর একপ্রকার

নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। শিক্ষিতা বঙ্গমহিলারা এখন বড় আর বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে চান না। অর্দ্ধ-শিক্ষিতারাও অনেক পরিমাণে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। এখন অনেক প্রসিদ্ধ স্থান হইতেও নব-পরিণেতা অক্ষত কর্ণে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। আজকাল যাহা কিছু আছে, ইহার পরবর্ত্তী কবিগণের এ বিষয়ে লেখনী পরিচালনের বোধ হয় কিছুমাত্র সুযোগ ঘটিবে না। যাহাহউক "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই বাক্যের অনুরোধে পূর্ব্বতন বাসরঘরের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনামাত্র উদ্ধৃত হইল।

"অন্তঃপুরে নারীগণ করয়ে কৌতুক। রাজার রমণী আসি দিলেন যৌতুক॥
ক্ষীরখণ্ড ভোজন করয়ে দোঁহে মিলি। বাসরে বসিয়া বর কন্যা করে কেলি॥
কুসুম-শয্যায় নল জাগে বিভাবরী। কৌতুক করিছে আসি যত সহচরী॥
আপনি রসিক নল তাহে রসকূপ। রসিকা সহিত রসে ভাষে নলভূপ॥
রসিকা রমণী মেলি কেহ ধরে ঝুঁটি। কোন কোন সহচরী দিল কাণলুটি॥
কর্পূর লবঙ্গ সহ তাম্বূল পূরিয়া। কোন সখী নল করে দিলেক তুলিয়া॥
রমণী যুবতী যত রসিকা সাগর। নল রাজা রসে ভাষে বিবাহ বাসর॥
এইরূপ নল রাজা জাগিল রজনী। বিরচিল রামচন্দ্র ভাবিয়া ভবানী॥"

এইখানেই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।*

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

---

* এই প্রবন্ধ প্রায় মুদ্রিত হইয়াছে, এমন অবস্থায় মেট্রপলিটান্ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই কবির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—"প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিণাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ৪ ভাই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক ভাইয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। ইঁহার বয়ঃক্রম ৮৩ বৎসর হইবে। জয়ঘোষ নামে ইঁহাদের এক ধনাঢ্য শিষ্য ছিলেন, তাঁহার উৎসাহে রামচন্দ্র অনেক বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক রচনা করেন। এই জয়ঘোষের পৌত্র এখন জমিদার। বাখরগঞ্জে তাঁহার জমিদারী আছে। জয়ঘোষের উৎসাহে যে সকল কবিতাগ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে গৌরীবিলাস, দুর্গামঙ্গল (নলদময়ন্তী), মাধবমালতী (মালতীমাধব) প্রভৃতি কাব্য প্রধান। এই সকল কাব্য যাত্রারূপে গীত হইত এবং শিষ্য জয়ঘোষ সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। যদি কেহ তাঁহার গুরু রামচন্দ্রের কোন যাত্র শুনিতে চাহিত, তাহা হইলে জয়ঘোষ তাহার বাটীতে আলোক প্রভৃতির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। রামচন্দ্রও যাত্রা উপলক্ষে কাহারও নিকট হইতে কিছু লইতেন না। প্রায় ৫৫ বৎসর হইল, রামচন্দ্রের কাল হইয়াছে।" লোকের কথা ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দ্বিজ রামচন্দ্র নামক প্রবন্ধে দুর্গামঙ্গল গ্রন্থের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র-পাঠে উহা ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে না, তবে পত্রের ১টী স্থলে সন্দেহ আছে, যাহাহউক, যদি এই পুস্তক মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে উহ ভূমিকায় অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থকারের যথার্থ আবির্ভাব-কাল লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

হরি ও সোম।

সংস্কৃত শাব্দিকেরা একই শব্দের অনেকার্থ প্রকাশ-স্থলে 'শব্দশক্তি' স্বীকার করিয়াছেন। এই শব্দদ্বারা এরূপ অর্থ প্রতীতি হউক, এ প্রকার ইচ্ছার নাম শব্দশক্তি। তাঁহারা এই শক্তিকে ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া বর্ণনা করেন। সংযোগাদিদ্বারা নানার্থ শব্দের অন্যতম অর্থের বোধ হইয়া থাকে। অনেকার্থধ্বনীমঞ্জরীতে—

"হরিরিন্দ্রো হরির্ভানুর্হরির্বিষ্ণুর্হরির্মরুৎ।
হরি সিংহো হরির্ভেকো হরির্বাজী হরিঃ কপিঃ।
হরিরংশুর্হরির্ভীরুর্হরিঃ সোমো হরির্যমঃ।
হরিঃ শুক্লো হরিঃ সর্পঃ স্বর্ণবর্ণো হরিস্মৃতঃ॥"

হরি শব্দের যে পঞ্চদশটি অর্থ লিখিত আছে, সেই সকলের একটির সহিত অপরটির যথাক্রমে কোন ধারাবাহিক সম্বন্ধ আছে কি না, অথবা কোন একটি মূলীভূত তাৎপর্য্যের ক্রমিক ভাববিকাশদ্বারা যথাক্রমে সকলগুলি অর্থেরই উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ নির্দ্ধারণ সম্ভবপর কি না, তাহা আমাদিগের শাব্দিকেরা অনুসন্ধান না করিয়াছেন, এমন নয়। প্রকৃতিপ্রত্যয়-বিভাগে শব্দ-ব্যুৎপাদিত করিবার জন্য তাঁহারা যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, পাণিনি, কাতন্ত্র প্রভৃতি ব্যাকরণই তাহার সাক্ষী; কিন্তু তাঁহাদের এতদ্বিষয়িণী চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই; তাঁহারা তদবধারণে অসমর্থ হইয়াই ঈশ্বরেচ্ছার উপর ভারার্পণ করিয়াছেন। কৃতী সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য শব্দসমূহ বৃক্ষাদির ন্যায় রূঢ় জ্ঞান করিয়া কলাপসূত্রে কৃদন্ত শব্দের ব্যুৎপাদন করেন নাই। হরণার্থ "হৃ" ধাতু হইতে "হরি" শব্দ ব্যুৎপাদিত হইলেও, পাপনাশন শঙ্খচক্রধর হরির ধাত্বর্থের সহিত ভেকবোধক হরির যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহার তত্ত্ব তাঁহারা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কোন একটি শব্দের এক অর্থের সহিত অন্য অর্থের সাদৃশ্য দেখিয়া, সেই সাদৃশ্যের সিদ্ধান্তের চেষ্টা না করিয়া, তাহা যে ভাবের ক্রমবিকাশের ফল, ইহা শাব্দিকেরা কোনরূপে স্বীকার করেন না। আমরা জনৈক মৈথিল কবির রচনায় দেখিতে পাই,—

"হরি গরজল, হরি শুনল,
হরিক সবদ শুনি হরি চললাহ,
হরি বাটে ভেটল, হরি হরি পিরল,
হরিক প্রতাপে হরি বচলাহ।"

অর্থাৎ,—আকাশে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া ভেক ডাকিতে লাগিল, ভেকের শব্দে সর্প (ভোজনার্থ) পথে যাইতে যাইতে ময়ূরের দেখা পাইল, ময়ূর সর্পকে গ্রাস করিল, এইরূপে ময়ূরের প্রতাপে (সর্পের আক্রমণ হইতে) ভেক রক্ষা পাইল।

উপরি উক্ত কবিতায় হরি শব্দের আকাশ, ভেক, সর্প ও ময়ূর এই চারিটি অর্থ একটি মূলীভূত কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে? আকাশের মেঘ-

গর্জ্জনই সেই মূলীভূত কারণ। মেঘ-গর্জ্জন হইতেই ভেকের ডাক, সর্পের আহারান্বেষণ-চেষ্টা, ময়ুর কর্ত্তৃক সর্পনাশ ও ভেকের রক্ষা কল্পিত হইতে পারে'। ইহাই কি এ স্থলে ভাব-বিকাশের প্রণালী? এইরূপ রচনা পরিহাসপর হইলে, সকলে ইহার রসাস্বাদন করিয়া আমোদিত হইয়া থাকেন; কিন্তু ইহা শব্দার্থের উৎপাদক ও বিকাশক হইলে পণ্ডিতেরা ইহাকে আবর্জ্জনা বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থভাগের তৃতীয় সংখ্যায় যে হরিনামের শব্দতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, সে প্রবন্ধে তিনি হরি শব্দের সর্ব্ববিধ অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপনে চেষ্টা করেন নাই। তিনি ইহার হরিদ্বর্ণ, সোম, অশ্ব ও বিষ্ণু এই চারিটি অর্থের ক্রমিক সম্বন্ধ এবং হরিদ্বর্ণের তাৎপর্য্যার্থের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া হরিদ্বর্ণকেই হরি শব্দের ঐ চতুর্ব্বিধ অর্থের মূলীভূত কারণরূপে স্থির করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অনেকার্থ-ধ্বনিমঞ্জরীতে এক স্বর্ণবর্ণের উল্লেখ থাকিলেও হরি শব্দে হরিদ্বর্ণও বুঝায়। যথা মেদিনী,—"বাচ্যবৎপিঙ্গহরিতোঃ"।

বটব্যাল মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সোমলতা হরিদ্বর্ণ। ইহার তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই। গ্রন্থে সোমলতার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে অংশুমান্, রজতপ্রভ, কনকাভ ও বিচিত্রবর্ণমণ্ডলচিত্রিত এই কয়েকটি বিশেষণে বর্ণের আভাস পাওয়া যায়। ইহাদের একটিও হরিদ্বর্ণ ব্যাপক নহে; সুতরাং প্রমাণ ভিন্ন সোমের হরিদ্বর্ণত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বৈদ্যক শাস্ত্রে সোম ওষধিরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ওষধি শব্দে জ্যোতির্লতা ও ফল-পাকান্ত বৃক্ষাদি বুঝায়। রাত্রিকালে যে সকল লতা উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, সে সকলকে জ্যোতির্লতা কহে। সবুজবর্ণের অন্ধকার রাত্রিতে দীপ্তি কবির কল্পনায়ই শোভা পায়। সোম শব্দের নানার্থ। যথা হেমচন্দ্র,—

"সোমস্ত্বোষধীতদ্বরসেন্দুষু,
দিব্যৌষধ্যাং ধনসারে সমীরে পিতৃদৈবতে,
বসুপ্রভেদে সলিলে বানরে কিন্নরেশ্বরে।"

যে সোমের রস পানীয়, সেই সোম "এক প্রকার খর্ব্বাকার বৃক্ষ" নহে, উহা লতা; এই বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতভেদ দৃষ্ট হয় না। ভট্টিকাব্যের টীকায় "সোমরসং সোমলতানিষ্কৃষ্টং যজ্ঞীয়ং পানীয়-বিশেষং" সোমরসের এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। সোমলতার পঞ্চদশটি পত্র। চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধির ন্যায় সোমলতারও ক্ষয়-পক্ষে প্রতিদিন এক একটি পত্রের ক্ষয় হইতে থাকে, এবং বৃদ্ধি পক্ষে প্রতিদিন এক একটি পত্রের উৎপত্তি হইতে থাকে। চরকসংহিতায় ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"সোমনামৌষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ,
স সোম ইব হীয়তে বর্দ্ধতে চ।"

সোমের (চন্দ্রের) ন্যায় পক্ষভেদে হ্রাস বৃদ্ধি আছে বলিয়াই এই লতার নাম সোম হইয়াছে

থাকিবে। সোমলতা চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। ইহাদের মধ্যে অশুংমান্, ঘৃতগন্ধ, রজতপ্রভ, কেদ্রলীকন্দবৎকন্দ, মুঞ্জবান্, লশুনপত্র, চন্দ্রমা ও কনকাভ, এই অষ্টবিধ সোম জলে জন্মে। কতিপয় জাতীয় সোম বৃক্ষে জন্মে; ইহারা বৃক্ষাগ্রে অহিনির্ম্মোকবৎ লম্বমান দৃষ্ট হয়। অপরাপর জাতীয় সোম বিচিত্র বর্ণসমূহে চিত্রিত। সর্ব্বজাতীয় সোমেরই পঞ্চদশটি পত্র; সকলই ক্ষীরকন্দ ও লতাবৎ। মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, হিমালয়, পারিযাত্র, সহ্য, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতে এই সকল সোমের জন্ম। চন্দ্রমা-সোম সিন্ধুনদে শৈবালবৎ ভাসমান দৃষ্ট হয়। মুঞ্জবান্ ও অংশুমান্ সোম সিন্ধুনদেও পাওয়া যায়। ত্রৈষ্টুভ-পাংক্ত, জাগত ও শাক্কর প্রভৃতি সোম কাশ্মীরে ও ক্ষুদ্রমানস-সরোবরে পাওয়া যায়। গ্রন্থে এরূপই যজ্ঞীয় বা ওষধিরাজ সোমের বিবরণ দৃষ্ট হয়। সোমলতা ভারতবর্ষের কোথাও জন্মে কিনা, তাহা আমি অবগত নহি। শুনিয়াছি, কাশ্মীরে অদ্যাপি সোমলতা পাওয়া যায়; কিন্তু এই কথাটি কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না।

বটব্যাল মহাশয় প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "এখন আমাদের ব্রাহ্মণেরা সোমের পরিবর্ত্তে পুতিকা (পুঁইশাক) ব্যবহার করেন, তাহাই এখন 'সোমলতা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" পরলোকগত রমানাথ সরস্বতীও তদীয় ঋগ্বেদ-সংহিতার এক স্থলে "সোমাভাবে পুতিকাম-ভিষুনুয়াৎ" এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে,—"ষড়বিংশব্রাহ্মণেও মীমাংসাশাস্ত্রে সোমলতার অভাবে পুতিকা (পুঁইশাক) বিধান আছে।" পুতিকা (পুত্তিকা) শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র মক্ষিকা। "পুতিকা" না হইয়া ইহা "পুঁতিকা" হইলে, ইহার (১) পুঁইশাক, (২) পুতিকরঞ্জলতা এবং বিড়ালী, এই ত্রিবিধ অর্থ অভিধানে দৃষ্ট হয়। অভিধানে "সোমপুতিকা" নামেও একটি শব্দ আছে; [redacted] "পূতিকরঞ্জলতা যজ্ঞে সোমলতার প্রতিনিধি হইয়া থাকে"—এরূপ লেখা আ[redacted] কোন ক্রমেই সোমলতার অনুকল্প হইতে পারে না। "পুতিকা ব্রহ্মঘা[redacted] কোন ব্রাহ্মণ পুঁইশাক ব্যবহার করিবেন

বিসর্জ্জনই ইন্দ্রের গমন; সংস্কার-সিদ্ধতার জন্য এইরূপ আবাহন-বিসর্জ্জনাদির প্রয়োজন আছে; ইহার দৃষ্টান্ত স্থল, গঙ্গাজলে গঙ্গার আবাহন। আমি বুঝি যে,—দেবতা মন্ত্রাত্মক, তাঁহার বাহনও মন্ত্রাত্মক, আবাহন-বিসর্জ্জনাদি উপাসকের সংস্কারসিদ্ধি, দেবতার সোমরসাদি-পান উপাসকের চিত্তশুদ্ধি বা প্রয়োজন-সিদ্ধি। দীক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই এইরূপ ধারণা।

যদি হরি শব্দে বাস্তবিকই যথাক্রমে হরিদ্বর্ণ, সোম, ইন্দ্রের বাহন অশ্ব এবং যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে বুঝাইত, তাহা হইলে বেদেই হউক, কি কোন সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থেই হউক, হরি শব্দের এইরূপ ক্রমিক অর্থজ্ঞাপক প্রয়োগ অবশ্যই থাকিত। বটব্যাল মহাশয় এতদ্বিষয়ের এরূপ প্রয়োগ উদ্ধৃত করেন নাই। বটব্যাল মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"'মাদক' হরি চিরকালই গানের উদ্দীপক, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যে মনে করেন, যে বস্ত্রহরণ বা পাপহরণ করাই হরির 'হরিত্ব', তাহা নহে। বস্ত্রহরণ ও পাপহরণ দুইটিই আমার মতে কল্পনামাত্র। হরির হরিত্ব বাস্তবিক কৃষ্ণের কৃষ্ণত্বের মূল।"

গানের উদ্দীপনেই যদি হরির "হরিত্ব" প্রকাশ হইত, তাহা হইলে অষ্টাঙ্গযোগের কোন সার্থকতা থাকিত না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হরণার্থ "হৃ" ধাতু হইতে হরি পদ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। সুতরাং—

"রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ।"

হরি রুদ্ররূপেই যে কেবল সংহার করেন, তাহা নহে, পালনেও দণ্ডনীতির আবশ্যকত আছে। অনুলোমক্রমে প্রকৃতির বিকৃতিই সৃষ্টি, আর বিলোমক্রমে লয়-সাধনই ক্রমিক মুক্তি এই মুক্তি উপাস্য দেবতার কৃপাসাপেক্ষ। [redacted] ভক্তের সম্পত্তি। সোমরসে মত্ততায় উদ্দীপন হয়, বলিয়া যদি হরির "হরি [redacted] হইলে কেহই বোধ হয় ধর্ম্মে স্থি থাকিতে পারিতেন না। হরির পাপহরণ [redacted]

ইতিহাস-রচনার প্রণালী।

ইতঃপূর্ব্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহার এক স্থলে উল্লেখ ছিল—"সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ প্রায়ই কল্পনাপ্রিয় হইয়া থাকে। বেগবতী তরঙ্গিণী, সমুন্নত পর্ব্বত, সুচ্ছায় বৃক্ষ, অনন্ত নীল আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন একদিকে তাঁহার কল্পনার লীলাস্থল হয়, মহত্তর বা নিকৃষ্টতর মানব-চরিত্রও সেইরূপ তাঁহার রসময়ী কবিতার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কবিতা প্রায়ই উদ্ভাবনা উদ্দীপনা প্রভৃতি গুণে উৎকর্ষ লাভ করে। উহা বিমল স্রোতস্বতীর ন্যায় যেরূপ প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ আবেগময় হইয়া থাকে। * * * বাল্মীকি বা হোমর যাহা দেখেন নাই, কল্পনাবলে যাহা ভাবিতে পারেন নাই, বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞের ক্ষমতায় তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে; কিন্তু বাল্মীকি বা হোমর কাব্যজগতে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কেহই সেরূপ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। সভ্যতার আদিম অবস্থা মানুষকে অধিকতর সরল এবং তাহার ভাষাকে [illegible]তর কবিত্বময় করে।" এইরূপ সারল্যময় ভাব, এইরূপ প্রতিভা, এইরূপ কল্পনার [illegible]রা সমাজের আদিম অবস্থায় সরল ও স্বাভাবিক কাব্য দেখিতে পাই। সমাজ [illegible] জ্যোতিষ ও ইতিহাসাদির তত উন্নতি হইতে থাকে।

কিন্তু প্রাচীন সমাজে কবিতার প্রা[illegible]দেশ, জেনোফন্ এবং লি[illegible]তের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা যে সক[illegible]স লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ের গৌরব বর্ত্তমান সময়েও অন্তর্হিত হয় নাই। যাহাহউক, সাধারণতঃ প্রাচীন সময়ে লোকের হৃদয় কবিত্বের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কবি কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিয়া, যে সকল বিষয় সজ্জিত করেন, উত্তরকালে ঐতিহাসিক তৎসমুদয় হইতে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের প্রতিভাবলে যে দুই মহাগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে, [illegible]মান সময়ে ঐতিহাসিক তাহা হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন। [illegible]য় সাহিত্যের প্রাচীন স্তর উদ্ঘাটন করিলে, আমরা কাব্যের মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হই। দরিদ্র মুকুন্দরামের সংগীতের সহিত তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজের ইতিবৃত্ত জড়িত রহিয়াছে। আদি কবি কৃত্তিবাসের গ্রন্থের বিশ্লেষণ করিলেও, সেই সময়ের বাঙ্গালী-চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাচীনকালে যাঁহারা ইতিহাস লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। যুক্তিপ্রণালীর সন্নিবেশে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ঐতিহাসিকদিগের উপর প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। জ্ঞানসংগ্রহে

ইউরোপের আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের যেরূপ সুযোগ আছে, গ্রীস বা রোমের ঐতিহাসিকদিগের সেরূপ সুযোগ ছিল না। হিরদোতস্ যে সময়ে আবির্ভূত হয়েন, থুসিদাইদিস্ যে সময়ে পিলোপনিসসের যুদ্ধের বর্ণনায় ব্যাপৃত থাকেন, জেনোফন্ যে সময়ে দশসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তনের বিবরণে স্বকীয় লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দেন, সে সময়ে সমাজ অধিকতর সভ্যতাসম্পন্ন হয় নাই; রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে লোকে অধিকতর জ্ঞান লাভ করে নাই; রাজ্যের বিবিধ শৃঙ্খলা বা বিপ্লব লোকের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই; বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের পথ তাদৃশ সুগম হইয়া উঠে নাই; বিবিধ স্থানের জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপপরিচয়েরও তাদৃশ সুবিধা ঘটে নাই। ক্রমে সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন সময় অপেক্ষা আধুনিক সময়ে সংসারের সমস্ত বিষয় জানিবার অধিকতর সুযোগ ঘটিয়াছে। বাণিজ্যের বিস্তার হইয়াছে। অধিকাংশ দেশ অধিকতর সভ্যতাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গন্তব্য পথ নিরাপদ ও সুগম হইয়াছে। বিভিন্ন জনপদের জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপপরিচয়ের সুবিধা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করাও অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিকদিগের পক্ষে এই সকল সুযোগ অল্পলাভজনক নহে। প্রাচীন কালের [illegible]সিকগণের পক্ষে এ সকল সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ জ্ঞানসং[illegible]ভদর্শিতালাভে আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের ন্যায় সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। [illegible] যেমন অধিকতর প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, [illegible]নিক ঐতিহাসিকদিগের নিম্নগণ্য হইয়া- [illegible]হাসের লিপিপ্রণালীর তুলনা করিয়া দেখিলে সাধারণতঃ [illegible]ই বুঝা যায় যে, আধুনিক [illegible] যেমন বৈজ্ঞানিকভাব, দার্শনিক তত্ত্ব ও মার্জ্জিতলিপিকৌশলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, [illegible]ীন ঐতিহাসিকগণ সেইরূপ প্রতিভায়, উদ্দীপনায় ও সারল্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আধুনিক সময়ে জ্ঞানলাভের যেরূপ সুযোগ হইয়াছে, প্রাচীন সময়ে সেরূপ ছিল না। প্রাচীনকালে সর্ব্বত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সর্ব্বত্র জ্ঞানবিস্তারে তৎপর থাকে নাই। বিজ্ঞানের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন জনপদ সকল একসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠে নাই। জ্ঞানরাজ্যের অধিনায়কগণ পরস্পরের মনোগত ভাব আদানপ্রদানের তাদৃশ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্রাচীনকালে যাঁহারা জ্ঞানপিপাসু ছিলেন, উদ্ভাবনা ও গবেষণায় যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বহু কষ্টে মিশর প্রভৃতি দেশে যাইতে হইত। তাঁহারা সেই সকল জ্ঞানচর্চ্চার স্থানে অভীষ্ট বিষয়সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা দার্শনিক, ধর্ম্মযাজক কবি প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে এবং স্বদেশীয়দিগকে আপনাদের বহুকষ্টলব্ধ বহুমূল্য বিষয়ের পরিচয় দিতেন। স্বদেশীয় তাঁহাদের গুণের সম্মান করিতে কখনও বিমুখ হইত না। যাঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসা

প্রভাবে, যাঁহাদের অপরিসীম স্বার্থত্যাগে, যাঁহাদের সংগৃহীত জ্ঞানে স্বদেশ গৌরবান্বিত হইয়াছে এবং স্বদেশীয়গণ নানাবিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহারা স্বদেশে আধুনিক কৃতবিদ্য লেখকগণ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইতেন। হিরদোতস্ আপনার ইতিহাস পাঠ করিয়া সমগ্র গ্রীশে জয়পত্রে শোভিত হইয়াছিলেন। পিলোপনিসাসের যুদ্ধে এথেন্সের সৈনিকগণ সিসিলিতে পরাজিত হইলে বন্দীদিগের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। যে সকল বন্দী এথেন্সের প্রসিদ্ধ কবি ইউরিপাইদিসের কবিতার আবৃত্তি করিতে পারিয়াছিল, তাহারা মৃত্যুমুখে পাতিত হয় নাই। বিজেতারা এথেন্সের প্রসিদ্ধ কবিকে সম্মানিত করার জন্য এইরূপ দয়া প্রদর্শন করিয়াছিল।

প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক কবি প্রভৃতি এইরূপে সম্মানিত হইতেন। কল্পনার প্রাধান্য-কালেও ইতিহাসের সম্মান এইরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের [illegible] হইতেছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলীর সহিত যেরূপ দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নানাগ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইতেছে, সেইরূপ [illegible]হাসও সাহিত্যক্ষেত্রে স্থানপরিগ্রহ করিতেছে। পাশ্চাত্যশিক্ষায় এখন আমাদের [illegible]ক্ষেত্রেরও অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। আমাদের মধ্যে ইতিহাস প্রভৃতির অনুশীলন হইতেছে। সাহিত্য-সংসারের কর্ম্মবীরগণ কেবল কল্পনারাজ্যে বিচরণ না করিয়া প্রকৃত ঘটনার আলোচনাতে মনোনিবেশ করিতেছেন। এখন বঙ্গীয় সাহিত্যের যেরূপ অবস্থান্তর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইতিহাস-রচনীয় লিপিপ্রণালীর আলোচনা বোধ হয় অসাময়িক বলিয়া বোধ হইবে না।

শ্রোতার মন আপনার দিকে আকর্ষণ করা যেমন বাগ্মীর প্রধান কর্ত্তব্য, সেইরূপ স্বজাতির শিক্ষা [illegible] বর্দ্ধমান [illegible] লেখকের প্রধান কার্য্য। [illegible] পাঠকের হৃদয়ে [illegible] দোষ প্রকাশ [illegible] অতি- [illegible] রক্ষা [illegible]

করে, সেইরূপ সমাজনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধেও আমাদিগকে নানা উপদেশ দিয়া থাকে। সুতরাং ইতিহাস কথা-গ্রন্থ নহে। ইহাতে কল্পনাচাতুরী বা অতিবর্ণনার উচ্ছ্বাস দেখাইতে হয় না এবং অলঙ্কারচ্ছটায় সত্যকে আচ্ছাদিত করিবারও প্রয়োজন ঘটেনা। ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যই ইহার প্রধান অলঙ্কার।

ঐতিহাসিককে সর্ব্বাগ্রে বর্ণনীয় বিষয়গুলির মধ্যে শৃঙ্খলা রাখিতে হয়, অর্থাৎ ঐতিহাসিক যে বিষয়ে ইতিহাস লিখিবেন, তাহা যেন অসম্বদ্ধঘটনায় পরস্পর পৃথক্ হইয়া না পড়ে। ইতিহাসে কোন বিশেষ প্রণালী অনুসারে সমস্ত ঘটনাগুলি একসূত্রে গ্রথিত হইবে ইতিহাসবর্ণিত বিষয় যেন সমগ্রভাবে পাঠকের মানসপটে অঙ্কিত হয়। একখানি সুচি[illegible] আলেখ্য সমগ্রভাবে দর্শকের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলে তাঁহার যেমন তৃপ্তিলাভ হয়, এক[illegible] গ্রথিত, পরস্পর সুশৃঙ্খলভাবে সম্বদ্ধ বিষয়েও পাঠকের সম্মুখে সমগ্রভাবে উপস্থিত [illegible] তাঁহার জ্ঞানপিপাসা সেইরূপ পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। উপদেশসংগ্রহ বা আনন্দ[illegible] পাঠকের ইতিহাসপ[illegible] যাহাই উদ্দেশ্য হউক না কেন, ঘটনাবলীর একটী সুশৃঙ্খলা [illegible] সম্পূর্ণ ভাব মনোমধ্যে [illegible] না হইলে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না।

যে সকল ইতিহাসে সমগ্র জাতি বা সমগ্র সাম্রাজ্যের বিবরণ বর্ণনীয় হয়, সেই সকল ইতিহাসে, বিভিন্ন সময়ের ঘটনাপরম্পরার মধ্যে এইরূপ শৃঙ্খলা বা একতা রাখা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু সুনিপুণ ঐতিহাসিক এই দুঃসাধ্য বিষয়েও কৃতকার্য্য হইতে পারেন। বিভিন্ন প্রকৃতির ঘটনাগুলি একত্র করিতে যদিও গোলযোগ উপস্থিত হয়, তথাপি ঐ সকল ক্ষুদ্র ঘটনা যে সকল প্রধান ঘটনার মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে একতা রা[illegible] যাইতে পারে। রা[illegible] প্রত্যেক [illegible] সম্বদ্ধ ঘটনা থা[illegible] বিশেষ লক্ষ্যানুস[illegible] ঘটনাসূত্র হই[illegible] সন্নিবেশ হ[illegible] শৃঙ্খ[illegible] এ[illegible]

দিয়াছিল, এবং যে কার্য্যপ্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহাই লিবিকে বহুবিধ বিভিন্ন প্রকৃতির ঘটনাবলীর মধ্যেও, রোমের ইতিহাসে একতা রাখিতে সমর্থ করিয়া তুলিয়া ছিল। রাজশক্তির সমক্ষে প্রজাশক্তির প্রাধান্য রক্ষা করা ইংলণ্ডের জনসাধারণের প্রধান লক্ষ্য। ইংলণ্ডের লোকে ঐ লক্ষ্যানুসারেই আপনাদের শক্তির বিনিয়োগ করিয়াছে। জনসাধারণ আপনাদের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াছে, তদ্দ্বারা গ্রীণ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছেন।

মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা ঐতিহাসিকের পক্ষে যেমন আবশ্যক, রাজনৈতিক বিষয়ে সুশিক্ষিত হওয়াও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। ইতিহাসলেখককে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র ও কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনা করিতে হয়। প্রথম গুণটী না থাকিলে এই সমালোচনা সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত ও সমীচীন হয় না। রাষ্ট্রবিপ্লব বা রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের প্রকৃতি বুঝাইবার সময়ে দ্বিতীয়টির আবশ্যকতা দেখা যায়। রাজনৈতিক বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা এবং রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় জানিবার সুযোগ না থাকাতে প্রাচীনকালের ইতিহাসলেখকগণ রাজনীতি-ক্ষেত্রে আপনাদের অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারিতেন না। তাঁহাদের ভূয়োদর্শিতা যেরূপ সীমাবদ্ধ, উপকরণও সেইরূপ অল্প ছিল। তাঁহারা স্বদেশবাসীদিগকে সন্তোষিত করিবার জন্য ইতিহাস রচনা করিতেন। ভিন্নদেশবাসীদিগের সহিত তাহাদের কোনও সংস্রব ছিল না। অধিকন্তু এখন যেমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তমন ছিলনা। এই সকল কারণে আমরা গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের নিকটে উক্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণ জানিতে পারি না। গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সম্পত্তি, রাজস্ব ও সৈনিক বল কি রূপ ছিল, কি কি সূত্রে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত আর কি ভাবে একরাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের অসম্পূর্ণ বিবরণ গ্রীসের প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখা যায়।

বর্ণনা-কৌশলের পরিচয় দেওয়া ঐতিহাসিকের অন্যতম প্রধান গুণ। ইতিহাসের বর্ণনা যেরূপ সরল ও সুন্দর, সেইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্বাভাবিক হইবে। ঐতিহাসিক লিপিকুশল হইলে এ বিষয়ের উদ্দীপনা প্রকৃতি গুণের যথোচিত পরিচয় দিতে পারেন। এই গুণ দেখাইতে হইলে ঐতিহাসিক যে বিষয়ের ইতিহাস লিখিবেন, সেই বিষয় প্রকৃষ্টরূপে আয়ত্ত করিবেন। সমগ্র বিষয়টী যেন তাঁহার নখদর্পণে প্রতিফলিত হয়। কোন্ স্থানে কোন্ ঘটনার সন্নিবেশ করিতে হইবে, ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে কি রূপ শৃঙ্খলা রাখিতে হইবে, এক ঘটনা হইতে আর এক ঘটনার উৎপত্তি স্থলে কি রূপে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে, তাহা যেন ইতিহাসলেখকের মনে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ থাকে। এইরূপে সমগ্র বিষয় আয়ত্ত করিয়া, ইতিহাসলেখক বর্ণনাবৈচিত্র্য প্রকাশ করিবেন। পাঠমাত্র যেন

বিষয়টী একখানি সুস্পষ্ট আলেখ্যের ন্যায় পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে পতিত হয়। এই গুণ না থাকিলে ইতিহাস কোনও অংশে পাঠকের সন্তোষজনক বা শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে না। বর্ণনা কোন্ স্থলে সংক্ষিপ্ত, কোন্ স্থলেই বা বিস্তৃত করিতে হইবে, ঐতিহাসিক সাবধানে তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। পাঠকও অযথাস্থলে বর্ণনার অতি বিস্তৃতিতে বিরক্ত এবং প্রয়োজনের স্থলে বর্ণনার সংক্ষিপ্তভাবে অপরিতৃপ্ত না হয়েন।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ বর্ণনাবৈচিত্র্যে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ইতিহাসলেখকদিগের ঐতিহাসিক বিষয়ঘটিত বর্ণনা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনার অনুরকণ করিয়া মেকিয়াবেল, দেবিকা, ফাদার পল প্রভৃতি ইতালীয় ঐতিহাসিকগণ চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আধুনিক কালে ফ্রান্সের ইতিহাসলেখকগণ এইরূপ ঐতিহাসিক বর্ণনায় স্বদেশের সাহিত্য সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইংলণ্ডে গিবন প্রভৃতি প্রধান ঐতিহাসিকগণ এই পথের পথিক হইয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বর্ণনার সময়ে ঐতিহাসিক আপনার অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য হইতে কখনও বিচ্যুত হইবেন না তাঁহার রচনা যেরূপ গভীর ভাবপূর্ণ, সেইরূপ পরিমার্জ্জিত এবং কোমলত্ব, উদ্দীপনা প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত হইবে। উহা নিম্নশ্রেণীর লোকের ব্যবহৃত প্রাদেশিক শব্দে ভারাক্রান্ত ও গ্রাম্যতাদোষে কলুষিত হইবে না। উহার কোন স্থলে রহস্যঘটিত তরলরসময়ী কথার প্রয়োগ থাকিবে না। ফলতঃ ইতিহাসের ভাষা যেরূপ সরল সেইরূপ গম্ভীর হইবে। উহা কখনও লালিত্য বা মাধুর্য্যে বিসর্জ্জন দিবে না। উহা অগ্রে বা পশ্চাতে, দক্ষিণে বা বামে কখনও হেলিয়া পড়িবে না। রাজসিংহাসনে উপবিষ্টা রাজ্ঞীর ন্যায় উহা সর্ব্বদা আপনার গাম্ভীর্য্য ও গৌরব রক্ষা করিবে।

ঐতিহাসিক যখন আপনার ইতিহাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়গুলি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন, তখন তিনি তৎসমুদয় সম্বন্ধে উপযুক্তস্থলে আপনার অভিমত প্রকাশ করিতে নিরস্ত থাকিবেন না। অভিমত প্রকাশের সময় তাঁহাকে অপক্ষপাত বিচারকের ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য এবং তাঁহার বিচারশক্তি ও পক্ষপাতশূন্যতা এই সময়ে যেন পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হয়। তিনি পাঠককে রাজ্যশাসনপ্রণালী দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত পরিচিত করিবেন। পাঠক তাঁহার নিকটে রাজ্যে সৈনিকবল, রাজস্ব প্রভৃতির বিষয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহের সহিত সম্বন্ধ অবগত হইয়াছেন। এই সকল বিষয়ের সহিত লোকচরিত্র সম্বন্ধেও পাঠকের জ্ঞানলাভ হইয়াছে। পাঠক সমস্ত বিষয় আপনাদের সম্মুখে দেখিয়া তৎসম্বন্ধে আপনি মতামত নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। এরূপ স্থলে ঐতিহাসিককে সবিশেষ সাবধানে কার্য্য করিতে হয়, তাঁহার অসঙ্গত বাক্যে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে, তাঁহার পক্ষপাতে পাঠক তৎপ্রতি হতশ্রদ্ধ না হয়েন, তাঁহার চাপল্যে পাঠকের বিরক্তি না জন্মে, ঐতিহাসিক তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

ঐতিহাসিককে অনেক সময়ে বিভিন্ন মতের বিশ্লেষণ করিতে হয়, এবং কোন ও

—দগের নিকটে ইতিহাস শিখিতেছি। আমাদিগকে ইতিহাস-রচনার প্রণালীও তাঁহাদের নিকটে শিক্ষা করিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকদিগের সহিত গিবন্ বা গ্রীণ্ প্রভৃতি যদি আমাদের অভিনব ইতিহাস-লেখকগণের পথপ্রদর্শক হয়েন, তাহা হইলে অনেক সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

শীতলা-মঙ্গল।

ঋতু-বসন্তের আবির্ভাবে আমাদের দেশে বসন্তের আবির্ভাব হয়। এই রোগের উপদ্রব উপশান্ত করিবার জন্য এখনও অনেকানেক হিন্দুগৃহে শীতলার পূজা ও শীতলার স্তব চোদি পাঠ হইয়া থাকে। চণ্ডী মনসা প্রভৃতির মহিমাপ্রকাশক যেমন বাঙ্গালা কাব্য-ান প্রচলিত আছে, শীতলাদেবীরও সেইরূপ কাব্য-গান আছে, অনেকের গৃহে সেই ানও হয়। চণ্ডী রামায়ণাদির ন্যায় শীতলার গানও খোল, মন্দিরা ও নূপুরের তালে গীত ইয়া থাকে। সাধারণতঃ "শীতলা-পণ্ডিত" নামক এক সম্প্রদায়ের লোক এই শীতলার ান গাহিয়া থাকে। বসন্তে মড়ক হইলে কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে বার-ইয়ারীতে শীতলাপ্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা হয় এবং সেই স্থানে পক্ষ বা অষ্টাহকাল "শীতলার গান" দেওয়া হয়। সাধুভাষায় এই গানের নাম "শীতলা-মঙ্গল"। চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতির যেমন কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা আছে, প্রচারাভাবে এবং একমাত্র শীতলা-পণ্ডিতগণের আয়ত্তাধীন থাকায় শীতলা-মঙ্গলগুলির তাদৃশ প্রতিষ্ঠা নাই। আমরা অদ্য এই অপ্রতিষ্ঠিত শীতলা-মঙ্গলগুলির কাব্যাংশ এবং তদানুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শীতলা-দেবীর উল্লেখ পুরাণ ও তন্ত্র উভয়বিধ শাস্ত্রেই আছে। অন্যান্য দেবদেবী অপেক্ষা শীতলার আরও একটু বিশেষত্ব আছে; তিনি রোগাধিষ্ঠাত্রী ও রোগোপশমনকর্ত্রী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে [illegible] হইয়াছেন। মনসা বিষহরি বটে এবং সর্পবিষপ্রভাব ও সর্পভয়-নিবারিণী হইলেও [illegible] আয়ুর্ব্বেদে বিষচিকিৎসাপ্রকরণে মনসার উল্লেখ নাই; কিন্তু বসন্তরোগ-চিকিৎসাপ্রকরণে আয়ুর্ব্বেদে শীতলার উল্লেখ বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলা পৌরাণিকী দেবতা বলিয়া কেবল আমাদের দেশে নহে, ভারতের অন্যত্রও পূজা পাইয়া থাকেন, কাশীর ন্যায় প্রাচীন সহরেও দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর শীতলার এক প্রাচীন মন্দির আছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আর কোথাও "শীতলার গান" বৎ কিছু আছে কি না, জানিনা। আমাদের দেশে এই সর্ব্বত্র পূজিত দেবতাটীর মহিমাপ্রকাশক এই কাব্যাত্মক

গানগুলির উপাখ্যানগুলি সংস্কৃতমূলক নহে। সংস্কৃতে ব্রতকথার ন্যায় কোন "কথা" বর্ত্তমান আছে কি না তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এস্থলে শীতলা সম্বন্ধে একটু শাস্ত্রীয় বিবরণ দিলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্কন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার বিবরণ আছে। স্কন্দপুরাণের কোন্ খণ্ডে আছে তাহা জানা যায় না; তবে ভাবপ্রকাশে মসূরিকা-চিকিৎসায় যে স্থলে (২য় খণ্ড ৪র্থ ভাগে) শীতলা-স্তবাদি পাঠের ব্যবস্থা আছে, সেই স্থলে শীতলাষ্টকের নিম্নে লিখিত আছে,—

"ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকসমাপ্তম্।"

ইহা হইতে কাশীখণ্ডের নাম পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত ৯৩০ শকের হস্তলিখিত পুঁথি ও কাশীতে মুদ্রিত কাশীখণ্ডের যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে এবং বটতলার মুদ্রিত বাঙ্গালা কাশীখণ্ডে শীতলার নাম গন্ধও দেখিলাম না। কাশীতে দশাশ্বমেধঘাটে যে শীতলা-মন্দিরের উল্লেখ করা গিয়াছে, কাশীখণ্ডে দশাশ্বমেধ বর্ণনায় তাহারও কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। শীতলা-পূজার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত এবং পুরোহিত মহাশয়েরা সাধারণতঃ যে শীতলাষ্টক বা শীতলাস্তব পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা স্কন্দ-পুরাণোক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এই পৌরাণ-তান্ত্রিকী দেবতার ধ্যান পিচ্ছিলাতন্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে;—

"শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিলসন্মার্জ্জনীপূর্ণকুম্ভম্।
মার্জ্জন্তীপূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈ ক্ষিপন্তীম্॥
দিগ্বস্ত্রাং মুর্দ্ধ্নি সূর্পাং কণকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাম্।
বিস্ফোটাদ্রুগ্রতাপপ্রশমনকরীং শীতলাং ত্বাং ভজামি॥"

তন্ত্রের ধ্যান এই। পুরাণে ধ্যান বলিয়া কিছু নাই, তবে শীতলাষ্টক নামে স্কন্দপুরাণোক্ত যে স্তবের কথা বলিলাম, তাহা হইতে জানা যায় যে কার্ত্তিক শিবকে প্রশ্ন করিতেছেন;—

"ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্।
বদ মর্হস্তশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহম্॥"

শিব উত্তর দিলেন,—

"নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥
* * *
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাম্ ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥
গলগণ্ডগ্রহরোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ম্॥"

আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই বুঝা গেল, পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলারও যে রূপ, যে বসন, যে ভূষণ, যে বাহন, স্কন্দপুরাণোক্ত শীতলারও সে

অবিকল তাই। কেবল পিচ্ছিলার শীতলা কেবল বিস্ফোটকনাশিনী আর স্কান্দ শীতলা বিস্ফোটক ব্যতীত গলগণ্ড ও অন্যান্য দারুণ গ্রহরোগও নাশ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু স্কান্দে শীতলা-দেবীর এক সূক্ষ্মমূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে। সেই মূর্ত্তি ধ্যাতার নাভিহৃন্মধ্যে অবস্থিত ও মৃণালতন্তুসদৃশী।

*　　*　　*

মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে॥

*　　*　　*

যস্ত্বামুদকমধ্যে তু কৃতা সংপূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥"

অনেকানেক পৌরাণিক দেবতার মূলরূপ বৈদিক শাস্ত্র খুঁজিলে পাওয়া যায়। শীতলার সেরূপ কিছু পাওয়া যায় কি না, জানি না। আমি নিজে বৈদিক শাস্ত্রের সহিত পরিচিত নহি, তবে বিশ্বকোষকার নগেন্দ্র বাবু অথর্ব্ব বেদোক্ত "তক্মন্" শব্দের অর্থ "শীতলা" লিখিয়াছেন। অথর্ব্ববেদে ১।২৫।১, ৫।২১।১, ৪।১।৯, ৬০।১৬।৬, ১৯।৩৪।১০, ১১।২।২৬, ২০।১, ৩৯।১ প্রভৃতি স্থলে "তক্মন্" শব্দ আছে। Sacred books of the East নামক ইংরাজী গ্রন্থমালার মধ্যে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ব্লুমফিল্ড (Dr. Morice Bloomfield) অথর্ব্ববেদের যে আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অথর্ব্ববেদের অধিকাংশের অনুবাদ আছে। তাহাতে তিনি "তক্মন্" শব্দের অর্থ "জ্বর" করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের ১।৫।২২।৩ শ্লোকের অনুবাদ হইতে জানা যায়—"The takman that is spotted covered with spots like reddish sediment [illegible] thou! (oh plant) of unremitting [illegible] spots like reddish sediment যদি [illegible] ত জ্বর এক[illegible]

হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিশ্বকোষের "তক্ষন্" ক্ষিতীন্দ্র বাবুর "অপ্‌দেবী" এই উভয় বৈদিক আরাধ্যের মধ্যে কে যে শীতলা হইয়াছেন, তাহার মীমাংসা যাঁহারা বেদ পুরাণের বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের জানাই রহিল।

এই স্থলে আরও একটী কথা বলিতেছি। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে আমাদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে আছে যে, যেখানে যেখানে ধর্ম্ম-মন্দির দেখা যায়, সেই সেই স্থানেই শীতলার অবস্থান যেন স্বতঃসিদ্ধ এবং যেখানে যেখানে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবালয় আছে, সেই সেই স্থলে হারিতী দেবীর অবস্থানও যেন স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দুদেবী শীতলা ও বৌদ্ধদেবী হারিতী উভয়েই ব্রণব্যাধিনাশিনী। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে শীতলা ও হারিতীর অভেদত্ব কল্পিত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ডোমগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অনেক ডোমাচার্য্যের কথা পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে এক্ষণে যাহারা "শীতলা পণ্ডিত" নামে খ্যাত তাহারাও ডোম জাতীয়। ডোম শীতলা-পণ্ডিতেরা কেবল যে শীতলার গানই গাহে, তাহা নহে, শীতলার পূজাদিও করে এবং বসন্তচিকিৎসা করিয়া থাকে।* আমরা প্রায় দেখিতে পাই, ক্ষুদ্র শীতলা প্রতিমা হস্তে মন্দিরা বাজাইয়া গান করিতে করিতে একদল ভিক্ষুক গৃহস্থবাড়ীতে এই কলিকাতা সহরেও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারাও শীতলা পণ্ডিত। শীতলা ব্রাহ্মণপূজ্যা পৌরাণতান্ত্রিকী দেবতা, তন্ত্রপুরাণোক্ত বীজমন্ত্রাদি সহকারে ইহার পূজা হয়। এমন দেবী কিরূপে ডোমের ন্যায় নীচসেব্যা হইলেন, তাহাও বড় কৌতূহলজনক বটে। এ কৌতূহল মিটাইবার [illegible] ঐতিহাসিক প্রকৃষ্ট প্রমাণ সম্ভবতঃ দিতে পারিব না, তবে ডোমাচার্য্য বৌদ্ধগণের [illegible] ধর্ম্ম ও লোকেশ্ব[illegible]

[illegible]

প্রতিমা বলিলে বলা যায়। এই শীতলার মুখে যে ধাতু বা শঙ্খ নির্ম্মিত রুইতনের কোঁটার ন্যায় বা পেরেকের মাথার ন্যায় টোপতোলা যে বসন্ত-চিহ্ন লাগান থাকে, তাহার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত ধর্ম্মঠাকুরের গাত্রে প্রোথিত পিতলের টোপ-তোলা পেরেক চিহ্নের যেন কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন শীতলাপণ্ডিতেরা সর্ব্বত্র এইরূপ প্রতিমার শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাদিযুক্ত পদ্ধতিতে পূজা করে না। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে এরূপ প্রতিমারও এক্ষণে ব্রাহ্মণ-পূজকের ও সমন্ত্রক পূজার অভাব নাই।* তবে সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য্য যে এরূপ শীতলা প্রতিমার সেবক ব্রাহ্মণেরা স্বশ্রেণীস্থ অতি হীনমর্য্যাদ হইয়া থাকেন। আমার অনুমান এইরূপ যে, ডোম প্রতিমার শীতলা বৌদ্ধ হারিতীর হিন্দু সংস্করণ ও ডোমাচার্য্য বৌদ্ধহারিতীসেবকগণ কালে শীতলাপণ্ডিত হইয়া আবার পূর্ব্বকালের ডোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৌরাণিক শীতলার সহিত ডোমের শীতলার এককালে সম্ভবতঃ কোন সম্পর্ক ছিল না, পরে হিন্দুপ্রভাবে একে অন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে, কেবল প্রতিমার আকার স্বতন্ত্র রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম-বিপ্লবে সামাজিক পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীর উপাসনা মধ্যেও যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, ইহা অসম্ভব। শীতলাপূজা ব্রাহ্মণের সহিত ডোমের সমানাধিকার কেন হইল, তদুত্তরে ইহা অপেক্ষা আমার বুদ্ধিতে আর কোন যুক্তি উঠে না।

শীতলার দেবীত্ব সম্বন্ধে আমার আর বলিবার কিছু নাই। এক্ষণে শীতলামঙ্গলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। শীতলা-মঙ্গলের এ পর্য্যন্ত চারিটী পালার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই চারিটী পালাই একখানি বৃহৎ গ্রন্থের অংশ, এক কবির রচিত নহে। এই চারিটী পালা চারিখানি স্বতন্ত্র কাব্য। ইহার মধ্যে গোকুল পালা বা [redacted] বলরামের শরীরে

১। দৈবকীনন্দনের শীতলা-

রাজা চন্দ্রকেতুর পালা।

এই পালার যে পুঁথিখানি আমি পাইয়াছি, তাহার বয়
গড়বেতার অন্তর্গত রাধানগরনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে
২০এ কার্ত্তিক সোমবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় এই পুঁথির
নামক এক শীতলা-পণ্ডিতের ব্যবহারার্থ তাহাকেই বিক্রয় করে
৫০ বৎসরেরও পুরাতন না হইলেও এই কাব্যের র
কাব্যের ভাষা ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, ইহা
যথাস্থানে তাহার আলোচ না করা গিয়াছে।

এই পুঁথিখানির আ কায় ১৪ পাতা। ইহার কবিতার সং
রচয়িতার পরিচয় এ কাব্যের মধ্য হইতে এইরূপ পাওয়া গিয়াছে

পূর্ণ হাট বসাইল,
বসাইতে
বিধি তাতে হইল বৈমুখ।
শনি গৃহ হৈল পীড়া,
সেই হতে ল
বিবস্ত্রা রাণীর যেন দুখ॥
পিতা মহ পুরোত্তম,
জগতে ঈশ
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে।
সুত শ্রীশ্যাম,
সকল গুণে
হ

কবির পিতামহের বাস হস্তিনানগরে ছিল। এই হস্তিনানগর বলিতে কোন্ গ্রাম বুঝিতে হইবে, তাহা জানিনা। কবির পিতা কিছুদিন মান্দারণে থাকিয়া শেষে বৈদ্যপুরে বাস করেন। সম্ভবতঃ কবিও এই স্থানে ছিলেন। আর একস্থলে আছে,—

"শীতলার পদরজঃ সদা করি ধ্যান।
দৈবকীনন্দন কবিবল্লভে গান॥"

এই ভণিতাটী হইতে আমরা কবির সোপাধিক পূর্ণ নামটী পাইতেছি। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের নানাস্থানে

(১) "গোবিন্দ ভকতি মাগে শ্রীকবিবল্লভ।"

(২) "শীতলা চরণতলে, শ্রীকবিবল্লভে বলে,
সংসার সাগরে কর পার।"

(৩) "শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত।"

(৪) "শ্রীকবিবল্লভ রস গায়।"

ইত্যাকার কেবল উপাধিমাত্র ব্যবহারে ভণিতা-যোগ করিয়া গিয়াছেন।

কবি দৈবকীনন্দন বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; তাহার প্রমাণ আছে,

(১) "শ্রীবল্লভ তার সুত, গোবিন্দ পদেতে রত"

(২) "গোবিন্দ ভকতি মাগে শ্রীকবিবল্লভ।"

(৩) "শ্রীকবিবল্লভে গান গোবিন্দে ভকতি।"

ইত্যাদি কিন্তু তিনি চৈতন্যসম্প্রদায়ীছিলেন কি না সন্দেহ, কারণ একস্থলে দেখিতে পাই;—

"শ্রীকবিবল্লভে গান সেবিয়া ঈশ্বর।
বজ্জর॥"

তিনি এ ভাবে ব্যবহার করিতে পারিতেন
হইলেই যাহারা মহিমান্বিত মনে করে
তন না।

আছে,

তোমার চরণতলে, কাতর সেবকে বলে
তব পায় লক্ষ পরণাম।
দেবতা না পায় মর্ম্ম, কশ্যপের যোগে জন্ম
ধর দেবী মহীতুল্য নাম।
বিষম বসন্ত বল, বধিলে রাবণবল
প্রথমে পূজে রঘুরাম।
রূপের তুলনা দিতে, না দেখি ত্রিজগতে
ব্রহ্মা আদি কহিতে নারিল।
নারদ পুজিল পায়, রতন নূপুর পায়
পদতলে নিবেদি সকল।
কি কব রূপের ছন্দ, একত্র করিয়া বন্ধ
অমাবস্যা তাহাতে জড়িত।
মধ্যদেশ হরি জিনি- হরিনাবসনামর্দ্দনি
দশন ভুবন যে খণ্ডিত॥
চৌষট্টি বসন্ত সঙ্গে, উরিলে পরম রঙ্গে
নানাদেশ বুলেন ভ্রমিয়া।
বিষম প্রবন্ধ বল, ধুকুড়িয়া চামদল
লোকে দেহ বসন্ত ঘাইয়া॥
মা, তুমি যারে কর বিড়ম্বনা।
কাষ্ঠ জিনি কলেবর, কর তারে জর জর
অঙ্গে কর উঠের নাদনা॥
দেবতা অসুর নর,
সর্ব্বঘটে
শীতলা চরণতলে,
সংসার-

মঙ্গলাত্মক বাঙ্গালা
হইয়া থাকে, চণ্ডীমঙ্গল
লিখিত,

তাহার পর শীতলা নাগরিক বালকগণকে সোনার ভাঁটা লইয়া খেলা করিতে দেখিলেন, ক্ত,—

"নাহি দেখি কার মুখে বসন্তের চিন।"

শীতলা ভাবিলেন,—

"তিল মুগ মসুর ছাওয়ালে যদি দিব।
নৃপতি সভায় পূজা কেমনে পাইব॥"

কিন্তু ইহা ভাবিয়াই যে মা শীতলা একবারে ছাড়িয়া দিলেন, তাহা নয়, কবি লিতেছেন,—

"ছাওয়ালে দেখিয়া দয়া জন্মিল অন্তরে।"

এই দয়াই যে মা "শীতলার অনুগ্রহ" তাহা আর না বলিয়া দিলেও বুঝা উচিত।

তাহার পর শীতলা রাজার সভায় গিয়া উপস্থিত। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, মা মি কে? কেন আসিয়াছ? শীতলা বলিলেন,—আমার বাড়ী শান্তিপুর, আমার সাতটী ণবান্ পুত্র ছিল। দেশে অকালে বড় আকাল হইল, তাহার উপর বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব ইল। সকলে আমার স্বামীকে শীতলা পূজা করিতে বলিল। স্বামী শিবপূজা বিনা অন্য বতার পূজায় কোনমতে সম্মত হইলেন না। তিন দিনের মধ্যে শীতলার কোপে সাতটী মরিল। তোমার রাজত্বেও অনেক অবসন্ত লোক দেখিতেছি। এই বলিয়া শীতলা, ন্তে দেশের কত ভয়ানক অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনা করিলেন এবং ইহাও বলিলেন,—

"পশ্চিমেতে যার গায় নাহি হয় গুটি।
অপাক শরীর বল্যা নাহি দেই বেটী॥"

শীতলার এই অতিশয়োক্তি টুকু সত্য না হইলেও সরস বটে। অবশেষে বলিলেন, মারও শত পুত্র আছে, তাহাদের কল্যাণার্থ শীতলার পূজা কর। তাহার নিজ অনুগত চর জরাসুরেরও একটা ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—

"তার পর জরাসুর বড় মহাতেজা।
পুত্রের কল্যাণে রাজা কর তার পূজা॥"

রাজা উত্তর করিলেন,—

"নৃপতি বলেন বুড়ী হয়্যাছ অজ্ঞান।
কেমনে ছাড়িব আমি প্রভু ত্রিনয়ান॥"

তখন শীতলা শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। রাজা শিব শিব বলিয়া কর্ণে হাত দিলেন। স্থলে রাজোক্তির মধ্যে এক নূতন ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বড় কৌতুককর ও কিছু তিহাস-মিশ্রিত;—

"শিবনিন্দা শ্রবণে শুনিয়া নৃপবর। শিব শিব বলিয়া দুই কর্ণে দিল কর॥
জীব জন্তু অনেক বাড়য় অবনীতে। অবনীতে না সহে ভার লাগিল কান্দিতে॥

আপনি ত্যজিলেন প্রাণ দেবনিরঞ্জন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ দেবতা তিনজন॥
মড়া কান্ধে করিয়া বুলএ অবনীতে। কহেন উলূক মুনি ত্রিদেব সাক্ষাতে॥
তিলমাত্র আপোড়া পৃথিবী ঠাঞি নাই। ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি গোসাঞি॥
উলূকের কথা শুনি দেব ত্রিলোচন। বাম উরুভাগে কৈল ধর্ম্মের শাসন॥
বিষ্ণু হৈল কাষ্ঠ তাতে ব্রহ্মা হুতাশন। বাম উরুভাগে পোড়া গেল নিরঞ্জন॥
জন্ম জরা মৃত্যু যার নাই ত্রিভুবনে। হেন শিবের নিন্দা তুমি কর কি কারণে॥"

কবির উল্লিখিত এই নিরঞ্জন ঠাকুরটী কে? ইনি কি দুঃখে মরিলেন? ব্রহ্মা বি মহেশেরই বা সে জন্য পিতৃ মাতৃদায় কেন? তাঁহারা মড়া কাঁধে করিয়া ঘুরিতে গেলে কেন? পৃথিবীতে অদগ্ধ স্থানেই বা তাঁহার দাহ ব্যবস্থা কে দিল? উলূক মুনিটিই বা কে আর শেষে মৃত নিরঞ্জনকে দাহ করিবার জন্য বিষ্ণুকে কাষ্ঠ ও ব্রহ্মাকে হুতাশন হইতে হইল ত্রিলোচন বামউরুতে দাহ স্থান দিলেন,—ইহারই বা ব্যাপার কি?—কিছুই সহজে বু গেল না! নিরঞ্জন শব্দটী হইতে ইহার মধ্যে কোন বৌদ্ধসংশ্রব নিরূপণ করা যাইতে পা কি না তাহা বৌদ্ধতত্ত্বাভিজ্ঞগণ মীমাংসা করিবেন।

যাহা হউক, তাহার পর রাজা বলিলেন,—

"কেবা কার পুত্রবধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা॥"

সুতরাং পুত্রের কল্যাণার্থে বা তোমার অনুরোধে—

"জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।
শুনরে অজ্ঞান বুড়ী এথা হৈথে দূর॥"

কাজেই শীতলা বুড়ী চটিয়া গেলেন, রাগে নয়ন দুটী লাল হইয়া উঠিল; এমন জ্বরাসুর আসিয়া দেখা দিল।

শীতলা ক্রোধে জ্বরকে চন্দ্রকেতুর সর্ব্বনাশ করিতে আদেশ দিলেন। জ্বর বিক্রম ক চলিয়া গেল। জ্বর হাটে, বাজারে, গৃহে, কুটীরে ছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত ফুটি জাতি বিশেষে, কর্ম্মচারী বিশেষে মা শীতলা বিভিন্ন প্রকার বসন্ত নিযুক্ত করিলেন।

তাহার পর রাজার রাজত্বে লোকজন, হাতী ঘোড়া, পশু পক্ষী মরিয়া উজাড় হই শেষে রাজার ঊনসত্তরটী পুত্রও মরিল। রাণী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, তবু রাজা করিলেন না, বরং—

"রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিত আমি তার না লব প্রসাদ॥"

ঠিক কথা! রাজা প্রকৃত মামলাবাজ বটে, প্রবলের সঙ্গে লড়িতে হইলে হা হারানই পরামর্শসঙ্গত বটে। তাহার পর শিবগুণানুকীর্ত্তন করিয়া রাণীকে এ দিলেন, শিবেরই শরণ লইতে বলিলেন—এবং নিজেও দিবারাত্রি কুশাসনে বসিয়া শিবা

করিতে লাগিলেন। শিবশিরে শত কলসী ঘৃতমধু ঢালিয়া শিবচরণে সহস্রপদ্ম উৎসর্গ করিয়া রাজা পূজা করিলেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভোলানাথের প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, তিনি জনৈক পার্ষদকে ডাকিয়া, কোথায় কোন ভক্ত কি বিপদে পড়িয়াছে তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কবিবল্লভ শিবের এই পার্শ্বচরটীর এক নূতন নাম দিয়াছেন,—নন্দী, ভৃঙ্গী গণেশাদি পুরাণ প্রচলিত শিবানুচরগণকে উপস্থিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

কবি কল্পিত এই শিবানুচরের নাম "ভীমক্ষেত্র,"—

(১) "ভীমক্ষেত্রে ডাকিয়া বলেন পশুপতি।"

(২) "শুন ভীমক্ষেত্র তুমি আমার বচন।"

তাহার পর ভীমক্ষেত্র মহাশয় খড়িপাতিয়া চন্দ্রকেতুর সহিত শীতলার বিবাদে চন্দ্রকেতুর যে অবস্থা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া শিবকে জানাইলেন। শিব মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্বদলবল সংগ্রহ করিলেন,—চৌদ্দ-লোকপতি, পঞ্চাশহাজার দানা ও একলক্ষ ভূত জড় হইল। কবি এই দলের সেনাপতি-গোছের একজনের পরিচয় দিয়াছেন,—

"নেকা টেঁকা মেঘনাদ বিষম মূরতি।"

তৎপরে সকলে চন্দ্রকেতুর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। বসন্ত দূর করিবার জন্য,—

"মেঘনাদ আসি করে বিষম গর্জ্জন।"

এই মেঘনাদের কাব্যোচিত রূপকাবরণ ছাড়াইয়া যদি "মেঘের নাদ" এইরূপ একটা ধরা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় বসন্তকালে মেঘ গর্জ্জনাদি দ্বারা পৃথিবীতে তাড়িত বিস্তার ও পরোক্ষে বৃষ্টিপাত ইত্যাদিতে বসন্তোদ্রব শান্ত হওয়ার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়, এরূপ অনুমান করিলে অন্যায় হয় না। যাহাহউক শীতলা সে গর্জ্জন শুনিয়া একটু শিহরিলেন, ভূত ডাকিয়া বলিলেন,—

"প্রেত ভূত দানা সঙ্গে আইল শূলপাণি।
আর কি পূজিবে চন্দ্রকেতু নৃপমণি॥"

শীতলা পরামর্শ দিয়া ভূতের গাত্রে "ভূতমুখা" বসন্ত ফুটাইতে বলিলেন এবং নিজে ফকিরের বেশে বলিয়া শিবজ্বর হইয়া দেখা দিলেন। "ভূতমুখার" প্রভাবে ভূতেরা "মড়াকাঠ" হইয়া উঠিল, কাঁদিয়া শিবের কাছে গিয়া জানাইল,—

"বসন্তে ফাটিয়া মরি না দেখ নয়নে।"

শিবের মস্তিষ্কে তখন বড়ই গোল বাঁধিয়াছে। তিনি ভক্তের বিপদ দূর করিতে আসিয়া নিজে বিপদে পড়িয়াছেন, কাজেই কোন কথা তাঁহার কাণে প্রবেশ করিতেছে না। বলিতেছেন,—

"ভূতগণের কথা শিব না করে শ্রবণ।"

এদিকে শিব আসিয়া বড় কিছু করিতে না পারায়, রাজা ভাবিলেন "বাম্ হৈল ত্রিলোচন", কাজেই

"রাণীর সহিত যুক্তি করে নরপতি।"

রাণী কাঁদিয়া বলিলেন, ঊনসত্তরটী পুত্রকে শীতলা অনুগ্রহ করিয়াছেন, অতএব কি পুত্রকে কোথাও লুকাইয়া রাখ। রাজা সম্মত হইলেন এবং বলিলেন,—

"রাজা বলে শুন কথা। সূর্য্যসনে মোর মিতা॥"

অতএব উভয়ে সূর্য্যারাধনা করিলেন। সূর্য্য আসিলেন, রাজারাণী তাঁহার হস্তে পুত্রকে অর্পণ করিলেন, সূর্য্যও মিত্রপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজার অবশ্য স্বাস্থ্যরক্ষায় কি জ্ঞান ছিল বলিতে হয়। সংক্রামিত ব্যাধিপ্লাবিত স্থান ত্যাগ ও বসন্তাদিরোগে সূর্য্যরশ্মি কে উপকারী তাহা বোধ হয় তিনি বুঝিতেন, তাই এই ব্যবস্থা করিলেন। কবি এই রূপকা জানিতেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ইহা হইতে এইরূপ সূক্ষ্ম কারণ নিষ্কাশিত করিলে ব্যাখ্যা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

ওদিকে রাজপুত্র সূর্য্যসারথির তত্ত্বাবধানে রহিলেন। শীতলার টনক নড়িল। জ্বরাসু পলায়িত শীকার খুঁজিতে লাগিল। দেবীর আজ্ঞায় পদ্মা বা কমলা গণিয়া স্থান বলি দিলেন। জ্বরাসুর সেখানেও বসন্ত পাঠাইতে বলিল। বড় বড় বসন্তেরা মাথা হেঁট করি ক্ষুদ্র সূর্য্যমণি উঠিয়া শীতলার গুয়া পাণ লইল। সূর্য্য সারথিই রাজপুত্রকে রাখিয়াছে সুতরাং বসন্ত গিয়া আগে তাঁহাকেই ধরিল। জ্বর শিবজ্বর পাইয়া বসিল। সারথি শয্যা হইল। সূর্য্যের রথ আর চলে না। সৃষ্টি যায়। সূর্য্যদেবের চাকুরীর ভয় হইল, তা উপর তাঁহার গৃহিণী ছায়া আর এক গোল বাধাইলেন, তিনি বলিলেন,—

"দুহিতা যমুনা যম তনয় তোমার।
তেজময়ী পাছে হুঁহে করেন প্রতিকার॥"

কার্য্যেই সূর্য্যদেব ভীত হইলেন এবং আশ্রিত মিত্রপুত্রকে এক পদ্মের ভিতর লুকা রাখিলেন। সূর্য্যমণি বসন্ত তখন সূর্য্যলোকে রাজপুত্রকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। আবার চিন্তিত হইলেন। কমলা আবার গণিলেন। এবার শিশিরা বসন্তকে পা পাঠান হইল। শীতলা তাহার আস্ফালন শুনিয়া নিজ গলা হইতে শতেশ্বরী হার দিয়ে বসন্ত লাগিতেই সমস্ত পদ্ম বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল। রাজপুত্র কাঁদিতে লাগিলেন, প পদ্ম বলিল,—

"পদ্ম বলে শরণাপনে যদি ছেড়্যা দিব।
তবে কি আমারে হর মস্তকে ধরিব॥"

আমরা দেখিতেছি, শরণাগত রক্ষার্থ কবি পদ্মে যে সাহস ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রতিষ করিয়াছেন, দেবতা সূর্য্য ও দেবী ছায়াতেও তাহা রাখিতে পারেন নাই, বোধ হয় শিবেও

যাহা হউক রাজপুত্র কিন্তু আশ্রয়দাতার বিপদ আর অধিক ভারী করিয়া তুলিতে

রিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে পদ্মের মৃণাল ধরিয়া পাতালে প্রস্থান করিলেন এবং বাসুকীর কালে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

আবার গণনা, আবার সন্ধান। এবারে উঞানিয়া মুঞানিয়া দুই বসন্তভ্রাতা অগ্রসর ইল। ইঁহাদের প্রভাবে সর্পের অতি দুরবস্থা হইল,—

"মনুষ্য শরীরে হৈলে ত্যাগ করে বোল।
সর্পের শরীরে হৈলে সেহ ছাড়ে খোল॥"

বাসুকীপুত্র বসন্তপীড়ায় কাতর হইয়া পিতাকে অনুযোগ করিল এবং সর্পকুলের দুঃখ নাইল। তখন—

"সর্পের করুণা শুনি চিন্তিত বাসুকী।
প্রাণ দিয়া শরণাপন শিশু যদি রাখি॥"

তৎপরে শিবি রাজার কথা অর্থাৎ শ্যেন-কপোতসংবাদ স্মরণ করিয়া বাসুকী স্বগণ রক্ষার্থ াজকুমারকে পরিত্যাগ না করিয়া স্বর্ণরেখা পর্ব্বতের গহ্বরে লুকাইয়া রাখিলেন; বসন্ত াতৃদ্বয় কাজেই ফিরিয়া আসিল। শীতলা ভাবিলেন,—

"নীলকণ্ঠপ্রিয়াতাত তথি কেবা যায়।"

নীলকণ্ঠের প্রিয়ার পিতার গহ্বরে অর্থাৎ পর্ব্বতগহ্বরে কে যাইবে? কিন্তু বসন্তের জারে অভাব কি? এবার শিখরিয়া বসন্ত গুয়াপান লইল। এই বসন্তের প্রভাবে স্বর্ণরেখা র্ব্বত গলিয়া সুবর্ণরেখা নদী হইয়া গেল। রাজপুত্র আর বাঁচিতে পারিলেন না। তিনিও ন্তে ফাটিয়া মারা গেলেন।

এই রাজকুমারের পত্নী চন্দ্রকলা পিতৃগৃহে ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, পতির হইয়াছে। ভূমিকম্প, উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি প্রভৃতিতে শীতলা কতকটা তৃপ্তিলাভ রিলেন, কিন্তু—

"ত্রৈলোক্যতারিণী মাতা মনেতে ভাবিল।
ভালমন্দ চন্দ্রকলা কিছু না জানিল॥"

অতএব—

"বামকরে পাতি দক্ষিণ করে নড়ি। রাজকন্যার স্থানে চলিল দেবী বুড়ী॥
যেখানে বসিয়া আছে রাজার কুমারী। বিদুর বাড়ীকে যেন গোবিন্দ ভিখারী॥"

তাহার পর বলিলেন,—

"হেদে গো রাজার কন্যা আসি আশীর্ব্বাদে। একাদশী করাছি পারণ সজ্জা দে॥"

তখন—

"সুবর্ণ থালায় চাল কড়ি বড়ি নঞা। ঈশ্বরী সাক্ষাতে কন্যা দাণ্ডাইল গিয়া॥
ঈশ্বরী কহেন কন্যা কহি তব কাছে। উনসর্ত্ত ভাশুর তোমার বসন্তে মরেছে॥
পশ্চিম পর্ব্বতে তোমার মরিয়াছে পতি। কেমনে পারণা লব শুন গুণবতী॥

পূর্ব্বের তপন যদি পশ্চিমে উদয়। ... তথাচ আমার বাক্য মিথ্যা নাহি হয়॥"

তাহার পর শীতলা বোধ হয় তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং

"এত বলি তেজময়ী হৈল অন্তর্ধান। জানিল রাজার কন্যা স্বপ্ন যে বিধান॥"

তাহার পর,—

অনুমৃতা হতে সেথা চন্দ্রকলা যায়। আম্রশাখা ভাঙ্গি সতী হরিগুণ গায়॥

* * * * * *

রাজকন্যা সতী হৈল ঈশ্বরীর বোলে। রাম রাম গোবিন্দ গোবিন্দ ঘন্ বলে॥
কৌষিকী রাজার রাণী সমাচার পেয়্যা। ধরিল কন্যার গলে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
রাজরাণী বলে বাছা কি বুদ্ধি তোমার। ভাণ্ডারে সকল ধন কর অধিকার॥
গৃহিণী হইয়া বাছা থাক মোর ঘরে। কেনবা অনাথ করে যাইবে আমারে॥"

এইস্থলে আমরা একটু ঐতিহাসিক কথা পাড়িব। কবির সময়ে অনুমৃতা হওয়ার প্রথা প্রবল ছিল, কিন্তু পিতামাতা অনুমরণকামা কন্যাকে ধনলোভ প্রভুত্বলোভ দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। যদিও বেণ্টিঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে সর্ব্বত্রই অনুমরণ-প্রথা বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তাৎকালিক কোন কাব্যে তাহার এরূপ বর্ণনা দেখা যায় না, বিশেষত কোন কবি নিজ কাব্যের নায়িকাকে অনুমৃতা করিয়াছেন, এরূপ পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না। কবিবল্লভ অনুমরণকামা চন্দ্রকলার মস্তকে আম্রপল্লবাদি দিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার সমকালে এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলে তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন, পুরাণজ্ঞানহীনের নিকট এরূপ বর্ণনা আশা করা যায় না। এ তাঁহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বর্ণনা। তাঁহাকে শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও পুরাণজ্ঞানহীন বলায় তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইতেছে না। এ পর্য্যন্ত তাহার কাব্যে যে সকল পৌরাণিকী কথা পাওয়া গিয়াছে তাহা কোন পুরাণের বর্ণনার সহিত সুসঙ্গত নহে, তবে শুনিয়া শুনিয়া লোকের ধারণাবশে যেরূপ জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ জ্ঞান হইতেই কবি পৌরাণিক প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

তাহার পর চন্দ্রকলা মাতাকে বলিলেন,—

"রাজকন্যা নিবেদিল জননীর পাশে। পাটে মোর রাজা নাই রাজা হব কিসে॥
অল্প বয়সে যার প্রাণনাথ মরে। সে বড় অজ্ঞান থাকে মা বাপের ঘরে॥
দিনে দিনে হয় তার নহলী যৌবন। মা বাপের হয় ঐরি বিধির লিখন॥
সে দুঃখ পাবার তরে রাখিবে আমারে। নীলকণ্ঠহার কেবা রাখিতে চায় ঘরে॥"

কবির "পাটে মোর রাজা নাই রাজা হব কিসে" এই চরণটির সরল মাধুর্য্যের তুল্য হয় না। তাহার পর চন্দ্রকলা যেরূপে মাতাকে প্রবোধ দিয়াছেন, তাহা নারীকুলের শিক্ষণী

নীলকণ্ঠহার সম্বন্ধে কবি যে কথা বলিয়াছেন, সেরূপ একটা প্রবাদ এখনও বাঙ্গালার মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেকে শুনিয়া থাকিবেন বোধ হয় যে "নীলম্" নামক রত্ন (অর্থাৎ নীল মণি) সকলের অদৃষ্টে শুভদায়ক হয় না, এজন্য সকলে সাহস করিয়া "নীলম্"

রাখিতে চায় না। এই নীলকণ্ঠহার অর্থে তদ্বৎ কোন রত্নালঙ্কার বা নীলমণির হারও [illegible]রে।

[illegible]র পর চন্দ্রকলা পতির মৃতদেহ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া—

[illegible]ঘিল কুন্তলে সতী দুটি পদ ছাঁদে। বদনে বসন দিয়া বিধুমুখী কাঁদে॥
প্রেমের পশরা কান্ত ছিলে মোর সনে। সুখের হাটে দাগা বিধি দিল এত দিনে॥"

[illegible]হার পর সতী আরা কাঁদিল না, অমৃমৃতা হইবার আয়োজন করিতে লাগিল। শীতলা [illegible]র বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীবেশে দেখা দিলেন। তখন—

"ব্রাহ্মণী দেখিয়া দণ্ডবত কৈল সতী। ঈশ্বরী বলেন হও জনম এয়তি॥
এত শুনি চন্দ্রকলা শীতলারে বলে। তব বাক্য মিথ্যা হল্য মৃতপতি কোলে॥
শীতলা বলেন কন্যা কহি তব ঠাঁঞি। আমার বচন মিথ্যা কভু হবে নাঞি॥

* * * * *

অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য শুন রূপসিনী। আমা আশীর্ব্বাদে তুমি হবে রাজরাণী॥

তাহার পর শীতলা চন্দ্রকলার পতির প্রাণদানার্থ একটা ছল পাতিয়া বলিলেন,—

"ঘরে আছে নাতিটী নাহিক মোর সাথ। পাতি বৈতে কাঁকালেতে ধরিলেক বাত॥
তব প্রাণনাথে যদি বাঁচাইতে পারি। পাতি বৈতে দিবে মোরে বলগো সুন্দরী॥
সতী বলে পতি যদি প্রাণ দান পাব। সত্য সত্য পাতিটি বহিতে আমি দিব॥"

মহিমাপ্রচারের জন্য শীতলা অনর্গল মিথ্যা কহিতে প্রস্তুত, রাজার সম্মুখে একবার [illegible]ত পুত্রের মরণের পরিচয় দিয়াছেন, এখানে আবার নাতির কথা বলিলেন। ভারতচন্দ্রের দার ন্যায় কবিবল্লভের শীতলা দুদিক্ বাঁচাইয়া পরিচয় দিতে পারেন না। তাহার পর সূর্য্য সাক্ষী করিয়া শীতলা কাপড়ের কাণ্ডার দিয়া মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্রে প্রাণদান দিলেন, [illegible]কোলে করিয়া চুম্বন করিলেন। তাহার পর—

[illegible]রাজকন্যার সত্য মাতা বুঝিবার তরে। দিলেন বসন্ত পাতি বহিবার তরে॥
[illegible]াগে আগে চলে শিশু পাতি করি মাথে। নড়ি ধরি চলে বুড়ী শিশুর পশ্চাতে॥
চন্দ্রকলা সতী তার পশ্চাতে গড়ায়। কত দূরে গিয়া মাতা পাছুপানে চায়॥
ঈশ্বরী বলেন কন্যা মোর কথা শুন। সত্য করে স্বামী দিলে পাছু আইস কেন॥
চন্দ্রকলা বলে মাগো তব দাস পতি। আমি তব দাসী হয়ে থাকিব সংহতি॥
প্রাণনাথ কাননেতে কুসুম তুলিব। চন্দন ঘসিয়া তব পাদপদ্মে দিব॥
এ কথা শুনিয়া দেবী ভাবয়ে অন্তরে। শুনগো রাজার কন্যা বর মাগো মোরে॥
চন্দ্রকলা বলে মাগো যদি বর দিবে। প্রথমে শ্বশুরে মোর কুবুদ্ধি ঘুচাবে॥
ঈশ্বরী বলেন কথা শুন মন দিয়া। মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্র তুমি যাও নঞা॥
[illegible]বে চন্দ্রকলা হৈল আনন্দিত মনে। মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্র শুনিল শ্রবণে॥
[illegible]ন্ত্র পেয়ে শশীমুখী আনন্দিত মনে। প্রাণনাথে সঙ্গে করি চলিল ভবনে॥

হেথা পুত্রবধূশোকে কান্দে রাজরাণী। শীঘ্রগতি চলে যেয়া লোকমুখে শুনি॥
পুত্রবধূ রাজরাণী করিলেন কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব খায় বদনমণ্ডলে॥
ধন্য তব জনক জননী রত্নাবতী। হেন কন্যা গর্ভে ধরে রত্নাবতী সতী
কন্যা বলেন ঈশ্বরী পূজহ মহারাজা। জীয়াইব ভাশুর আর পাত্র মন্ত্রী প্রজা
এত শুনি নিবেদিল নৃপতির ঠাঞি। যাহার প্রসাদে রাজা হারা মরা পাই।
পূজহ ঈশ্বরীপদ পূজ মৃত্যুঞ্জয়। নৃপতি বলেন মোর কথা হেন নয়॥"

এই উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যাইতেছে, কবি কিছু তাড়াতাড়ি কাব্য শেষ করিয়া এত তাড়াতাড়ি যে চন্দ্রকলাকে শীতলা নিজ পরিচয় দিবার অবকাশ পান নাই, এম যে জন্য কাব্যের জন্ম, শীতলা সেই চন্দ্রকেতুদ্বারা নিজ পূজার ব্যবস্থা করাইবারও প পান নাই, এমন কি বরদাসীর প্রার্থিত "শ্বশুরের দুর্ব্বুদ্ধিনাশ" বর প্রদান করিতেও গিয়াছেন।

রাজা চন্দ্রকেতু শীতলার অনুগ্রহ পাইলেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িতে পারেন অথবা রাজোপযুক্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবশতঃ রাণী ও পুত্রবধূর অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন

"পুনর্ব্বার পুত্র বধূ মরুক দুজন।
জন্মে নাহি ছাড়িব প্রভু ত্রিলোচন॥"

রাজা প্রতিজ্ঞা রাখিলেন, কিন্তু শিব ভয় পাইলেন। একে চন্দ্রকেতুর সাহায্যে আ মাত্রই শীতলা তাঁহার ভূতসেনাকে বসন্তে পাড়িয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে আবার তঁ জন্য শীতলার পূজাও রাজা বন্ধ করিতেছেন, কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া—

"ডাকিয়া বলেন কিছু প্রভু কৃত্তিবাসে॥
পূজহ ঈশ্বরীপদ শুনরে রাজন। একান্ত ভজিবে তুমি দেব ত্রিলোচন॥
শুনিয়া শিবের বাণী অঙ্গীকার করে। মর‍্যাছে যতেক লোক জীউক সত্বরে॥
মন্ত্রবলে শশিমুখী দিল জিয়াইয়া। নৃপতি দিলেন পূজা জয় জয় দিয়া॥
জয় জয় শব্দ হইল নৃপতি-ভবনে। পালা সায় রহে গান নৃপতি-কল্যাণে॥

ইতি চন্দ্রকেতুর পালা।

রাজা শেষকালে যে শীতলাপূজা করিলেন, তাহাও [illegible]ধে, সুতরাং তাঁহার একনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রহিল।

কাব্যাংশ।—এই কাব্যানুসরণ করিয়া আমরা যতটা দেখিলাম, [illegible] কবির উ রচনায় যে বিশেষ কৌশল কিছু আছে, তাহা দেখিলাম না। কাব্য [illegible] ইহার সৌন্দ অধিক আছে, তাহাও বোধ হইল না;—তবে একবারে যে কিছুই নাই এমন নহে, দু' নূতন ছন্দও আছে।

(১) নিম্নলিখিত ছন্দটীর নাম কবি "একাবলী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"রাণী বলে নরপতি। কি হবে আমার গতি॥

উনসর্ত্ত তনয় মৈল। বধুয়া বিধবা হৈল॥
এ মুখ দেখাব কারে। প্রবেশি পাতালপুরে॥
পুত্র বিনে নাহি ধন। পিণ্ড দিব কোন জন॥"

এটি অষ্টাক্ষরী মিত্রাক্ষরা বৃত্তি। তৃতীয় চরণে "তনয়" শব্দ "পুত্র" শব্দে পরিবর্ত্তিত করিলে অক্ষরাধিক্য দোষ থাকিত না। "উনসর্ত্ত" শব্দটি "উনসত্তর"বোধক; উহা হয়ত কবির দেশপ্রচলিত কথোপকথনের ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) মা, তুমি যারে কর বিড়ম্বনা।
কাষ্ঠ জিনি কলেবর কর তারে জর জর
অঙ্গে কর উএর নাদনা॥

এরূপ ধুয়াবিশিষ্ট ত্রিপদী ছন্দ সমগ্র কাব্যে এই একটী মাত্রই আছে।

কল্পনা।—কবির কল্পনাশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত ছিল না। তাঁহার বিচারে চূড়ান্ত সুন্দর ছবি যে কি, তাহার একটা উদাহরণ তিনি চন্দ্রকেতুর প্রজার অবস্থা-বর্ণনার মধ্যে অতর্কিত ভাবে দিয়া গিয়াছেন,—

"সুবর্ণের কলসীতে প্রজা জল খায়। কেবা রাজা কেবা প্রজা চেনা নাহি যায়॥
রোগ শোক নাহি জানে সদাই মদন। লিখিতে না পারে যেন ইন্দ্রের ভুবন॥
রাজার রাজ্যেতে কেহ নাহি করে ভাগা। কুলা ভরি ধান্য লেই তিল ভোর বিঘা॥"

কবির মতে, প্রজা সুবর্ণের কলসীতেই জল খাউক, আর রাজায় প্রজায় সমান ভাবেই হউক, যদি তাহাকে ভাগে চাষ করিতে না হয়, যদি সে কুলা ভরিয়া ধান লইতে পায় এবং তার বিঘা ভোর জমীতে তিল জন্মে, তাহা হইলে আর তাহার দুঃখ কি? ইহা হইতে আমরা কবির নিজের অবস্থাও অনুমান করিতে পারি।

ভাষা।—ভাষাগত বিশেষত্ব এই কাব্যে বড় বেশী নাই, যাহা আছে, তাহা দেখাইতেছি—

(১) কাঁটাল্যা বসন্ত বলে দেবী বিদ্যমান।
(২) শিখর‍্যা বসন্ত বলে দেবী বিদ্যমান।

এইরূপ "বেঁউচ্যা", "গগর‍্যা"। এরূপ শব্দ আরও আছে। এখনকার ভাষায় এইগুলির ও আকারটীকে বিস্তৃত করিয়া "কাঁটালিয়া" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "শিখরিয়া", "বেঁউচিয়া" এইরূপে লেখাই প্রথা ও শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। "মগর‍্যা"টি মগরিয়া না হইয়া বোধ হয় মগরাই হয় (যেমন খাগ্‌ড়াই)।

(৩) আভরণ ত্যজিলেন রূপা আদি হীরা।

কবি যদিও চন্দ্রকেতু রাজার প্রজাবর্গকে সোণার কলসীতে জল খাওয়াইয়াছেন, সোণার থালে লইয়া শিশুদিগকে খেলা করাইয়াছেন, তবু এই চরণটীতে রূপার আভরণ ভিন্ন সুবর্ণের অলঙ্কারের উল্লেখ করেন নাই। যদিও এস্থলে "আদি" শব্দের প্রয়োগ আছে ও হীরকের উল্লেখ আছে, কিন্তু কবির সামাজিক অবস্থা যাহা ছিল, সে অবস্থায় লোকে রূপার গহনা

পরিতে পারিলেই কৃতার্থজ্ঞান করিত এবং কবিও সেই অবস্থার লোক ছিলেন বলিয়া, ম শীতলার গাত্রে রৌপ্যালঙ্কারের প্রাধান্য রাখিয়া গিয়াছেন। হীরকের উল্লেখ এস্থলে মে কবি একান্ত ধনের মান রাখিবার জন্যই করিয়াছেন। কবির সামাজিক অবস্থা সম্বং আমরা যদি এরূপ অনুমান করি, তাহা হইলে বোধ হয় কোন অন্যায় করা হয় না।

"বাম হাতে ছেল্যা মুণ্ড ভল্লুক-বাহন।"

এই "ছেল্যা" শব্দ অবশ্য পূর্ব্বোল্লিখিত "শিখরীয়া", কাঁঠালিয়া"র ন্যায় এখনকার ভাষ "ছেলিয়া" রূপধারণ করে না বটে, কিন্তু হিন্দী ভাষায় ছেলিয়া হয়। এরূপ স্থলে এই ও আকারের প্রয়োগ রাঢ়ীয় বিকার কি না তাহা জানি না, তবে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় "ছা প্রয়োগ শুনিয়াছি।

"শীতলা বলেন ঘুচাইব সোণা শেঁকা।"

"শেঁকা" অবশ্য এতদঞ্চলে "শাঁখা" রূপে লিখিত হয়। আসলে ইহা "শঙ্খ" শ অপভ্রংশ। "শেঁকা" বা "শেঁখা" রাঢ়ীয় বিকার বটে। এইরূপ "ভাঁটা স্থলে "ভেঁটা"—"সুব ভেটা লঞ্যা শিশুগণ খেলে।"

"আগমন" অর্থে "গমন" শব্দের প্রয়োগ—

"ব্রাহ্মণী দেখিয়া রাজা করে নিবেদন।
কি কারণে মোর স্থানে করেছ গমন॥"

"দেয়" অর্থে "দেই" এবং "নাপাক" অর্থে 'অপাক'—

অপাক শরীর বল্যা নাহি দেই বেটী।"

উর্দ্দু ভাষায় "নাপাক" অর্থে অপবিত্র, বাঙ্গালী কবি সেস্থলে "অপাক" শব্দ ব্যব করিয়া নিজে যে ভাষাটী ভাল হজম করিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। " অর্থে "দেই" শব্দের প্রয়োগ ঠিক প্রাদেশিক প্রয়োগ নহে, ইহা উক্ত শব্দের প্রাচী মাত্র, কারণ উহা প্রায় সকল প্রদেশের কবির লেখাতেই দেখা যায়। "বল্যা" ও " উভয়বিধ প্রয়োগই দেখা যায় যথা—"শিব শিব বলিয়া দুই কর্ণে দিল কর।" এইরূপ রূপের প্রয়োগ দেখিয়া বোধ হয় যে (কহনার্থ) "বলে" পদের সহিত "বলিয়া" অর্থের হেতুবোধক "বলে" (যাহার উচ্চারণ বোলে) পদের পার্থক্য রাখিবার জন্যই " এই রূপের উদ্ভাবন করা হইয়াছে; কিন্তু এ উদ্ভাবন এই কবির নিজস্ব নহে, ইহার বহু কালের কবির রচনাতেও এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। অকারান্ত উচ্চারণবিশিষ্ট লাস্ত পদ গুলিতেও কবি একটী করিয়া যফলার ব্যবহার করিয়াছেন, আবার কোথাও করেন নাই।

(১) তার বাড়ী চলিল বসন্ত গজগুঁড়া।
(২) রাজার মহলে শীঘ্র প্রবেশিল গিয়া।
(৩) পূর্ণ হাট বসাইল, বসাইতে না পাইল।

অন্যত্র—

(১) আলকুশা বসন্ত বেরাইল্য তার গায়।

(২) তার বাড়ী বসন্ত পাঠাইল্য চামদল।

(৩) মৈল্য যত প্রজালোক, মোরে হৈল্য পুত্রশোক।

রূপ করিবার অর্থ কিছুই দেখা যায় না।

প্রথম পুরুষের কর্ত্তায় উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহারও এ কাব্যে বিরল নহে;—"আর পূজিব চন্দ্রকেতু নৃপমণি।" এস্থলে "পূজিবে" অর্থে "পূজিব" প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২) পুত্র বিনে নাহি ধন। পিণ্ড দিব কোন জন॥

লে 'দিবে' অর্থে "দিব" প্রয়োগ।

(৩) তোমা বিনে কেবা রাজা। অনাথ হইব প্রজা॥

এস্থলে 'হইবে' অর্থে "হইব" প্রয়োগ।

বস্তুবাচক শব্দের স্থলে ব্যক্তিবাচক শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন কবিদের কাব্যে যথেষ্ট দেখা কবিবল্লভের রচনাতেও তাহা আছে,—

"সূর্য্য সনে মোর মিতা।"—

স্থলে "মিতালী" অর্থাৎ মিত্রতা অর্থে 'মিতা' শব্দের প্রয়োগ।

ভিন্নার্থে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ—

"দুহিতা যমুনা যম তনয় আমার।
তেজময়ী পাছে দুঁহে করেন প্রতিকার॥"

স্থলে 'অধিকার' অর্থে 'প্রতিকার' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে; কিন্তু প্রতি উপসর্গের প্রতি কবির উদ্দেশ্যের একটা বিশেষ টান আছে। সূর্য্যলোকে রাজপুত্রকে বসন্ত লুকাইয়া রাখা হইলে, শীতলা সূর্য্যলোকেও বসন্ত ছড়াইয়া দেন। পুত্রকন্যার প্রতি শীতলা অনুগ্রহ করেন, এই ভয়ে সূর্য্যপত্নী ছায়া সূর্য্যকে ঐ কথা বলিতেছেন। অতএব হয় যে, ছায়া ভাবিতেছেন, শীতলার শীকার রাজপুত্রকে আনিয়া রাখা অপরাধে প্রতিশোধ দিবার জন্য যদি তাঁহার পুত্রকন্যাকেই আক্রমণ করেন। প্রতিকার প্রতি' উপসর্গ হইতে আমরা কবির অন্তরস্থ প্রতিশোধের ভাবটুকু বোধ হয় টানিয়া করিতে পারি।

টী কবিকল্পনার সমাস অতি সুললিত বটে—

"নীলকণ্ঠ-প্রিয়া-তাত তথি কেবা যায়।"

কণ্ঠের (শিবের), প্রিয়া (পত্নীর), তাত (পিতা) অর্থাৎ হিমালয় হইলেও ব্যাপ্ত্যর্থে ত্র অর্থ গৃহীত হইয়াছে। "তথি" তথায়।

"বিদুর বাড়ীকে যেন গোবিন্দ তিখারী।"

'বাড়ীতে' স্থলে "বাড়ীকে" বর্দ্ধমান অঞ্চলে কথোপকথনের ভাষায় সপ্তমী বিভক্তি "এ"ও "তে" চিহ্নের স্থলে "কে" চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যেমন ঘরকে যাবি ?

দিগম্বরী বেশ ধর ইবেশ ছাড়িয়া।

এস্থলে "ই" শব্দটী "এই" শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই "এই" শব্দ ২৪ পরগণা, হুগ নবদ্বীপ প্রভৃতি জেলার ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে 'এ' হয়। আর বর্দ্ধমান অঞ্চলে 'ই' হ সুতরাং এই "ই" হইতে আমরা কবিকে রাঢ়ীয় লোক বলিয়া ধরিতে পারি।

বিশেষার্থক শব্দাবলী।—

"রাজকন্যা সতী হৈল ঈশ্বরীর বোলে।"

ইংরাজেরা "She became a *Sutee* on her husband's funeral pile" এতদ্বা সতী শব্দের যে অর্থে প্রয়োগ করে, এস্থলে কবি সেই অর্থে সতী শব্দের প্রয়োগ করিয়া সতীশব্দের এরূপ অর্থ এখনকার ভাষায় চলিত নাই।

"অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য শুন রূপসিনী।"

এস্থলে "রূপসিনী" এরূপ পদ ভুল হয়, "রূপসী" শব্দকে পর পংক্তির "রাজর শব্দের সহিত মিত্রাক্ষর করিবার জন্য ঐরূপ করা হইয়াছে। এরূপ ভুলগুলি সংস্কৃতে " প্রয়োগ" বলিয়া উপেক্ষিত হয়, আমরা বাঙ্গালায় "কবিপ্রয়োগ" বলিয়া ছাড়িয়া দিতে প আজকালকার লেখকেরও যে এ দোষ নাই, এমন নহে,—"সুকেশিনী শিরশোভা ে ছেদনে",—সুকেশী বা সুকেশা পদই শুদ্ধ, সুকেশিনী হয় না।

"পাতি বৈতে কাঁকালেতে ধরিলেক বাত।"

"বৈতে" অর্থ 'বহিতে' এবং "কাঁকালে[redacted]" কটিদেশে।

"সতী বলে পতি[redacted]প্রাণদান পাব।"

"পায়" বা "পাইবেন" অর্থে "পাব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

"কাপড় কাণ্ডার দেবী বেড়ি দিল তথা"

'কাণ্ডার' অর্থে পর্দ্দা, আবরণ ইত্যাদি।

"মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিল।"

"মৃতসঞ্চারিণী" স্থলে "মৃতসঞ্জীবনী" হওয়াই কবির উদ্দেশ্য; ঠিক বলা যায় লিপিকর-প্রমাদ কি না।

"চন্দ্রকলা সতী তার পশ্চাতে গড়ায়।"

"গড়ায়" অর্থে অনুসরণ করে।

"কত দূরে গিয়া মাতা পাছু পানে চায়।"

"পাছু" অর্থে পশ্চাতে।

আমি গিয়া যার ঘরে করি বিড়ম্বনা।
সোণার শরীর করি উএর নাদনা॥

এস্থলে "নাদনা" শব্দের অর্থ যতটা বুঝা যায়, তাহাতে ঢিপি বা স্তূপ বলিয়াই অনুমান হয়। উইয়ের ঢিপি যেমন অন্তঃশূন্য, বসন্তের প্রকোপে সোণার ন্যায় শরীরও সেইরূপ অন্তঃশূন্য হইয়া যায় বা উইয়ের ঢিপির উপরিভাগ যেমন অমসৃণ, বসন্তের চিহ্নে সোণার শরীরও সেইরূপ বিকৃত হইয়া যায়; এইরূপ অর্থই এস্থলে অনুমিত হয়।

"নেকা চেঁকা মেঘনাদ বিষম মূরতি।"

এস্থলে "নেকা চেঁকা" এক কথা কি স্বতন্ত্র অর্থবিশিষ্ট দুই কথা তাহা বুঝিলাম না। অনুমানে অঙ্কন অর্থে লিখন এবং তদর্থে লিখন শব্দের অপভ্রংশ "নেকা" হইতে পারে। "চেঁকা" অনুকারক শব্দ। মেঘনাদের মুখখানা নানারূপ চিত্রিত (অবশ্যই ভয়োৎপাদক) এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

"তেজময়ী বলেন তবে না হইল পূজা।
নিদান রাখিল পুনঃ চন্দ্রকেতু রাজা॥"

এস্থলে "নিদান" শব্দের কি অর্থ বুঝা গেল না। আমাদের এতদঞ্চলে কথোপকথনের ভাষায় নিদান শব্দ বিকৃত হইয়া "নিদেন" হয় এবং 'একান্তপক্ষে' এইরূপ অর্থপ্রকাশ করে। এস্থলে চন্দ্রকেতু কনিষ্ঠ পুত্রকে সূর্য্যলোকে লুকাইয়া রাখায় শীতলা ঐ কথা বলিতেছেন, সুতরাং এস্থলে যদি এরূপ অর্থ করা যায় যে, 'একান্তপক্ষে রাজা চন্দ্রকেতু এ পুত্রটিকে রক্ষা করিতে পারিল'—তাহা হইলে এই নিদান শব্দের অর্থ যেন কতকটা হয়।

"পদ্ম বলে শরণাপনে যদি ছেড়্যা দিব।
তবে কি আমারে হর মস্তকে ধরিব॥"

'শরণাপন্ন' অর্থে "শরণাপন" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। ইহা বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদ।

"প্রাণ দিয়া শর্ণাপন শিশু যদি রাখি।"

"শরণাপন্ন" শব্দের অন্তর্গত নানাবর্ণের বিকার ঘটিয়া শর্ণাপন হইয়াছে। এরূপ স্পষ্ট স্মরক শব্দকে কোন দিন স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। উপরিলিখিত ণাপন" শব্দকেও স্বতন্ত্র শব্দ ধরা উচিত নহে।

"ডান হাতে আশাবাড়ি বামহাতে পাতি।
চৌষট্টি বসন্ত মাতা রাখিলেন তথি॥"

শাবাড়ি" কি তাহা জানিনা, তবে "বাড়ি" অর্থে "নড়ি" "লাঠি," "ছড়ি" ইত্যাদি "পাতি" অর্থে পেঁতে, চুবড়ি। "তথি" অর্থে তথায় কিন্তু এখানে "তাহাতে"।

পরে যে সকল ভাষাতত্ত্ব আলোচিত হইল, তদ্দ্বারা আমরা এই কাব্যখানি ভারত-পূর্ব্বের গ্রন্থ বলিয়া গণনা করিতে পারি, কারণ ভারতচন্দ্রের সময়ে ভাষা যে ণ মার্জ্জিত হইয়াছিল, ইহার ভাষা সে পরিমাণে মার্জ্জিত নহে। আবার কবিকঙ্কণাদির

ভাষার ন্যায় তত প্রাচীনাবস্থাসূচকও নহে। অনুমান হয়, ইহা কেতকাদাসাদির সমকালের রচনা।

ইতিহাস।—এই কাব্য হইতে সামাজিক ইতিহাস-সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। যে স্থলে শীতলা-দেবীকর্ত্তৃক চন্দ্রকেতুর রাজ্যে প্রজার জাতিনির্ব্বিশেষে বসন্ত-ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থলে কয়েকটী জাতির ও রাজকর্ম্মচারীর ব্যবহার বর্ণিত আছে। কবির সময়ে সেই সকল জাতির ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা এখানকার লোকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইতেছে,—

"আমীন মাপএ জমী কোণে কোণে দড়া। তার বাড়ী চলিল বসন্ত গজশুঁড়া॥

* * * * * *

শ্রাদ্ধ সময় ভাট বোধ নাহি যায়। আমবোয়া আলকুশা বসন্ত বেরাইল্য তার গায়॥

* * * * * *

গোয়ালা বিচিত্র ঘোল তাতে দিয়া জল। তার বাড়ী বসন্ত পাঠাইল চামদল॥
আসি বলি নাপিত ভাঁড়ায় মনুষ্যেরে। ঊঞানিয়া বসন্ত ধরিল গিয়া তারে॥
বাসিবস্ত্র দিলে রজক সুখে পরে। পোড়া মসুরিয়া পাঠাইল্য তার ঘরে॥
অনেক ছলনা ধরে কোটাল নিশাচর। মগর‍্যা বসন্ত পাঠাইল্য তার ঘর॥"

গোয়ালা, ধোপা, নাপিত এখনও যে এ স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য কেহ দিবেন কি না জানি না।

এতদ্ভিন্ন আরও একটী কথা বলিতেছি। কেতকাদাসাদির মনসামঙ্গলের নায় চাঁদবেণে শিবভক্ত ছিলেন, আর এই কাব্যের নায়কও শিবভক্ত। উভয়েই প্রাণ শিবোপাসনা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন অথচ দেবীরাও তাঁহাদিগকে ভিন্ন আর কা দ্বারা আপন আপন মহিমা প্রচার করাইতে সম্মতা নহেন। শিবভক্তগণকে দেবী করিবার এই চেষ্টা দেখিয়া বোধ হয় যে, যে সময় বাঙ্গালায় শৈবধর্ম্মের সহিত শক্তিধ সংঘর্ষ হয়, সেই সময়ে এই সকল দেবীমহিমা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। তন্ত্র-প্র প্রতিষ্ঠার সময়েই এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবী আপন আপন পূজাস্থাপনে ব্যস্ত হইয়া থা বোধ হয়, নতুবা শিবভক্ত নায়কগণকে এতটা দেবীদ্বেষী করিয়া অঙ্কিত করিবার অ আর দেবীগণের ব্রতদাস-নিরূপণার্থ শিবভক্তকেই নির্ব্বাচিত করিবার কারণ কি? এই সকল উপাখ্যানকে প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে এরূপ ভাবের কো বলা বিড়ম্বনামাত্র।

কবিতার প্রসিদ্ধি।—ভারতের অসংখ্য কবিতার ন্যায় দৈবকীনন্দনের দুই কবিতাও বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে,—

(১) "সুখের হাটে দাগা বিধি দিলা এতদিনে।"
(২) "পাটে মোর রাজা নাই রাজা হব কিসে॥"

(৩) "কেবা কার পুত্র বধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা॥"

খুঁজিলে এরূপ সদ্ভাবব্যঞ্জক কবিতা আরও দুদশটী পাওয়া যায়।*

২। নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল।

গোকুল-পালা।

এই পালার যে পুঁথিখানি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও অধিক দিনের প্রতিলিপি নহে, তবে মৎসংগৃহীত পূর্ব্বোক্ত পুঁথিখানি-অপেক্ষা অধিক দিনের। ইহা ১২১৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে রামধন চোঙ্গদার নামক ব্যক্তির লিখিত। কাহার জন্য কোথায় লিখিত হয়, তাহার কোন উল্লেখ নাই। পুঁথিখানির বয়স ৮৮ বৎসর হইলেও ইহার অবস্থা ভাল। ইহার রচনা পূর্ব্বোক্ত কাব্যের রচনা হইতেও প্রাঞ্জল ও সরস। এই কবিও ভারতচন্দ্রাদির পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন বলিয়া অনুমান করা যায়, যথাস্থানে তাহার আলোচনাও করা হইয়াছে। পুঁথিখানি ৯ পাতা মাত্র, কবিতার সংখ্যা প্রায় ৩৫০ হইবে।

কবি নিত্যানন্দের বিশেষ পরিচয় কাব্যের দুই স্থলে পাওয়া গিয়াছে; এক স্থলে,—

"সৌতিসম সর্ব্বশাস্ত্র, শ্রীযুত ভবানী মিশ্র, তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তার পুত্র চিরঞ্জীব, কি গুণে তুলনা দিব, যার সথা প্রভু দামোদর॥
মহামিশ্র তস্যাত্মজ, শ্রীরাধাচরণাম্বুজ, চৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভ্রাত, নিত্যানন্দ নামযুত, গাহে ভেবে শীতলাচরণ॥"

আর এক স্থলে—

াটাদের ডিণ্ডিসাঞি গোত্র ভরদ্বাজ। মহামিশ্র রাধাকান্ত খ্যাত ক্ষিতিমাঝ॥
তীয় আত্মজ তার দৈব অনুবলে। দ্বিজ নিত্যানন্দ রচে সাধনের ফলে॥"

এতদ্ভিন্ন কয়েক স্থলের ভণিতা হইতে আমরা পাইয়াছি ঃ—

চিন্তিয়া শ্রীশীতলার পদ্মপাদদ্বন্দ্ব। বিরচিল চক্রবর্ত্তী কবি নিত্যানন্দ॥"

ই সকল হইতে আমরা দেখিতেছি, কবি নিত্যানন্দ ভরদ্বাজগোত্রোদ্ভূত ডিণ্ডীসাহী াই) গ্রামী কাঁটাদিয়াবাসী ছিলেন। ইহার বংশে প্রথমে ডিংশাই, পরে মিশ্র, পরে

ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদের "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল" প্রবন্ধে বৌদ্ধ হারীতী দেবীর প্রসঙ্গ আছে ব উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ভুল। উহা শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরাজী (বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবন্ধে আছে।

চক্রবর্ত্তী উপাধি প্রচলিত হয়। ইহার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের নাম পাওয়া গিয়াছে এবং ইহারা যে অন্ততঃ তিন সহোদর ছিলেন, তাহাও জানা যাইতেছে; কেননা তিনি আপনাকে চৈতন্যের মধ্যম ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার অন্ততঃ একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। কবির বংশাবলী এইরূপ,—

ভবানী মিশ্র ... ... (কবির প্রপিতামহ)
|
চিরঞ্জীব ... ... (পিতামহ)
|
মহামিশ্র রাধাকান্ত ... ... (পিতা)
|
চৈতন্য নিত্যানন্দ (নাম অপ্রাপ্ত)
(শীতলা-মঙ্গল প্রণেতা)

কবির বংশ ডিণ্ডীসাহীগ্রামী। এই গ্রামীণেরা বল্লালসেনের সময় হইতে কৌলীন্য-হীন ছিলেন, প্রত্যুত বল্লালসেনের প্রদত্ত স্বর্ণময়ী ধেনুদান লইয়া যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত হন, তাঁহাদের মধ্যে ডিণ্ডীসাহীগ্রামী শঙ্কর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। কবির বংশ এই পতিত শঙ্কর ডিণ্ডীসাহী হইতে উদ্ভূত কি না কে জানে? লক্ষ্মণসেন যখন কুলীনের মুখ্য, গৌণ ও বংশজভেদ স্থাপন করেন, তখন ডিণ্ডীসাহীগ্রামী জনার্দ্দন গৌণ কুলীনশ্রেণীতে গৃহীত হন, কবি নিত্যানন্দ এই ব্যক্তির বংশ-জাত কি না, কে বলিবে? দনৌজামাধব যখন কুলীন ও শ্রোত্রিয় সংজ্ঞকভেদ প্রবর্ত্তিত করেন, তখন তাঁহার আদেশে ডিণ্ডীসাহী গ্রামীণেরা সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় সংজ্ঞায় অভিহিত হন। দেবীবরের সময়ও ডিণ্ডীসাহীরা ঐ মর্য্যাদাতেই অবস্থিত ছিলেন। যাহাহউক কবির কুল-পরিচয়ের ইতিহাস অনুসন্ধানে আর অধিক সুবিধা নাই। কবির বংশের বাসগ্রাম কাঁটাদিয়া, কবির জন্মস্থান বলিয়া যত প্র না হউক, এক শাখার কুলীনাবাস বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। বল্লালী কুলীন মকরন্দ ব জ্যেষ্ঠপুত্র দাশরথী এই গ্রামে বাস করেন, তদবধি একাল পর্য্যন্ত তাঁহার উত্তর আপনাদিগকে "কাঁটাদিয়ার বাঁড়ুয্যে" বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছেন।

কবি নিত্যানন্দ কোন্ সাম্প্রদায়িক ছিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার কোথাও তাহার সুস্পষ্ট আভাস নাই! তবে তাঁহার এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন (নিত্যানন্দ ও চৈতন্য) দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার পিতা চৈতন্য-সম্প্রদায়ী ছিলেন, তাহাও এই সামান্য প্রমাণের বলে নিঃসন্দেহে বলা যায় না। একটি ভণিতায় পাইয়াছি;—

"চক্রবর্ত্তী নিত্যানন্দ রচে মধুক্ষর। শীতল্যা পিরীতে হরি বল নর॥"

এই "হরি বল" হইতে কবিকে যদি কেহ বৈষ্ণব বলিতে চাহেন, তাহাতে আ কোনই আপত্তি নাই। যাঁহাদের এরূপ ধারণা, তাঁহাদের জন্য আরও একটী ভণিতা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"ব্রাহ্মণে করিতে কৃপা ব্রাহ্মণীর গুণে।　　নারায়ণ চিন্তি মনে নিত্যানন্দ ভণে॥"

নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গলের বিবরণ এইরূপ,—

"গোকুল-পালা।—

রঙ্গরসে কর্য্যা স্থিতি রোগপুরপাটনে।　　বসন্তকুমারী বস্যা বস্যা ভাবে মনে॥
ব্রণব্যাধি-যানে বেড়াই চৌদ্দভুবন।　　সত্য ত্রেতা নিলাম পূজা শাস্যা ত্রিভুবন॥
দ্বাপরেতে দাসী সঙ্গে বস্যা যায় দিন।　　মহীতলে হল নাঞি মহিমার চিন॥"

কবি নিত্যানন্দের কল্পনা বড় তেজস্বিনী। শীতলার অবস্থানের জন্য তিনি স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও স্থান না করিয়া "রোগপুরপাটনের" সৃষ্টি করিয়াছেন, শীতলার চৌদ্দভুবন ভ্রমণ করিবার জন্য "ব্রণব্যাধিরূপ যানের" সৃষ্টি করিয়াছেন, আর শীতলার নাম দিয়াছেন "বসন্তকুমারী"। যে পুরাণকার কবি যেন ব্রণভয়ে ভীত হইয়া এই দেবীর নাম শীতলা রাখিয়াছিলেন, তাঁহা অপেক্ষা বাঙ্গালী নিত্যানন্দকে অধিক সাহসী বলিতে হয়, তিনি নির্ভয়ে দেবীর নাম "বসন্তকুমারী" রাখিয়াছেন। যে বাঙ্গালী ভয়ে বসন্তের নাম করে না, বলে "মার অনুগ্রহ", সেই বাঙ্গালীরই জনৈক কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মার বাস্তবিক অনুগ্রহলাভাশয়ে, মার উপযুক্ত নাম-ধাম-যানাদির কল্পনা করিয়া একটু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন বলিতে হইবে।

তাহার পর কবি শীতলাকে সর্ব্বকালজয়িনী করিবার জন্য দ্বাপরে কিরূপে মহীতলে মহিমার চিহ্ন থাকিবে, তাহা ভাবিতে বসাইয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, মহিমা প্রচার করিতে হইলে, দেবদেবীদিগের একার যুক্তিতে কিছু হয় না, কাহারও সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক হয়, সুতরাং প্রথানুসারে শীতলারই বা না হইবে কেন? দৈবকী-নন্দনের শীতলাও জ্বরাসুরকে ডাকিয়া ছিলেন, নিত্যানন্দের বসন্তকুমারীও তাঁহাকেই ডাকিলেন ;—

"যুক্তিহেতু জগৎমাতা জ্বরাকে জিজ্ঞাসে।　　পৃথিবীতে পূজার প্রচার হয় কিসে॥
বুঝ্যা বুঝ্যা বিচক্ষণ বুদ্ধি দিল জ্বর।　　গুণ খ্যাত হবে যাহ গোকুলনগর॥
শিতে ক্ষিতির ভার দৈত্যের নিধনে।　　পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ নন্দের ভবনে॥
ল্যবেশে ব্রজপুরে বিহরে গোপাল।　　শ্রীদামের অংশকলা দ্বাদশ রাখাল॥
ড়শ সহস্র গোপী স্বয়ং আদ্যা রাধা।　　কলাবতী কেবল কৃষ্ণ অঙ্গ আধা॥
ক্ষাদি বাসনা করে যার পদধূলি।　　সে হরি আপনি গোপগোপী সঙ্গে কেলি॥
বতা তেত্রিশ কোটি ত্যজি স্বর্গশালা।　　ত্রিসন্ধ্যা গোকুলে আসি দেখে কৃষ্ণলীলা॥
সর্গপ্রিয়া গঙ্গা কাশী বারাণস।　　এসব এখন নয় গোকুল সদৃশ॥
ন গোকুলে মাতা পূজা নেয় যদি।　　ত্রিভুবনে যশ হয় জব্দ হয় ক্ষিতি॥"

শীতলা সত্য-ত্রেতায় ত্রিভুবন শাসিত করিয়া পূজা লইয়া গরবিনী হইয়া বসিয়া ; দ্বাপরে কিরূপে পৃথিবীতে মহিমার চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহাই ভাবিতে

ভাবিতে জরকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। জর, পৃথিবীর মধ্যে আপাততঃ কৃষ্ণাবতার হওয়াতে কাশী গঙ্গা প্রভৃতি অপেক্ষাও গোকুলনগরের শ্রেষ্ঠতা জানাইয়া, সেখানে পূজা লইতে পরামর্শ দিল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যে বিধিমত জব্দ হইবে, তাহাও বলিয়া দিল; কিন্তু শীতলার একটু ভয় হইল, একবারে নারায়ণের বিহারভূমিতে গিয়া অনুগ্রহ-বৃষ্টি করিতে তাঁহার প্রাণ একটু কাঁপিয়া উঠিল ;—

"যে কথা জরার সে যুক্তি অসম্ভব। শুনে শীতলার মুখে সরে নাঞি রব ॥"

কিন্তু তাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলে কৈ, কাজেই মার মুখে রব ফুটিল, তিনি জরাকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন ;—

"বাপু জরা বুদ্ধির বালাই লয়্যা মরি। যেই দিলেন চুরী বিদ্যা তার ঘরে চুরী ॥
নন্দের কানাঞে মোকে লাগে বড় ভয়। স্তনপানে পুতনা পাঠালে যমালয় ॥
চরণ নাচেড়ে ভঙ্গ দুর্জ্জয় শকট। বলা নয় ব্রজে যাওয়া বিষম সঙ্কট ॥

* * * * * *

ইন্দ্র যথা হারে তথা যেত্যা বল মোকে। মাতঙ্গ মন্দিরে সিংহ লজ্জা নাঞি ঢোকে ॥"

শীতলার এই ভীতি-কম্পিত কথাগুলি জরার বড় ভাল লাগিল না। শীতলা তাহাকে এতটা মূর্খ, অপরিণামদর্শী ঠাহরাইয়া রাখিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া বোধ হয় জরা একটু চটিল ও জোড়হাতে বলিল,—

"বিষ্ণু দিল বসন্ত ব্রহ্মার হয়ে ঝি। নবঅবতার কৃষ্ণ ভয় কর কি ॥
ব্রণ-জালে ব্রজপুরি চলগ্যা বেড়িব। মরি যদি মারে কৃষ্ণ মোক্ষপদ পাব ॥
পূজা নিতে পারি যদি পৃথ্বীতে রবে খ্যাত। যাত্রা কর ত্বরিত যা করে জগন্নাথ ॥
জরতী ব্রাহ্মণীবেশে যশোদা সাক্ষাতে। যে কিছু পূজার কথা যায় জানাইতে ॥
চল চল চক্রিণী চরণে পড়্যা কই। পাবে না পাবে না বিড়ম্বনা এই ॥
নিত্যানন্দ বলে চল দোষ কি তোমার। পশ্চাতে বুঝিব যত যোগ্যতা জরার ॥

এই স্থলে নিত্যানন্দ জরার মুখে শীতলাকে ব্রহ্মার নন্দিনী বলিয়া পরিচয় দৈবকীনন্দন তাঁহার "কশ্যপের যোগে জন্ম" বলিয়া গিয়াছেন। এস্থলে দুইটী কথাই পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং শীতলার জন্মের ঠিক হইল না; তবে শীতলা পৌ দেবতা, পুরাণের কথা না পাইলে কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না।

যাহা হউক জরার কথায় শীতলা একটু সাহস পাইলেন; জরার কথামত বৃদ্ধা বেশে, বামকক্ষে কলসী, দক্ষিণ হস্তে মুড়া ঝাঁটা লইয়া গোকুলে যাত্রা করিলেন ছদ্মবেশ ধরিলেন, কিন্তু তাঁহার শীতলাগিরির চিহ্ন "মার্জ্জনীকলসোপেতাম ত্যাগ করিতে পারিলেন না। একটী রঙ্গীন চুপড়িতে ভরিয়া বসন্তগুলিও লইলেন। করিবার সময়—

"গোবিন্দ স্মরণে গতি গোকুলের পথে ॥"

এই টুকুই বড় সুন্দর! জরা যতই সাহস দিক, মা শীতলা কৃষ্ণকে ভালরূপ চিনিতেন, কাজেই গোবিন্দ-মোহনার্থ যাত্রাকালে সেই গোবিন্দেরই নাম স্মরণ করিয়াই যাত্রা করিলেন। যখন শীতলা গোকুলের পথে প্রবেশ করিলেন, তখন কৃষ্ণ গোষ্ঠে আসিয়াছেন;—

"জাবটে প্রবেশ হৈল জানাতে রাধারে। হাসি হাসি রমানাথ বাঁশী নিল হাথে ॥"

এই দুইটি চরণে কবি গোষ্ঠ-প্রবেশকালে বংশীবাদনের যে কারণ দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। অনেক বৈষ্ণব কবির ও অনেক প্রাচীন কবির কাব্য এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছি, তাহার কোথাও এমন সুন্দর মধুর কারণোল্লেখ দেখি নাই; কিন্তু এই বাঁশী বাজাইবার কারণ বুঝিয়া আমরা যতই আহ্লাদিত হই না, আর বাঁশীর স্বরে শ্রীমতী রাধিকার যতই আনন্দোৎকণ্ঠার উদ্ভব হউক না কেন, মা শীতলার কিন্তু প্রীহা চম্‌কাইয়া গেল; কবি বলিতেছেন,—

"রাধা রাধা বলিয়া বংশীতে দিতে শাণ। শীতলার শুন্যা পথে উড়ে গেল প্রাণ ॥"

তার পর শীতলা পাছে কৃষ্ণের সম্মুখে পড়েন, এই ভয়ে পথ ছাড়িয়া এক নিম্ববৃক্ষমূলে লুকাইলেন। সেই বৃক্ষের নিম্ন দিয়া কৃষ্ণ ধেনুপাল ও দ্বাদশ গোপাল লইয়া চলিয়া গেলেন। শীতলা সেই "নটন গতিভঙ্গ" দেখিলেন, তখন—

"এ সব কৃষ্ণের কীর্ত্তি করি নিরীক্ষণ। দুনয়নে বহে ধারা ব্রণময়ী কন ॥
পৃথ্বী হলি পবিত্র পবিত্র হল মাটী। প্রত্যহ পড়িয়া কৃষ্ণের পাদপদ্ম দুটী ॥
তোর পৃষ্ঠে লীলা খেলা কৃষ্ণের বিহার। এমন পরমভাগ্য আর হবে কার ॥"

এইরূপে শীতলা একে একে পৃথিবীর, নন্দের, গোপগোপী, গোকুলের তরুলতা পশু র, শ্রীদামাদির এবং যশোদার কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে তাহাদের ভাগ্য-প্রশংসা করিতে করিতে র হইলেন। কৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন, তাঁহার যেন একটু সাহস হইল,—

শূন্য হল গোকুল বিপিনে গেল হরি। শীতলা বলেন আমি অকারণে ডরি ॥
ইবার যেতে হল যশোদা নিকটে। বিপ্র নিত্যানন্দ বলে এই যুক্তি বটে ॥"

তাহার পর শীতলা নন্দালয়ের পথ ধরিলেন।

ত গোপশিশু সঙ্গে যত গোপের মেয়্যা। জরাবস্থা বুড়ী দেখে সভে আইল ধেয়্যা ॥
বলে,
টা হাতে কুলামাথে কক্ষেতে কলসী। কে তুই কাহার মেয়্যা কোথারে যায়সি ॥"

পরে কেহ ডাকিনী বলিল, কেহ পিশাচী বলিল, কেহ গাত্রগন্ধে ধিক্কার তুলিয়া । শীতলা দোষ খুঁজিতেই আসিয়াছিলেন, এই অপমান দেখিয়া, অতি ক্রোধে অন্ধ তাহাদের পতিপুত্রের মুণ্ড-ভোজনের ব্যবস্থা করিতে করিতে, তাহাদের যৌবনোদ্ভাসিত সন্তে পচাইয়া দিতে দিতে চলিতে লাগিলেন, শেষে—

"গোসায় গর্গর বুড়ী উঠিতে পড়িতে। বসিল ব্রাহ্মণী যেয়া নন্দের বাড়ীতে॥"

তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করিয়া বুড়ী নন্দালয়ে ভিক্ষা চাহিল। যশোদা-রোহিণী স্বর্ণথালে ভিক্ষা লইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। শীতলা ভিক্ষা লইয়া নানা আশীর্ব্বাদের পর বসন্তভয়নিবারক-নিজ প্রসাদী ফুল দিয়া বলিলেন ;—

"সুখে স্বাস্থ্যে ঘর কর, শীতলার ফুলটি ধর, রোগ শোক বিঘ্ন যাবে দূর॥
পুণ্যবতী যশোমতী, তোমা চেয়া ভাগ্যবতী, ত্রিভুবনে আছে কোনজন।"

তাহার পর কৌশলে স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন,—

"কহিব কহিব করি, বুড়া লোক বড় ডরি, পাছে কিছু করা থাক মনে।
পূজা কর শীতলাই, বাড়ি দিবে গরু গাঁই, ছেলে দুটী থাকিবে কল্যাণে॥
শীতলাই স্বর্গ হইতে, পৃথিবীতে পূজা লইতে, বসন্ত আন্যাছে ষাটী ভার।
যে দেশে প্রবেশ হয়, * * সদা রয়, মানেনা ঔষধ প্রতিকার॥
* * * * * *
নন্দকে সংবাদ দিয়া, ব্রজ গোপ গোপী লয়্যা, পূজ পূজ শীতলা-চরণ।
আশীর্ব্বাদ লেহ মোর, পুত্রের কল্যাণ তোর, ব্রাহ্মণীকে করাও পারণ॥"

তাহার পর শীতলা কিসের জন্য পারণ করিবেন, তাহাই বলিলেন,—

"কপট করিয়া মাতা, সংযম ব্রতের কথা, কন বস্যা যশোদার পাশে॥
ভৃগুরাম মহামতি, নিক্ষত্রা করিলা ক্ষিতি, যে কালেতে তিন সাত বার।
সেই রক্ত মাংস গ্রাসি, পুণ্যব্রত একাদশী, সত্যযুগে সংযম আমার॥
ত্রেতাযুগে উপবাস, শ্রীরাম করিলেন নাশ, সীতার্থে রাক্ষস সমুদয়।
তা সভার মাংস মেদে, ত্রেতান্তে মনের সাধে, ফলমূল করিলাম লঙ্কায়॥
দ্বাপরে পারণার বিধি, গোকুল জাবটাবধি, গোপ গোপী আছে যত জনা
খেপালে ঠেকিবে দণ্ডে, আজি সভাকার মুণ্ডে, কর্য্যা যাব তুলসী-পারণা॥"

তুলসী-পারণা অর্থে সামান্য পারণা। ব্রতাদির পর পারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য, না করিলে ব্রতফল নষ্ট হয়, অথচ ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বে গৃহীর আহার নিষেধ স্থলে হরিচরণ-প্রসাদী তুলসীপত্রমাত্র চর্ব্বণ করিয়া গৃহী পারণ করিতে পারে, প্রস্তাবে ইহাই তুলসী-পারণা। মা শীতলা ত্রিযুগব্যাপিনী সংযম ব্রতের তুল করিবার জন্য নন্দরাণীকে যে ফর্দ্দ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডো সার্থক হয় বটে। শীতলা বলিলেন,—

"লহে সুখে থাক শুন, লক্ষ ভার ফল আন, মৎস্য মাংস তোমাকে না
যদি হইত অন্য বাড়ী, তবে কি ছাড়িত বুড়ী, চাব কি তোর পুত্রকে ভ
ভূপ্রয়ে ব্রজের যত, দুগ্ধ ঘোল দধি ঘৃত, ক্ষীর সর চিনি মধু ছেনা।
বিরোধ কি করো আর, প্রতি প্রতি লক্ষ ভার, আন যাই করিয়া পারণা।

দিলাম ক্ষমা পাছে ভুল, নন্দকে গিয়া শীঘ্র বল, পূজিতে শীতলা পদদ্বয়।
না পূজ না রবে চাড়, পচায়্যা গলার হাড়, চক্রবর্ত্তী নিত্যানন্দ কয়॥"

ব্যাপার শুনিয়া নন্দরাণীর আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। বুড়ী খাইতে চায় খাউক, তাহাতে তাঁহার রাজার সংসারে আর আপত্তি কি? তবে গোপালের কথা কি বলিল, তাহাতেই তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে মনে বলিলেন,—

"এ বুড়ী মনুষ্য নয়, ডাকিনী হাকিনী হয়, মোক্ষিণী যোগিনী রাক্ষসিনী॥"

বাঙ্গালী মাতৃ-হৃদয়ের একখানি পূর্ণছবি কবি এই স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর যশোদা নন্দকে গিয়া সমস্ত বলিলেন। নন্দ চাঁদবেণের মত চটিয়া লাল,—

"এত শুনি নন্দ ঘোষ জ্বলন্ত আগুনি। কিসের শীতলা সেটা কিসের রমণী॥
পারণাতে মৎস্য মাংস করেন ভোজন। পিশাচের ধারা এত প্রেতের লক্ষণ॥
এমন দেবীর পূজা আরাধিব কে। তারে দেখিলে পাপ ঘটে দূর করে দে॥"

দূর হইতে গালাগালি দিয়া নন্দের তৃপ্তি হইল না, উঠিয়া সম্মুখে গিয়া গালি দিল, আর বলিল—

"কোথাকার রাক্ষসী বক্সী বেশ হয়্যা। মেয়্যা ঘর পেতে চাহিস্ দাবাইয়া॥"

তার পর 'দোহাতিয়া বাড়ি' তুলিয়া মারিতেও গেল। শীতলা দূরে সরিয়া গিয়া মাথা বাঁচাইলেন এবং শাসাইয়া বলিলেন,—

"ইহার শাস্তি ঘোষ আজি কালি পাবি॥"

তাহার পর জ্বরকে আসিয়া সমস্ত বলিলেন। নন্দকর্ত্তৃক অপমানাদি সমস্ত বলিয়া মা শীতলা শেষে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—

"কৃষ্ণ যার পুত্র তার এত গর্ব্ব বাড়ে। জরা বলে আহীরীয়া অঙ্গ নাহি ছাড়ে॥
কৃষ্ণ তার কেনা কি কর্য়াছে এই মনে। তেঁই পাকে বেন্ধে মারে যমলঅর্জ্জুনে॥
তপস্যার বশ কৃষ্ণ জানে নাঞি তা। বৎসর বারর জন্তে পোষা বাপ মা॥
ই গর্ব্বে আহীরিয়া এতেক দিছে গালি। ইহার উচিত ফল দিব আজি কালি॥
ধি অধিকার দিল ব্রহ্মা হর হরি। আহীর কি গর্ব্ব করে ঈশ্বরে না ডরি॥
আদি দেবতা অর্চ্চিয়া কৈল পূজা। ব্রজে হব বঞ্চিত বৃথাই ব্যাধি রাজা॥"

রূপ আস্ফালন করিয়া জ্বর জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, কৃষ্ণকে এতটা অপমান কি সহ্য য়? ও গোয়ালাদের সঙ্গে ইহার মীমাংসা কি করিব, জিনি এই রোগাধিকার ন, একবার তাঁহার সহিত ইহার বোঝা পাড়া করিতে হইবে,—

অপমানে প্রাণ রাখি অকারণে। জানাইতে যাই আগে জনার্দ্দন স্থানে॥
যদি দয়া নাঞি করে দেবরাজ। আজি হতে অধিকারে আর নাহি কাজ॥
যদি হরিষে হুকুম করে হরি। বস্যা দেখ ব্রজেতে বিরাট পর্ব্ব করি॥"

বলিয়া জরাসুর মা শীতলাকে কতকটা প্রবোধ দিয়া "জয় জগন্নাথ" বলিয়া

কৃষ্ণান্বেষণে যাত্রা করিল। কৃষ্ণ তখন গহনে গাভী রক্ষা করিতেছেন। যেদিন জরা এইভাবে কৃষ্ণের নিকট গেল, সেইদিন কৃষ্ণ "ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ নষ্ট ও ব্রাহ্মণীগণের নিকট অন্নভিক্ষা" লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। জরাসুর যখন গোষ্ঠে প্রবেশ করিল, তখন কৃষ্ণের লীলা শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বাদশ রাখাল সঙ্গে এক নির্জ্জন তরুতলে রঙ্গহাস্যরহস্যে বিরাজ করিতেছেন। জরা আসিয়া কিন্তু দেখিতে পাইল না। তখন সে এক বৃদ্ধ বিপ্রের বেশ ধরিয়া গোষ্ঠের মধ্যে ঘটস্থাপনা করিয়া শীতলার পূজা আরম্ভ করিল; ঘণ্টার বিকটনিনাদে বনপূর্ণ করিয়া তুলিল। সে শব্দে গাভীগুলি চমকাইয়া উঠিয়া ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল,—

"ঝাঁপ দে গহনে গরু বুলে ঝালি খায়্যা। খেলা ভাঙ্গে সুবল তখন আল ধায়্যা॥
গুটায়্যা গহনে গাভী লয়্যা আল গোঠে। এথা পদ্ধতি করিয়া জরা পুষ্প দেই ঘটে॥"

সুবল আসিতে আসিতে ইহা দেখিতে পাইল, দেখিয়া চটিল, বলিল, দেখিতেছি তুমি ঠাকুরাণী পূজা করিতেছ, কিন্তু তোমার পূজার চোটে আমার গো-পাল "ঝাল খেয়ে' বেড়াইতেছে, এ কি রকম বিকট পূজা। জরাসুর মিষ্ট কথায় সত্য কথাই বলিল,—

"ব্রাহ্মণ বলেন বাপু বসন্তের রাজা। গোরু গাই বাড়ি দিবে গোষ্ঠে হল পূজা॥"

সুবল বলিল,—তাতো ঠিক কথাই, কিন্তু কৃষ্ণকে আনিয়া তোমার এ ঠাকুরালী ভাঙ্গিয়া দিব আর চড় মারিয়া তোমার গালও ভাঙ্গিব। জরও বলিল—সেই কথাই ভাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া আন। তিনি জগন্নাথ, আমি যে কে তাহা তিনি জানেন। আমার একটু পরিচয় তোমাকেও দি,—

"জরা নাম ধর‍্যাছি যাবত বীরকে জারা। গর্ব্ব ছাড় গোয়ালা গর্জ্জনে যাবে মর‍্যা॥"

সুবল কৃষ্ণ বলে বলীয়ান্—একথা শুনিয়া হটিয়া যাইবার পাত্র নহেন, বলিলেন,—

"সুবল বলেন বিপ্র বাড়ি যে দেখি বড়। লুটাব লোটায় যেন লোটন কপোত॥"

তাহার পর সুবলের বালকত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল, জরাকে চড় মারিতে জরা তখন স্বরূপ ত্রিশির, ষড়বাহু, নয়চক্ষু, ত্রিপদ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দাঁড়াইল। আর কিছু করিতে হইল না, এই বিকট জুজুমূর্ত্তি দেখিয়াই সুবল পলাইল এবং কৃষ্ণকে গিয়া সমস্ত বলিল। অন্যান্য রাখালেরা শুনিয়া কংসচর বলিয়া অনুমান বলরামও বাহ্বাস্ফোট করিয়া উঠিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ জরার বিবরণ জানিতে পা তারপর কৃষ্ণ মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে জরাকে জানান দিবার জন্য বাঁশী বাজাইয়া হইলেন। জরাসুর বাঁশী শুনিয়া আবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া বসিল সদলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দক্ষিণ চরণের আঘাতে শীতলার ঘট ফেলিয়া কৃষ্ণের এই অপকার্য্য কবি অতি সুন্দর ভাবে সমর্থন করিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে পাদপরশে দেবীর ছিল মনে। ভাবগ্রাহী ভগবান্ ভাব তাহা জানে॥
দক্ষিণ চরণে কৃষ্ণ দিল ঘট ঠেল্যা। আকাশে দুন্দুভি বাজে উরিলা শীতলা॥

[redacted]ালা-ভাষার আধুনিক অবস্থায় [redacted]ও[redacted]
[redacted]য়াছে। [redacted]হার উদাহরণও যথেষ্ট আছে। আমার বিশ্বাস ইহা তখনক
শব্দের প্রকৃত রূপ নহে, তখন সাধারণতঃ শুদ্ধরূপে বানান লিখিবার প্রণালী না থাক
ঐরূপ হইয়া গিয়াছে। "অ" তে "া" দিয়া "আ" হয়; হয়ত ইহা দেখিয়া "ও" তে "
দিয়া "ওা" বা 'ওয়া' হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে।

(১) "জাবটে প্রবেশ হয় জানাতে রাধারে।
(২) জাবটে পশ্চাৎ কর‍্যা যমুনার পার।
(৩) জাবট্যা প্রবেশ হয়্যা কর‍্যা হরিধ্বনি॥"
(৪) "গোকুল জাবটাবধি"

এই "জাবট" শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা বুঝা গেল না। কোন স্থানের
বলিয়াই অনুমিত হয়।

(১) এমন গোকুলে মাতা পূজা নেয় যদি।
(২) যে কিছু পূজার কথা যায় জানাইতে॥

এই দুই স্থলে "নেয়" ও "যায়" এই দুই পদের অর্থ 'গ্রহণ করে' ও "গমন করে" এ

[illegible] ভনাইয়া দিলেন, শেষে বলিলেন,

"দারুব্রহ্ম হব পূর্ণ করি এই লীলা। কৃষ্ণের করুণা [illegible]

তাহার পর কৃষ্ণ বলিলেন,—

"ফিরে প্রভু কন দেবী ব্রজপুরে যায়। তুমি পূজা লইতে কি আমারে ডরায়॥
আপনি বসন্ত আমি করিলা সৃজন। আমি নাহি সহিলে সহিবে কোন জন॥
সন্তে উত্তরি বাপু হয় বজ্রবৎ। মৃত্তিকার পাত্র পোক্ত দহনে যেমত॥
াঁচা থাকে কলেবর বসন্তবিহীন। দামোদরে দয়াময়ী দিও গুটি তিন॥

* * * * * *

মন যেন মোর গো না কোরো উদাসীন। যেন ব্রজ গোপদের মুখে না রাখিহ চিন॥"

শীতলা সন্তুষ্ট হইয়া রোগপুরশিখরে ফিরিয়া আসিলেন এবং রক্তবতী-সখী সঙ্গে রোগ-
লইয়া ব্যবস্থা করিতে বসিলেন। পরামর্শ হইল শিলাবৃষ্টি করিয়া সেই শিলার
বসন্তবীজ প্রেরণ করিতে হইবে। তাহাই হইল, জ্বরা বসন্তের শিল করিয়া চাপ
া ছড়াইতে আরম্ভ করিল। গোকুলের ছেলে-বুড়া সকলে সেই শিল অতিরিক্ত
া জ্বরগ্রস্ত এবং বসন্তাক্রান্ত হইল। কৃষ্ণ বলরামেরও বসন্ত হইল। ক্রমে "কর্দ্দম

বৈষ্ণব নিত্যানন্দ এইরূপে ইষ্টদেবতার মানরক্ষা ও গ্রন্থপ্রতিপাদ্য দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বড় সুন্দর ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। শীতলার বাঞ্ছাপূর্ণ হওয়ায় শীতলা কৃষ্ণের স্তব করিলেন, তাঁহার ব্রহ্মাদি বন্দিত অভয়পদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—

"যুদ্ধে জরা জিনি নিল যে পদ চিন্তে হর।　　এমন পদাঘাত আমার ঘটের উপর॥
জন্মকালে কর্ম্মস্থানে শুভগ্রহ ছিল।　　অসাধনে অভয়চরণ তেঁই মিলে গেল॥"

শীতলার এতটা অনুনয় বিনয় শুনিয়া কৃষ্ণও পাল্‌টা জবাব দিলেন,—

"কৃষ্ণ কহেন মাপ কর ক্ষম ব্রহ্মার ঝি।　　তব বাঞ্ছা ভঙ্গে ডরি মোর দোষ কি॥"

তাহার পর শীতলা একটী নাতিদীর্ঘ স্তবপাঠ করিলেন,—কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গস্থ দেবতাগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শীতলা ভগবদ্বিনা স্বর্গ অন্ধকার জানাইলেন, দেবগণের চিন্তার কথা বলিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন,—

"গোবিন্দ কহেন শুন,　　তা সভার চিন্তা কেন,　　দৈত্য নাশ্যা খণ্ড্যা ক্ষিতিভার।
দ্বারকাতে কর্য্যা লীলা,　　যেতেছি অমরশালা,　　কহ কেন গমন তোমার॥"

শীতলা এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—

"ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন,　　এক সঙ্গে তিনজন,　　শীতলাকে দিলে অধিকার।
বিশেষয় ব্যাধি দিয়া,　　পাঠাল্যা বসন্ত লয়্যা,　　ব্রজপুরে পূজা নাঞি তার॥"

তার পর কৃষ্ণ শীতলাকে গোকুলে অধিকার দিলেন এবং বলিলেন, দেবতারাও দুঃখভাগী, আর গোকুলের গোয়ালারা মানুষ হইয়া দুঃখ সহিবে না, এও কি হয়। এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণ রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারে তাঁহার নিজের যে সকল দুঃখ কষ্ট ভোগ হইয়াছে, তাহার

[redacted]

হইল ব্রজ নয়নের জলে।" তখন নন্দাদি সকলেই বুঝিলেন, "শীতলাকে না পূজিলে আর রক্ষা নাঞি।" তখন গোপপতি নন্দ সকলকে লইয়া শীতলার উদ্দেশে স্তবপাঠ ও আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন। শীতলাও সন্তুষ্ট হইয়া শান্তিবিধান করিলেন। পরদিন গৃহে ও গোষ্ঠে মহাপূজার আয়োজন হইল। প্রত্যেক গৃহস্থ উপহার আনিল। মহা আয়োজনে মহাপূজা শেষ হইল।

এই স্থলে নিত্যানন্দের গোকুল-পালার শেষ। রচনা-পারিপাট্যে নিত্যানন্দ কবিবল্লভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইঁহার রচনা সুপ্রণালীবদ্ধ, সরস এবং প্রাঞ্জল। উপরে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভাষার ও শব্দের বিশেষত্ব।—নিত্যানন্দের কাব্যের সর্ব্বত্র "নাহি" শব্দের স্থলে "নাঞি" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়;—

(১) "মহীতলে নাঞি মহিমার চিন।

(২) ব্রজশিশু বলে আজ বুঝি নাঞি বাঁচে॥"

এতদ্ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহার উদাহরণ যথেষ্ট আছে।

"চরণ নাচেড়ে ভঙ্গ দুর্জ্জয় শকট।"

এস্থলে "নাচেড়ে" শব্দের অর্থ "ঊর্দ্ধক্ষেপ" বোধ হয়। শব্দটী স্থানীয় গ্রাম্যপ্রয়োগ হওয়াই সম্ভব।

"বলা নয় ব্রজে জাওা বিষম সঙ্কট।"

এই "জাওা" শব্দের অর্থ "যাওয়া।" [illegible] এই "[illegible]
'ওয়া' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তীয় পুরুষান্তক নহে। উহার অর্থ "গ্রহণ কর" এবং "গমন কর" এইরূপ অনুজ্ঞাবোধক তীয় পুরুষান্তক। যে যে স্থলে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থল ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত ইয়াছে। লহ বা নেও এবং যাহ বা যাও এইরূপ আকারে প্রযুক্ত হইলেই ঠিক হইত, কন্তু কবি নিত্যানন্দের কাব্যে সেরূপ প্রয়োগ বড়ই বিরল, বরং এইরূপ তৃতীয় পুরুষান্তক ক্রিয়ার অনুজ্ঞাবোধ আরও আছে।

"কে তুই কাহার কন্যা কোথারে যায়সি।"

এস্থলে কোথারে শব্দে "কোথায়" এবং যায়সি অর্থে "যাইতেছ।" কোথারে শব্দে প্তমী বিভক্তির স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। "যায়সি" সংস্কৃত তিঙ্‌বিভক্ত্য াঙ্গালা ক্রিয়া, কিন্তু এরূপ পদ এই দুইটী মাত্র আছে, আর নাই।

"এ মাগী মনুষ্য বেনে নয়।"

এস্থলে "বেনে" শব্দের অর্থ অধিক নিশ্চয়তাসূচক, কিন্তু, ভারতচন্দ্র এই অর্থে স্থানে হানে "মেনে" শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যেমন "আর মেনে পারিনে।" ইহাও প্রাদেশিক গ্রাম্যভাষা।

"কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিব যজ্ঞ হকু সার।"

"হকু" হউক বা হোক্ শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ, এরূপ আরও আছে।

"তোমা হতে হল আমার ই জন্ম সফল।"

এই বা ইহ শব্দ স্থানে "ই" শব্দের প্রয়োগ বহু স্থলে আছে। ইহাও প্রাদেশিক গ্রাম্য- র শব্দ। পশ্চিম রাঢ়ে এই শব্দের প্রয়োগ শুনা যায়।

"ঝাঁপদে গহনে গরু বুল্যা ঝাল খায়্যা।"

স্থলে এই সমস্ত ভাবটীই প্রাদেশিক ভাব। গৃহাদিতে অগ্নি লাগিলে গৃহস্থেরা পালিত গলার দড়ি কাটিয়া দেয়, তাহারা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সেই সময়ে যে ইতস্ততঃ বেড়ায়, সেই চকিত ভ্রমণকে "গরু ঝাল খাইয়া বেড়াইতেছে" এইরূপ বলে। বনে য়া পড়াও ঐরূপ ভাবমূলক।

"ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন একু সঙ্গে তিনজন"

"একু" শব্দের প্রয়োগ গীত সুরের গড়েন ধরিয়া হইয়াছে; পূর্ব্বার্দ্ধ চরণে বিষ্ণু কারের উচ্চারণের গীত সুরের যে গড়েন টুকু আছে, গায়নদিগের গাহিবার সময় চরণে সেই টুকু প্রয়োজন হওয়া "এক" স্থানে "একু" প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা াচীন রূপ নহে। অন্ততঃ আমার বিশ্বাস এইরূপ।

"স্বর্ণঘটে সিন্দুর গর্ভেতে গঙ্গাজল।
আম্রশাখা উপরে আখণ্ডলার ফল॥"

খণ্ডলার ফল" অর্থে "কদলী"—নারিকেল নহে। আমার এইরূপ জানা আছে, ন্য কি না জানিনা।

এতদ্ভিন্ন বিশেষ্যের স্থানে বিশেষণ, কর্ত্তার স্থানে কর্ম্ম, ক্রিয়ার স্থানে বিশেষ্য, অনুজ্ঞা স্থানে বর্ত্তমান ইত্যাদির ব্যবহার যথেষ্ট আছে, সে সকল প্রাচীন রচনামাত্রেই দেখা যায়, তাহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। অক্ষর বৃদ্ধি ও হ্রাসও আছে।

ঊর্দ্দু বা পারস্য শব্দের মধ্যে—"আশা", "জব্দ" ও "হুকুম" এই তিনটী মাত্র পাইয়াছি।

পুঁথিখানির প্রতিলিপি করিবার সময় একস্থলে লেখক কতকাংশ লিপি করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ৬।১ পৃষ্ঠায়—

"পদ্মহাত পেত্যা হরি অন্নথাল নিল।
যজ্ঞশালে জয়ঘণ্টা বাজিতে লাগিল॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যত ভাবে মনে মনে।
যজ্ঞ পূর্ণ নহে ঘণ্টা * (আর নাই) * ॥"

ইহার পর কতকাংশ নাই—তাহার পর আছে,—

"ব্রাহ্মণী আসিয়া তখন বলে হেনকালে।
এত থালা অন্ন দিলাম নন্দের গোপালে॥"

এতদ্ভিন্ন শীতলার মস্তকসজ্জা সূর্প অর্থাৎ কুলার কথা যেখানে আছে, সেইখানে "সূপ" শব্দের প্রয়োগ আছে, সমস্ত কাব্যের মধ্যে কোথাও "কুলা" শব্দ নাই অথচ রাঢ়ীয় গ্রাম্য কথা অনেক আছে।

এই সকল ভাষাগত প্রয়োগাদি দৃষ্টে কবি নিত্যানন্দ ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। তবে কত পূর্ব্বের তাহা মীমাংসা করিতে যাওয়া বোধ হয় বিড়ম্বনা। ইনি পূর্ব্বে কবি কবিবল্লভের পূর্ব্ববর্ত্তী। উভয়ের কাব্যের একটী চরণের বহুলপ্রয়োগ দেখা যায়।

"সোণার শরীর করে উয়ের নাদনা।"

অতঃপর বটতলার ছাপা নিত্যানন্দের বিরাটপালা হইতে কবির পরিচয়সূচক দুই চারি কথা বলিব।

ঐ পালার প্রকাশক ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত একটী আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন। "প্রকাশকের উক্তি" নাম দিয়া পয়ারছন্দে বলিয়া গিয়াছেন,—

"শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষায়। নাহি ছিল কোন দেশে সুশৃঙ্খলায়
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া। উড়িষ্যা হইতে পুঁথি আনি মাঙ্গাইয়া
উড়িষ্যায় লিখেছিল দ্বিজ নিত্যানন্দ। নানাবিধ কবিতায় করিয়া সুছন্দ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যয় করি অর্থ। বাঙ্গালা ভাষায় দিলাম করিবারে
শিবনারায়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ। গীতছন্দে এই পুঁথি করিল রচন॥"

একথা কতদূর প্রামাণিক তাহাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। দ্বিজ নি গোকুল-পালার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে উড়িয়া নহেন, সুস্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এই ছাপা পুস্তকের মধ্য হইতেও যে সক

পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও তিনি যে বাঙ্গালী তাহা স্পষ্টই জানা যায়, এতদ্ভিন্ন সে পরিচয় আর গোকুল-পালায় উল্লিখিত পরিচয়ে কোন ভিন্নতা নাই। এতদ্ভিন্ন গোকুল-পালায় অনেকগুলি কবিতা এই জাগরণ-পালার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারও দু একটা প্রমাণ দেওয়া যাইবে। ইহাতে কবির পরিচয় সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহাই প্রসঙ্গতঃ আর দু এক কথার উল্লেখ করিব।

"দ্বিজ নিত্যানন্দ কয়, শ্রীযুক্ত রাজার জয়, বিনাশ করহ রিপুগণ॥"—— ৭ পৃ।

এই "রাজা"টী কে? তাহার পরিচয় পরে আছে—

"কাশীজোড়া সৃষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ্।
শীতলা-মঙ্গল রচে পান সুধামত॥"—২১ পৃ।

বাঙ্গালার প্রায় সকল কবিরই পৃষ্ঠপোষক প্রতিপালক রাজা একজন, কবি নিত্যানন্দেরও ছিলেন, তাহার পরিচয় এই পাওয়া গেল। মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাশীজোড়ার জমীদার রাজা রাজনারায়ণ নিত্যানন্দের প্রতিপালক ছিলেন। এই রাজনারায়ণের সময় নিরূপিত হওয়া দুঃসাধ্য হইলেও বোধ হয় অসাধ্য নহে। ৬৪ পৃষ্ঠার এই ভণিতায় সৃষ্টিপাড়ার স্থানে ষষ্ঠীপাড়া পাঠ আছে।

"কাজীর পদবী যেই গোত্রে ভরদ্বাজ। মহামিশ্র রাধাকান্ত খ্যাত ক্ষিতিমাঝ॥
দ্বিতীয় অনুজ তার দেব অনুবলে। দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে সাধনের ফলে॥"—২৪ পৃ।

এই টুকু হইতে আমরা বুঝি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর বংশে কাজী উপাধি ছিল, সুতরাং জানিতেছে, এক সময় কবিবংশ নবাব সরকারে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এস্থলে গোকুল-পালায় লিখিত কবির পিতৃনামের সহিত এস্থলে উল্লিখিত কবির পিতৃনামের একত্ব আছে।

এই জাগরণ-পালার আর একস্থলে কবির বংশাবলী দেওয়া আছে,—

"পিতামহ পীতাম্বর, তস্য সুত মনোহর, তাহার তনয় চিরঞ্জীব।
তস্য সুত হরিহর, সখা যার দামোদর, চরাচর খ্যাত সেই সব॥
রাধাকান্ত তস্য সুত, অশেষ গুণের মত, শ্রীচৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভাই, শীতলা আদেশ পাই, দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষণ॥"—২৯ পৃ।

গোকুল-পালায় মনোহরের পিতার নাম ভবানী মিশ্র আর চিরঞ্জীব মিশ্রের পুত্রের নাম রাধাকান্ত লিখিত আছে, কিন্তু এখানে মনোহরের পিতার নাম পীতাম্বর ও তাহার পুত্রের নাম হরিহর এবং হরিহরের পুত্র রাধাকান্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আর একস্থলে আছে,—

"নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর।
প্রতিষ্ঠিল গঙ্গাতীরে সিংহ হলধর॥"

এই হলধর সিংহ সম্ভবতঃ কবিকে গঙ্গাতীরে বাস করাইয়া ছিলেন। প্রকাশকের লিখিত অনুবাদক শিবনারায়ণ সিংহের সহিত এই হলধরের কোন সংশ্রব আছে কি না, কে জানে? কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ নিত্যানন্দের প্রতিপালক ছিলেন, তাঁহার আশ্রয় কবি কেন যে ত্যাগ করিয়া হলধর সিংহকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না।

আত্মপূজার প্রচার হেতু শীতলা বিরাটের ঘরে ঘরে ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু বিরাট বলেন,—

"শিব ছেড়ে সেবিতে নারিব শীতলাই।"

মৎস্যদেশী ব্রাহ্মণেরা বলেন,

"শিব বিনে অন্য দেব নাহি পূজে রাজা।
শীতলা পূজিলে সবংশে বধিবেক রাজা॥"

এতদ্ভিন্ন চন্দ্রকেতুর পালা ও গোকুল-পালাতেও এই শিবভক্তির কথা কথিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অনুমান হয় যে যখন শৈবধর্ম্মের সংঘর্ষে ধীরে ধীরে শাক্তধর্ম্মের বা তান্ত্রিক পূজার প্রচার হইতেছিল, সেই সময়েই চণ্ডী শীতলা মনসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবীপূজার প্রচার আরম্ভ হয়। চাঁদবেণে, কালকেতু, রাজা চন্দ্রকেতু, নিমাই জগাতি, দেবদত্ত, বিরাটরাজ সকলেই শিবভক্ত আর সকলেই শিবপূজা ছাড়িয়া দেবীপূজা করিতে প্রথমে অস্বীকৃত শেষে দেবীর প্রকোপে লাঞ্ছিত হইয়া অনিচ্ছায় দেবীভক্ত হইয়া পড়েন। এই সকল দেবী যে যে রোগ বা জন্তুভীতিনিবারিণী বা সুখদাত্রী বলিয়া পরিকীর্ত্তি হইতেন, সেই সকল গুণ পূর্ব্বে শিবেই ন্যস্ত ছিল। লোকে সেই সকলের জন্য শিবেরই সেবা করিত। এক্ষণে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই এক এক উপাস্য দেবী শিবকে ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ, সত্য ভগবান্ জানেন।

নিম্নলিখিত চরণগুলি গোকুল-পালায় ও এই বিরাট-পালায় অবিকল এক দেখা যায়

(১) যুক্তি হেতু জগৎমাতা জরাকে জিজ্ঞাসে।
(২) দাণ্ডাল যতেক ব্যাধি জোড়হাত হৈয়া॥
(৩) সোণার শরীর করে উয়ের নাদনা।
(৪) যাত্রা কৈল শীতলা জরাকে সঙ্গে করে।

ইত্যাদি আরও অনেক কথা আছে।

জাগরণ-পালায় শীতলার উৎপত্তি সম্বন্ধে সর্ব্বত্র তাঁহাকে ব্রহ্মার কন্যা বলিয়া উ হইয়াছে, কেবল—

"ভারি ভুরি বিমুখ ভিখারী তোর খুড়া।
ষাঁড় ছেড়ে এক পা হাঁটিতে নারে বুড়া॥"

এ স্থলে শিবের ভ্রাতৃকন্যা। আবার—

"মা স্বাহা পিতা অগ্নি জানে ত্রিভুবনে।
ব্যাধি সঙ্গে বুলি আমি সাক্ষাৎ ত্রিভুবনে॥"

এস্থলে অগ্নিও স্বাহার কন্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। স্ববাক্য-বিরোধী বাক্যের মধ্যে সত্য-নির্ণয় করা এক প্রকার অসাধ্য।

নিত্যানন্দ যে বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা তাঁহার বৃন্দাবন-বর্ণনায় ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিলেই বুঝা যায়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের যে বিরোধী ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিরাটরাজের বৈষ্ণব-পূজার বর্ণনায় পাওয়া যায়,—

"এই মত ক্রমে ক্রমে করয়ে ভ্রমণ। বিরাজিল বুঝিবারে বৈষ্ণবের মন॥
আশাদাস অধিকারী অষ্ট বেটী বেটা। চৌদিকে বৈষ্ণবের পাড়া নিত্য মালা ফোঁটা॥
পূজার প্রকাশ বুড়ী কহে নিত্যধামে। সীতারাম স্মরে তারা শীতলার নামে॥
বলে মোরা বিষ্ণু পূজি বুড়ী মাগী কে। ছহাতিয়া সোটা মেরে দূর করে দে॥

* * * * * *

অযোনিসম্ভবা আমি ধাতা মোর পিতা।
ব্রহ্ম অংশে জন্ম মম সর্ব্বজনখ্যাতা॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি কৃষ্ণ দশ অবতার।
সকলে সংঘট কৈল বসন্ত আমার॥
তোরা কাটু তিলক তুলসী কণ্ঠমালা
তেল পারা বপুতে বেয়াবে সুহা গড়া॥
গা পচাইয়ে হাড় গলাইব পোঁটা।
পূজা নিব ঘরে বসে বৈয়া দিবি জোড়া পাঁটা॥"

শেষোক্ত চরণে শীতলার মুখে বৈষ্ণবের প্রতি যে শ্লেষোক্তি কবি গাহিয়াছেন, তাহা ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার মনোভাব বুঝা যায়।

পথের বিষয় যে বিরাটপালা ছাপা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ও সুপ্রণালীশুদ্ধ নহে, সুতরাং ইহা হইতে আমরা আর অধিক আলোচনা করিব না। বিরাট-রাজ্যের প্রজার ব্যবস্থা, পথ-বর্ণনায় তখনকার বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস কিছু কিছু জানা যায়।

বৃদ্ধা জরতীবেশে বলদবেশী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বসন্তের ছালা চাপাইয়া জরাসুরকে সঙ্গে লইয়া মৎস্যদেশের পথে উপস্থিত হইলেন। নিমাই সেই পথের বাণিজ্য-দ্রব্যের গ্রাহক অর্থাৎ "জগাতি" ছিলেন। বলদের ঘণ্টারব শুনিয়া সদলে আসিয়া শীতলার করিয়া বলিলেন,—

"জোর করে তোর বেটা ভাঁড়ায়ে জগাতি।
রাস লৈয়া রঙ্গ বৈয়া যাইস সারা রাতি॥

গোস্বায় গর্জ্জিয়া খাড়া দেই গোপ মোড়া।
এইরূপে আমার অনেক খাইস ভাড়া॥
পাইয়াছি প্রথমে আজি পলাইবি কোথা।
নাহি জানি রাজকর দিতে হবে হেথা॥"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে কবির সময়ে কাশীজোড়া অঞ্চলে পথে বাণিজ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করা হইত। যে আদায় করিত, তাহাকে ঘাটওয়াল বা জগাতি বলিত। তাহার পর কত দিতে হইবে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে—

"আগে মোর মামুলী আঠারো বুড়ি গণ। পরে ফেল আষাড়ীর পঞ্চাশ কাহন॥
একুনেতে অষ্ট শত চারি পণ সাড়ে। নহিলে ভৎর্সনা করে নিব নাথি চড়ে॥"

অর্থাৎ তখন মামুলী অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট রাজকর ছিল আঠার বুড়ি কড়ি, তাহার উপর জগাতিরা বলপূর্ব্বক নানা বাবে অনেক আদায় করিত। এখানে শীতলার নিকট আটশত সাড়ে চারি পণ দাবী করা হইয়াছে। এই সকল আদায়ের জন্য মারপিট অত্যাচার বড়ই হইত। তবে আর একটা নিয়ম ছিল। যাহারা রাজাদেশে শুল্কদান হইতে পরিত্রাণ পাইত, তাহারা ভারবাহী বলদের গলায় ঘণ্টা বান্ধিয়া দিত এবং রাজার ছাড় পাট্টা পাইত। ঘণ্টাবান্ধা বলদ ও ছাড় পাট্টা দেখিলে জগাতিরা আর তাহার শুল্ক আদায় করিত না; যথা,—

জরাসুর জগাতির কথা শুনিয়া বলিল,—

"এত জোর কেন তোর মোকে তুল বাড়ি। ঘণ্টা বান্ধা বলদের ঘাটে নাই কড়ি॥
নিমা বলে নিষ্ঠুর বেটা নিয়ে আয়তো দেখি পাট্টা। কার পাট্টা পাইয়া বলদে দিলি ঘণ্টা
ঘাটের রাজস্ব দিয়া আমি যাই মারা। চোরা গরু লয়ে চোর কর‍্যাছ চতুর

ইহা হইতে আরও বুঝা যাইতেছে যে, ঘাটওয়ালদিগকে রাজসরকার হইতে একটা ঘাট জমা করিয়া লইতে লইত এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব সে রাজসরকারে দিয়া আপনি দৈনিক আদায়ের উপর নির্ভর করিত। ইহাতে জগাতির বিস্তর লাভ কিন্তু শুল্কদাতৃগণের প্রতি বিস্তর অত্যাচার হইত।

তাহার শীতলা গরীব বলিয়া দুই কাঠা কলাই মাত্র দানস্বরূপ দিয়া অনেক জগাতির হস্তে উদ্ধার হইলেন। বলা বাহুল্য এই কলাইগুলিই গুপ্ত বসন্ত। এই অতি সুস্বাদু। নিমাই রান্ধিয়া সপরিবারে খাইল। ক্রমশঃ সেই কথা রাজ্যমধ্যে পড়িল। সকলে কিছু কিছু চাহিয়া লইয়া গেল। ওদিকে শীতলা গিয়া বাজা গুপ্ত বসন্তের কলাই বেচিতে বসিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ রাজ্যমধ্যে প্রতি গ ছড়াইয়া পড়িল। নিমাইয়ের সাত পুত্র মরিল। রাজ্যে হুলস্থুল পড়িল। শীতলা গুরু পুরোহিত বিদ্যানিধি ও বাচস্পতিকে বৃদ্ধা বেশে গিয়া জানাইলেন যে, র দেবদাসদত্ত বণিককে পাঠাইয়া রঙ্গজসফর হইতে সমুদ্রগর্ভস্থ হেমঘট উঠাইয়া অ মেষ মহিষাদি বলি দিয়া পূজা করেন, তবেই রাজ্যরক্ষা হইবে। প্রত্যূষে পত্নী

বাচস্পতি পাশা খেলিতেছিলেন। বুড়ীর কথা বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, তিনি অক্ষপাটী ফেলিয়া মারিলেন। শীতলা গালি দিতে দিতে ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। তার পর সর্ব্বজাতিতে বসন্ত ছড়াইবার সময় কবি কয়েকটী জাতির বৃত্তির ও স্বভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি,—

(১) "আসি বলে নাপিত ভাঁড়ায়ে যায় নরে।"
(২) "আগুরি বেচয়ে পলা প্রবাল মুকুতা।"
(৩) "গয়ালা বেচয়ে দধি জল মিশাইয়া।"
(৪) "করে চাষ কৈবর্ত্ত কোদালে তাড়ে পড়া।"
(৫) "বাইতি বুনয়ে শয্যা বাজায় মৃদঙ্গ।"
(৬) "নগরে যতেক জুগী লাল করে সুতা।"
(৭) "কাট কাটে কোড়ি খায় যতেক শবর।
(৮) ধর্য্যা ধনুক কোল বাজী করয়ে শীকার॥"

এই সকল জাতির অনেকের এখন আর বৃত্তি স্থির নাই।

"রাজা বলে শ্রীদেবী শ্রীহরিপদ ছাড়ি।
প্রাণ গেলে পূজিতে নারিব পচামুড়ী॥"

আমরা দেখিতেছি, চাঁদ সওদাগর কবি ক্ষেমানন্দ ও কেতকার সাহায্যে মনসাকে—[illegible]ী কাণী" বলিত, আর বিরাটরাজ কবি নিত্যানন্দের প্রসাদে শীতলাকে "পচামুড়ী" [illegible]রিয়াছেন।

[illegible]টরাজের পুত্র উত্তরের বসন্তরোগে মৃত্যু হইল। তাঁহার পত্নী রত্নাবতী তখন [illegible] ছিলেন। শীতলা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীবেশে গিয়া এই সুসংবাদ দিলেন। তার পর [illegible]ী সহমৃতার সজ্জা করিয়া অর্থাৎ "ভাঙ্গিয়ে আমের ডাল হস্তেতে লইল" পিতামাতার [illegible] বিদায় লইয়া স্বামীর শ্মশানে যাইতে ইচ্ছা করিবামাত্র শীতলার ইচ্ছায় পৃথিবী [illegible]কুচিত করিলেন, ছমাসের পথ রত্নাবতী বামপদ বাড়াইতেই পার হইয়া আসিল। [illegible]একবারে স্বামীর শ্মশানে। তাহার পর সতীর রোদনে দেবীর দয়া হইল। শ্মশানে [illegible]ইল, বিরাটপুত্র উত্তর দেবীর কৃপায় জীবন পাইলেন। এই স্থলে কবি শীতলার [illegible]রাটমহিষীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসংস্কৃতজ্ঞের ন্যায় কথা,— [illegible]বলিলেন সুদেষ্ণা পূর্ব্বজন্মে মেনকার কন্যা শকুন্তলা ছিলেন। হস্তিনার রাজা [illegible] তাঁহাকে গুপ্তবিবাহ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে শকুন্তলা মঙ্গলা পূজা করিয়া [illegible] স্বামী লাভ করেন। কস্তিল মুনির আশ্রমে গুপ্তবিবাহ হয়। শকুন্তলার গর্ভে [illegible]ন্মগ্রহণ করেন। শীতলা এই সুদেষ্ণার ভবিষ্যজ্জন্মের কথাও বলেন—সুদেষ্ণা [illegible]ইন্দ্রদ্যুম্নমহিষী সুরুচি হইবেন এবং দারুব্রহ্ম স্থাপন করিবেন।—নিত্যানন্দের [illegible]সহিত যে কিছু সংশ্রব ছিল, তাহা এই বর্ণনা হইতে অনুমিত হইতে পারে।

শ্মশানের পূজায় রাজা বিরাট যোগ দেন নাই। রাণী ও রাজবধূ গোপনে পূজা করেন। রাণীর নিকট শীতলার অনুগ্রহ শুনিয়া বিরাট গলায় কুঠার বান্ধিয়া শীতলার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। শীতলা তখন দেবদাস সাধু দ্বারা হেমঘট আনাইয়া পূজা করিতে বলিলেন। রাজা বণিককে রঙ্গজপাটনে পাঠাইয়া দিলেন। দেবদাসকে প্রলোভিত করিবার জন্য বিরাট স্বীয় মস্তিকন্যার সহিত বিবাহ দিলেন।

তাহার পর দেবদাসের নৌকাযাত্রা। শ্রীমন্তের পথের বর্ণনার ন্যায় কবি দেবদাসের পথের বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থলে বণিকের নৌকার নাম "মধুকর" পাওয়া যায় ;—

"পবন গমনে চলে সপ্ত মধুকর।"

শ্রীমন্তের নৌকার নামও মধুকর, রায়মঙ্গলের পুষ্পদত্তের নৌকার নামও মধুকর আর এই দেবদাসের নৌকার নামও মধুকর। অতএব মধুকর সমুদ্রগামী প্রাচীন নৌকাশ্রেণীর নাম মাত্র বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর দেবদাসের পথ—

"ওথা সাধু বাহে হর শঙ্করের ঘাট।
যেখানে শঙ্করযাত্রা করেন বিরাট॥
চক্ষুর নিমেষে সাধু গেল পালুডাঙ্গা।
সাতগাঁ ছাপাইল সাধু পাইয়া শিঙ্গাভাঙ্গা।
বেণেপাড়া বাহিয়া যে এড়াল বিরাট।
সম্মুখে এড়ান নিমা জগাতির ঘাট॥"

বিরাট রাজ্য বা মৎস্যদেশ কোথায় তাহা জানিনা, কিন্তু এস্থলে যে সকল নাম পাওয়া যাইতেছে, এগুলি বাঙ্গালা দেশের একাংশে বটে। তার পর একবাট যমুনা বাহিয়া অযোধ্যার নন্দীগ্রামে পৌঁছিবার কথা আছে। তার পর লৌহবন, বন, কদম্ববন, জাবট, গোবর্দ্ধন, কালীদহ ইত্যাদির কথা। তাহার পর বৃন্দাবন সারেঙ্গচাখলা নামক স্থানে সাধুর নৌকা উপস্থিত হইল তাহার, পর পূর্ব্বহট্টে করিল। তাহার পর বেহুলা, কুমুদবন, বংশীবট, চক্রশাল, ভোজনটিলা, তৎপরে তালবন, তাহার পর কংস রাজপাট (মথুরা) হইয়া প্রয়াগে আসিল, সেখান একবারে—

"পবন গমনে ছোটে সপ্ত মধুকর।
এড়াইল কলঙ্ক রাজার বাড়ী ঘর॥
এক বৈদ্যপুর বাহে পরম কৌতুকে।
দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গা আইল কটকে॥
কটক বাহিয়া ডিঙ্গা আইল উজানি।
* * * *
বালীঘাটা বনপুর বাহে সাধুবালা।

পর্ব্বত রৈকম দ্বীপ দক্ষিণে রাখিয়া।
হিড়িম্বার ঘাটে ডিঙ্গা রহে চাপাইয়া॥

* * * *

কাশী বারাণসী সাধু দিল দরশন।"

এ পথ কিরূপ তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন—ইহাতে সত্যের বিন্দুমাত্র অংশ নাই, কেবল স্থানের নামগুলি যথার্থ। যাহা হউক তাহার পর কাশী হইয়া গয়ায়, গয়া হইয়া ধবলাপর্ব্বত, তথা হইতে বিশ্বেশ্বরগিরি, তৎপরে অনেক স্থান (নাম নাই) হইয়া চন্দ্রভাগা দিয়া সমুদ্রে পড়িলেন। এই স্থলে দেবদাস গঙ্গাপূজা করিয়া দ্রাবিড়ে উপস্থিত হইলেন, তৎপরে দ্বারকা হইয়া ত্রিকুট পর্ব্বত, তৎপরে রঙ্গজসফর নামক গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। পদ্মমালার ঘাটে (কমলে কামিনীর ন্যায়) শীতলার মায়ায় সমুদ্র জলে হেমঘট ভাসিয়া উঠিল। তাহার পর শ্রীমন্তের দেবদাস কর্ত্তৃক রাজা চন্দ্রসেনের নিকট পদ্মমালার ঘাটের বিবরণ বর্ণন, রাজা কর্ত্তৃক নিগ্রহ, শেষে শীতলার কৃপায় রাজকন্যা কর্ত্তৃক হেমঘট উদ্ধার ও তাহার সাধুর সহিত বিবাহ, দেশাগমন ইত্যাদি। তাহার পর অষ্টমঙ্গলাও আছে। তাহাতে ৮টীর স্থানে নিম্নলিখিত ৯টী মঙ্গলের বর্ণনা আছে,—

১ম—শচী মুখে নিন্দা উপলক্ষে স্বর্গে পূজাপ্রচার।
২য়—বরুণ কর্ত্তৃক পাতালে পূজাপ্রচার।
[illegible]—রাবণ কর্ত্তৃক লঙ্কায় পূজাপ্রচার।
[illegible]—বালীরাজ কর্ত্তৃক কিষ্কিন্ধ্যায় পূজাপ্রচার।
[illegible]—অযোধ্যায় দশরথ কর্ত্তৃক পূজাপ্রচার।
[illegible]কংস কর্ত্তৃক মথুরায় ও জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মগধে পূজাপ্রচার।
[illegible]গোকুলে নন্দ কর্ত্তৃক পূজা প্রচার বা গোকুল-পালা এবং দেবদাস কর্ত্তৃক [illegible]কাশ।
৮ম—বিরাটের ব্যাপার রত্নাবতী কর্ত্তৃক উত্তরের প্রাণদান, রঙ্গজসফরে দত্ত কর্ত্তৃক [illegible] উদ্ধার।
৯ম—হেমঘট পূজা।

[illegible]হার পর দেবদত্ত ও তাঁহার দুই স্ত্রীর স্বর্গারোহণ। তখন——

[illegible]কুবেরের ঘরে দেবী পুত্রবধূ দিয়া। নিজ কীর্ত্তি শীতলাই মর্ত্ত্যেতে রাখিয়া॥
[illegible]গসহ রোগপুরে বসিল কৌতুকে। রক্তসিংহাসনে দেবী ত্রিশিরা সম্মুখে॥
[illegible]রাবতী দেই অঙ্গে চামরের বা। বিচিত্র পালঙ্কে দেবী ঢালিলেন গা॥
[illegible]র্ব্বেতে গীত গায় নাচিছে অপ্সরী। শীতলা-মঙ্গল সাঙ্গ সবে বল হরি॥"

[illegible]থম চরণে দেবদাসদত্তের পূর্ব্বাবস্থায় কুবের পুত্রত্বের কথা জানা যাইতেছে। ইহার [illegible]ণের অনুকরণ। যাহাহউক, শীতলার এই অষ্টমঙ্গলানুযায়ী নিত্যানন্দের পূর্ণ বৃহৎ

গ্রন্থ কোথাও আছে কিনা বা আদৌ ছিল কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল। দেবদাস দত্ত কর্ত্তৃক টীকা দিবার ব্যবস্থা-প্রকাশের কথা অষ্টমঙ্গলায় দেখা যাইতেছে, কিন্তু আসল কাব্যের মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ দেখা গেল না। কি দৈবকীনন্দন কি নিত্যানন্দ উভয়েরই কাব্যালোচনা করিয়া আমরা যতটা বুঝিলাম, তাহাতে উভয়কেই মনসার ভাসান ও চণ্ডী-মঙ্গলের অনুকরণে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত বলিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি। আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই, তবে সাধারণকে অনুরোধ যে যাহাতে এই শীতলা-মঙ্গলের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

একটা কথা,—এই কাব্যের নাম আমরা বরাবর শীতলা-মঙ্গল বলিয়াই আসিতেছিলাম, অথচ তাহার কোন আভ্যন্তরিক প্রমাণ দিই নাই। বিরাট-পালার শেষচরণে কবির কথায় সে কথার সুন্দর প্রমাণ হইয়া গিয়াছে—"শীতলা-মঙ্গল সাঙ্গ সবে বল হরি।" প্রথমে আমরা শীতলা-মঙ্গলের পাঁচটী পালার উল্লেখ স্থলে "রঘুরাম দত্তের পালা" নামে এক পালার উল্লেখ করিয়াছি, বিরাট-পালা-কথিত দেবদত্তের পালার কথা আলোচনা করিয়া বোধ হয় যে যাহার নিকট আমি রঘুরাম দত্তের পালার নাম শ্রবণ করি, তাঁহার সম্ভবতঃ ভুল হইয়াছে, উহার নাম দেবদত্তের পালাই হইবে। যাহা হউক অনুসন্ধান আবশ্যক। *

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

---

* কলিকাতা আহীরীটোলা ষ্ট্রীট-প্রতিষ্ঠিত শীতলা-মন্দির কলিকাতার সকল শীতলা-মা প্রাচীন, এখানকার প্রতিমা ডোমের ব্যবহৃত প্রতিমা নহে। বর্ত্তমান সেবাইতগণের উ পুরুষ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। সেবাইতগণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান সেব শাস্ত্রদর্শী নহে। শীতলার স্তবকবচপূজাদির মন্ত্র অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। শীতলার ৩।৪ প্রকার ধ্যান শুনিয়াছি। তাঁহাদের বিশ্বাস দক্ষিণ কালিকায় ও শীতলা ভেদ নাই। ডোম পণ্ডিতের আবিষ্কৃত শীতলা মূর্ত্তিকে ইঁহারা কুম্ভখণ্ডমূর্ত্তি বলেন। ইঁহারা "কলিদুঃখবিমোচনতন্ত্র" নামক একখানি গুপ্ততন্ত্র আছে, তাহাতেই শীতলা-রহস্য বিস্তৃতরূপে হইয়াছে। সে তন্ত্র অতি দুর্লভ। সালিখানিবাসী শীতলা-মন্দিরের সেবাইত মাধবদাসের নিকট উক্ত তন্ত্র পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে সহজে কাহাকেও দেখিতে দেয় না। ইঁহারা স্কন্দপুরাণী ধ্যান বা পিচ্ছিলা তন্ত্রোক্ত ধ্যানাদির উপর ততটা শ্রদ্ধান্বিত নহেন।

বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। অমৃতরত্নাবলী। মুকুন্দদাস।

মঙ্গলাচরণ শ্লোক,—

প্রণম্য-সচ্চিদানন্দং গোকুলানন্দবর্দ্ধনং।
অমৃতরত্নাবলীঃ গ্রন্থ মুকুন্দ ক্রিয়তেঽধুনা॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু॥ ইত্যাদি।

মন্তব্য—পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০, প্রতি পৃষ্ঠার শ্লোক সংখ্যা ৪০, এই গ্রন্থ একটী অপূর্ব্ব রূপক ;—

বিশুদ্ধ বিরজ ধর্ম্ম অখণ্ড অকাম।
অনিমিত্ত নিমিত্ত বিরজা পারে ধাম॥
বিরজা নদীর পারে সেই দেশ খান।
সহজপুর সদানন্দ নামে সেই গ্রাম॥
তাহার পশ্চিম দিকে কলিঙ্গকলিকা।
চম্পককলিকা নামে তাহার নায়িকা॥
মূলবৃক্ষ সাতদল সহস্রকমল।
দেশবেড়া সেই বৃক্ষ সরোবর জল॥
তাহার উত্তর দিকে আনন্দপুর গ্রাম।
রসিক-শেখর কৃষ্ণ মন্মথের ধাম॥
সদানন্দ সদা মগ্ন সদা অভিলাষ।
সহজ মানুষ তাতে সদা করে বাস॥
তাহার দক্ষিণ দিকে চিদানন্দপুর।
চন্দ্রকান্তি দেশ হয় কিঞ্চিৎ তার দূর॥

এইরূপে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, অজ্ঞান, আত্মা ই এই রূপকের বর্ণনীয় বিষয়।

ক,—

যুষ মন্দাকিনী হয় অমৃত বিলাস।
তরত্নাবলী গ্রন্থ কহে শ্রীমুকুন্দদাস॥ ইতি
অমৃতরত্নাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

মুনির পারণ। শঙ্কর কবিচন্দ্র।

ক—

কহে সনকাদি শুন এক চিত্তে।
দেব কহে পুন রাজা পরীক্ষিতে॥
শুন শুন মহারাজা পরম সাদরে।
বিহার করেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে॥
নন্দ যশোদা ভাগ্যের কথা কি বলিব আমি।
পুত্রভাবে বিহার করয়ে চক্রপাণি॥

ভণিতি,—

শঙ্কর কহেন সবে কর অবধান।
শুনহ গোবিন্দলীলা অমৃত সমান॥

শেষ শ্লোক,—

দ্বিজ ফকিরচন্দ্রে গায় পালা হৈল সায়।
ভক্ত সহিত প্রভু হবে বরদায়॥

শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০ শত। লিখিতং শ্রীগদাধর দাস। সাং কুমরুল। সন ১১৯৭ সাল তাং ১৩ ফাল্গুন। দিবা ৪ দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত।

৩। কুম্ভকর্ণ রায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আরম্ভ শ্লোক,—

নিদ্রা হৈতে উঠিয়া বসিল কুম্ভকর্ণ।
সুবাসিত জল কেহ যোগায় সংপূর্ণ॥
কুমকুম কস্তুরি লেপ কেহ দেয় গায়।
কতশত সেনাপতি চামর ঢুলায়॥
কুম্ভকর্ণ বীর যদি লঙ্কায় জাগিল।
ইহা শুনি ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল॥

অন্তশ্লোক,—

তোর কুড়ি চক্ষু থাকিতে তবু পড়্যা গেলি হ্রদে।
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র বিষয় আমোদে॥

কুম্ভকর্ণের রায়বার-সম্পূর্ণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪, প্রতি পৃষ্ঠার শ্লোক সংখ্যা ২২।

৪। কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ। (খণ্ডিত)

মঙ্গলাচরণ—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আরম্ভ শ্লোক,—অর্জ্জুন সংবাদ পুস্তক লিখ্যতে।

কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জনে আছিলা নির্জ্জনে।
অনেক রহস্য কথা বিচার কথনে॥

এ বড় রহস্য কথা শুন সাবধানে।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ বিমোচনে॥

মধ্য শ্লোক,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই মন্ত্র মহাতীর্থ ভব তরিবারে।
কলির প্রথম হবেন চৈতন্য অবতারে॥
কলিতে প্রকাশ প্রভু হইবেন আপনি।
এ সব অপূর্ব্ব কথা ভক্তিভাবে শুনি। ইত্যাদি।

অন্তশ্লোক,—নাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯, প্রতি পৃষ্ঠায় শ্লোক সংখ্যা ২৮, যত টুকু আছে তাহার শেষ শ্লোক,—

রাধাকৃষ্ণ পায় যেবা দরিদ্র হৃদয়।
রাধার চরণাশ্রিত যেবা জন হয়॥

৫। গঙ্গার বন্দনা। অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র।

আরম্ভ,—

বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উৎপাদন, দ্রবময়ী তব নাম,
সুরাসুর নরের জননী॥

শেষ,—

নীচ পশু কীট পক্ষ, নৃপআদি জীবলক্ষ,
সকলি তোমার সমতুল।
হৃদয়মিশ্রের সুত, কবিচন্দ্র গুণ যুত,
মহিমার নাহি পায় কূল॥
ভণয়ে অযোধ্যারাম, পুরাও মনের কাম,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যেন মরণ সময় আসি, তোমার পদেতে ভাসি,
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রাণ যায়॥

ইতি গঙ্গার বন্দনা সমাপ্ত তাং ১৯ ফাল্গুন ১১৪৭ সাল। পঠনার্থে শ্রীরামসদয় দে সাঃ মদনমোহনপুর। লেখক শ্রীকানাইরাম সরকার। শ্লোক-সংখ্যা ২০টী।

৬। চৈতন্যভক্তিতত্ত্ববিলাস। অকিঞ্চন দাস।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ।
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥

শেষ,—

পুনর্ব্বার জন্ম মোর নরকুলে হয়।
বৈষ্ণবেতে সুদৃঢ় মন যেন রয়॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তিরসাত্মিকা কহে অকিঞ্চন দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভক্তিতত্ত্ববিলাস সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীপদ্মলোচন নন্দী সাং খাটুল গ্রাম। পরগণে জাহানাবাদ ইতি ১২০০ সাল তারিখ রবিবারে সমাপ্ত ৭ রোজ।

৭। চৈতন্যরসকারিকা। যুগলকিশোর দাস।

আরম্ভ শ্লোক,—

আলুলিতখেদয়া বিষদয়া শ্রোমীনদামোদয়া।
সর্ব্বশাস্ত্রবিবদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া॥
শশদ্ভক্তিবিনোদয়া সময়সা মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥
জয় নবদ্বীপচন্দ্র গৌর গুণধাম।
দয়ার ঠাকুর মোর নিত্যানন্দ রাম॥

মধ্য শ্লোক,—

ঈশ্বরের কার্য্য হয় যুগধর্ম্ম স্থাপি।
অসুর সংহার আর সাধুর পালন॥
অনিষঙ্গরূপে জীব মুক্ত নামাভাসে।
নিজ প্রয়োজন গুহ্য নহে সর্ব্বদেশে॥
এই হেতু হয় ঈশ্বরের অবতার।
অবতারি কৃষ্ণ যৈছে মনুষ্য আচার॥
নিজ প্রয়োজন তাঁর প্রেম আস্বাদন।
ভক্ত আস্বাদন হেতু ভক্তিসংস্থাপন॥

অন্তশ্লোক,—

যুগলকিশোর দাসের আর কেহ নাহি
এই বার মোর হও চৈতন্য নিতাই॥

ইতি চৈতন্যরসকারিকাগ্রন্থ সমাপ্ত। [illegible] ৯, প্রতি পৃষ্ঠায় শ্লোক সংখ্যা ৩০।

৮। তরণীসেন বধ। শ্রীশঙ্কর।

আরম্ভ শ্লোক,—

পুত্র শোকে মুর্চ্ছিত হইয়া দশানন।
সিংহাসন হইতে ভূমে পড়িল রাবণ॥
রাজা-লঙ্কেশ্বর করাঘাত হানে ভালে।
গড়াগড়ি যায় রাজা পড়ি ভূমিতলে॥

অন্ত শ্লোক,—

বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গায়।
এত দূরে তরণীর পালা হৈল সায়॥

মন্তব্য,—এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই শ্রীশঙ্কর এইরূপ ভণিতি দৃষ্ট হয়। ইতি সন ১২৫০ সালে তাং ১৯ আষাঢ়। পুস্তক শ্রীরামসদয় পাল সাং মায়াপুর। হাল সাং গালিয়া। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩০৪।

৯। দধিখণ্ড। বৃন্দাবন।

আরম্ভ শ্লোক,—

গোকুলে গোলোকনাথ পাতিল জঞ্জাল।
গোয়ালার গোরু ফেরে মদনগোপাল॥
দিনে দিনে যার যত দধি দুগ্ধ হয়।
কৃষ্ণের প্রসাদে এক রতি নাহি রয়॥

অন্ত শ্লোক,—

বৃন্দাবন বলে ভাল করিলা আশ্বাশ।
মনে মনে মন্দ মন্দ হাসেন শ্রীনিবাস॥

ইতি দধিখণ্ড সমাপ্ত। পাঠক শ্রীস্বরূপচরণ পাল সাং নদীপুর পরগণে বালিগড়, সন ১২১৩ সাল তাং ১৩ ফাল্গুন। শ্লোকসংখ্যা ৮০।

১০। ৭২ সালের দামোদরে বন্যা। (রচয়িতার নাম নাই।)

শুনা যায় ভাঙ্গামোড়া নিবাসী অনিরুদ্ধ গুপ্ত ইহার প্রণেতা। শ্লোক সংখ্যা ৭০ মাত্র।

আরম্ভ শ্লোক,—

অবধান কর ভাই শুন সর্ব্বজন।
মন দিয়া শুন সবে এই বিবরণ॥
সন হাজার বাহুর সালে প্রথম আশ্বিনে।
দামোদরে আইল বাণ অতি কুলক্ষণে॥

শেষ শ্লোক,—

রচিলাম এই কাব্য ধর্ম্মের চরণে।
লোক মুখে শুনি ভাই না দেখি নয়নে॥

১১। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। কবিচন্দ্র।

এ সম্বন্ধে দুইখানি পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছে। দুইখানিরই রচয়িতা কবিচন্দ্র, কিন্তু রচনা বিভিন্ন প্রকার। প্রথমখানির নাম দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দ্বিতীয়খানির নাম দৌপদীর লজ্জানিবারণ। প্রথমটীর আরম্ভ শ্লোক,—

বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
মহাভারতের কথা শুন জন্মেজয়॥
রাজসূয়যজ্ঞ রাজা করিলেন সার।
মহারাজা যুধিষ্ঠির বসিলা সভায়॥
সহদেব নকুল আর ভীম ধনঞ্জয়।
সভা করি বসিলেন পাণ্ডুর তনয়॥
ভীষ্মদেব কৃপাচার্য্য দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
কর্ণ অশ্বত্থামা আদি যত যোদ্ধাবর॥

মধ্য শ্লোক,—

দুর্য্যোধন বলে ভাই শুন দুঃশাসন।
দ্রৌপদীকে আন হেথা দেখিব কেমন॥
যুধিষ্ঠির দুই চক্ষু করে ছল ছল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দমঙ্গল॥

* * *

অন্ত শ্লোক,—

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
পরের করিলে মন্দ আপনার হয়॥
পরের অখ্যাতি পরে করে যেই জন।
মরিলে না হয় মুক্ত নরকে গমন॥
এত শুনি জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান গোবিন্দ-মঙ্গল॥

ইতি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সমাপ্তং। স্বাক্ষরং শ্রীগোবিন্দরাম সরকার। পাঠক শ্রীরামনারায়ণ শেঠ সাং ভাঙ্গামোড়া পরগণে বালিগড় সন ১২৪৪ সাল বারশত চুয়াল্লিশ সাল তাং ১৯ ফাল্গুন। পাঠশালে বসিয়া ইতি। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৪০।

১২। দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ শ্লোক,—

রাজা কহে শুন শুন ব্যাসের নন্দন।
কহ গোসাঞি দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব।
বসিয়া আছিল তথা সকল পাণ্ডব॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা দুর্য্যোধন সনে।
পণ করি পাশা তবে খেলে ততক্ষণে॥

শেষ শ্লোক,—

দ্রৌপদী লইয়া সবে করিয়া গমন।
এতদূরে সমাধান লজ্জা নিবারণ॥
বিরাটপর্ব্বের কথা ব্যাসের বর্ণন।
ভাগবতামৃত কথা কবিচন্দ্র গান॥

ইতি দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯৪ সাল শনিবার। এই পুস্তক শ্রীরামচন্দ্র পাল সাং মদনমোহনপুর (ভাঙ্গামোড়ার অন্য নাম) পরগণে বালিগড়। সরকার মান্দারণ। ২৪ পৌষ। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকস্ত দোষ নাস্তি। শ্লোক সংখ্যা ২২০।

১৩। দুর্ব্বাসার পারণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ শ্লোক,—

বনবাসে রমণী করিলেন রক্ষা।
দুর্ব্বাসার দর্পচূর্ণ করিলেন যক্ষা॥
এক দিন দুর্ব্বাসা হাজার শিষ্য সাথে।
গেলা দুর্য্যোধন বাসে ভোজন জনিতে॥

শেষ,—

দ্রৌপদীরে রমানাথ করিয়া সান্ত্বনা।
দ্বারকায় গেলা হরি ঘুচিল যন্ত্রণা॥
এই পালা যেই জন করেন স্মরণ।
রোগশোক যায় তার বিপদ খণ্ডন॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে বলে পালা হৈল সায়।
ধনপুত্র হয় তার যে জন পাওয়ায়॥

ইতি দুর্ব্বাসার পালা সমাপ্ত। ভীমভাপি রণে ভঙ্গঃ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। সন ১১৯৩ সাল, সাং পোল পুঁথি পাঁচু দাস বসাকের তাং ১৫ আশ্বিন। লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ বাউল।

১৪। ধর্ম্মপারায়ণ। সহদেব চক্রবর্ত্তী।

ধর্ম্মপুরাণ, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইতিপূর্ব্বে পরিষৎপত্রিকায় আমূল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। ধর্ম্মমঙ্গল। দ্বিজ রামচন্দ্র।

কেবলমাত্র আদি ঢেকুর পালাটী আছে। উহার আরম্ভ,—

বেণু রাজার ঘরে কন্যা বাড়ে রত্নাবতী।
রূপের প্রতিমা জিনি রম্ভা অরুন্ধতী॥
রাজা গৌড়েশ্বর লয়্যা কর অবধান।
দালানে বসিলা দিয়া করিয়া দেয়ান॥

ভণিতা,—

নিজ দুঃখ সেন কহে রাজার নিকটে।
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান নিবাস চামটে॥

শেষ,—

দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাদ্যের পায়।
হরিধ্বনি কর সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি সন ১২৫২ সাল তারিখ ৩২ পৌষ। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৮০।

১৬। নন্দবিদায়। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ,—নন্দবিদায় লিখ্যতে,—

যুবতী সকলে কান্দে কংস করি কোলে।
করাঘাত করে শিরে ভাসে অশ্রুজলে॥
অতিশয় করুণা করয়ে কংসজায়া।
কোথাকারে গেলে নাথ কে করিবে দয়া॥

শেষ,—

ইতি নন্দবিদায় সমাপ্তং। স্বাক্ষরমিদং শ্রীগোলোক ধাম কুণ্ড সাং হেলান। পুস্তকমিদং শ্রীকৃষ্ণমোহন দত্ত সাং নহিপুর পরগণে বালিগড়ি সন ১২০৩ সাল তাং ২রা কার্ত্তিক শনিবার। শ্লোক সংখ্যা ২২০।

১৭। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী। গৌরীদাস।

আরম্ভ,—

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং গোকুলানন্দনন্দনং।
অমৃত-রত্নাবলী গ্রন্থ মুকুন্দঃ ক্রিয়তেঽধুনা॥
জয় জয় সচ্চিদানন্দ রসের বিগ্রহ।
তোমার পদারবিন্দ ভজি হে নিশ্চয়॥

জয় জয় গোকুলানন্দ শ্রীনন্দনন্দন।
অধমের অভিলাষ করিবে পূরণ॥

ইহাও একটী রূপক, অমৃতরত্নাবলীর বিস্তার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শেষ,—

রত্নসার রত্নেশ্বর সদা ভাবি মনে।
অধম জনার এই রত্নসার ধনে॥
নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী হইল পুরণে।
দীন গৌরীদাস কহে নিজ প্রভু গুণে॥

ইতি নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী সম্পূর্ণ। যত্নেন লিখিতং ইত্যাদি। শ্লোক সংখ্যা ১৫৫৫।

১৮। নিকুঞ্জরহস্য স্তবগীতালি। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন কৃত মূল বংশীদাস কৃত অনুবাদ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যোনমঃ। শ্রীশ্রীরূপসনাতন গোস্বামী চরণেভ্যোনমঃ। সকল রামকেভ্যোনমঃ। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ জয়তঃ। অথ শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তব অস্য গীতালি। আদৌ শ্রীমতো গোস্বামিনোবর্ণনং। ধানশী জয়শ্রীঃ।

শ্রীশচীনন্দন হৃদয় সনাতন রূপ রসিক দুই ভাই।
নিত্যশুদ্ধ যুগশরীর মনোরম জীব লাগী দরশন পাই॥
বৃন্দাবনে সতত নিবাস।
নিশি দিশি রমণী শিরোমণি
মঞ্জুল পাত্র করুণা পরকাশ॥ ধ্রু।

ইহা অতি উচ্চ অঙ্গের ভক্তিগ্রন্থ। ইহার সংস্কৃত গুলি শ্রীমৎরূপ গোস্বামী প্রভু কর্তৃক বিরচিত। মত ৩২টী শ্লোকের ৩২টী গীতালি এই গ্রন্থ বেশিত।

,—

ললিতবেশৌ নব্যলাবণ্যপুঞ্জৌ
রসচলচিত্তৌ নূতনপ্রেমবিত্তৌ।
নিধুবনলীলা কৌতুকে নাতিলোলৌ
নিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ॥

ল। কেদার।

থ সুনিভৃত নিকুঞ্জ মন্দিরে কেলি
সতলপ মাঝ রে।
নবীন রসে ভরি নবীন নাগরী
নবীন নাগররাজ রে॥
নবীন যৌবন বেশ সুনবীন
নবীন পহিরণ বাস রে।
নবীন লাবনি পুঞ্জ রঞ্জিত
চেতন বর ভাস রে॥
নবীন রুচিবর প্রেমসরোবর
ভাঙ্গি ভোগত রঙ্গ রে।
নবীন নিধুবন কেলী কৌতুকে
চপল রসময় অঙ্গ রে॥
নবীন মুখ পেখি কেকি বোলত
আলি আনন্দ বাঢ়েরে।
শরদ রঙ্গিণী রজনী শোহত
বংশী হেরত ঠাঢ়েরে॥

শেষ,—

স্তবমিমমতি রম্যং রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রঃ
প্রমোদস্তববিলাসৈরদ্ভুতং ভাবহৃৎকঃ।
পঠতি য ইহ রাত্রৌ নিত্যমব্যগ্রচিত্তো
বিমলমতি সদালীষু সখ্যং লভেতঃ॥

অস্য গীতালি। করুণাশ্রী।

অতি মনোরম নব, নিকুঞ্জে রহস্য স্তব,
দুঁহার বিলাস সুখরাশি।
প্রমোদ মদন ভর, অদ্ভুত সুন্দর,
সদাই নবীন পরকাশী॥
নিতি নিতি নিশাযোগে, দুই ভাব অনুরাগে,
গায় যেবা শুনে যেবা সুখী।
প্রেমময় স্থলমলে, রাই সখী মণ্ডলে,
পিয়া হয় এক প্রিয়া সখী॥
ইহা জানি ভজ ভজ, বৃন্দাবনচন্দ্ররাজ,
যমুনাবেষ্টিত বন কুঞ্জে।
যাহাতে মন্দির চারু, আর রত্ন কল্পতরু,
বিবিধ বিভব পুঞ্জে॥
তার অতি রম্য রাজে, মনোজ্ঞ মন্দির মাঝে,
সাজে নব কিশোরী কিশোর।
সেই অতি নিরুপম, বিহরে বিলক্ষণ,
হেরি হেরি বংশীদাস ভোর॥

ইতি শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তবগীতালি সম্পূর্ণালি ১২০০ বারশত সাল ৮ অগ্রহায়ণ।

১৯। নিগমগ্রন্থ। গোবিন্দ দাস।

এ সম্বন্ধে পৃথক্ কিছু লিখিবার প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত তালিকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আদ্য ও অন্ত যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের সহিত আমার সংগৃহীত পুথির মিল নাই।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আপনার গুণে সব জীবে কৈলা পার॥
বন্দিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চূড়ামণি।
বন্দে পদ্মাবতীসুতনিত্যানন্দ মণি॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

সংসার ধন্য তার ধুলি কবে পাব।
পবিত্র হইতো সে নর বৈষ্ণব ভজিব॥
কহেন গোবিন্দদাস ভজ ওরে ভাই।
কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোসাঞি॥
দৃঢ় করি ভজ ভাই বৈষ্ণব গোসাঞি।
সকল ভুবনে তাহা হৈতে আর নাঞি॥
বড়র আশ্রয় করি থাকে যেইজন।
যুগযুগান্তরে দুঃখ না পায় কখন॥
ইহা ভাবি ভজ ভাই যার যাহা ইচ্ছা।
কেবল কৃষ্ণের নাম আর সব মিছা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
কলিযুগে প্রেম দান দেন সবাকারে॥

ইতি শ্রীনিগম গ্রন্থ সমাপ্তং। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৩২টী।

২০। নৌকাখণ্ড। জীবন চক্রবর্ত্তী।

আরম্ভ,—

গোপীকে করিতে পার, ছলে কৃষ্ণ কর্ণধার,
হয়্যা যদি রহিলা আপনি।
জানিয়া প্রভুর ছল, যমুনার অগাধ জল,
বায়ুবেগে বহে তরঙ্গিণী॥
মথুরায় গোপনারী, সুখে বিকি কিনি করি,
সবে বলে চল যাই ঘর।
যাইতে অনেক দূর, আছে বৃকভানুপুর,
বেলা হৈল তৃতীয় প্রহর॥

ভণিতি,—

এক চিত্তে এক ধ্যানে, চিন্তে যেবা একমনে,
ভজে যেই কৃষ্ণের চরণে।
চক্রবর্ত্তী নারায়ণ, তস্য সুত শ্রীজীবন,
বিরচিল তাঁহার স্মরণে॥

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত রচিল জীবন।
শ্রবণে কলুষ নাশ বৈকুণ্ঠে গমন॥

ইতি নৌকা খণ্ড সমাপ্ত। সন ১২০২ সাল মাহ ১১ আশ্বিন। পঠনার্থে শ্রীরামজয় পাল। শুক্রবার বেলা এক প্রহর থাকিতে হইল। শ্লোকসংখ্যা ১২০।

২১। প্রসাদ-চরিত্র। শঙ্কর কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আরম্ভে,—প্রসাদ চরিত্র লিখিতং।

প্রসাদ চরিত্র কথা শুন ভাই সর্ব্বে।
ব্রহ্মার বরে দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনি পুর্ব্বে॥

ভণিতি,—

শ্রীকবি শঙ্কর গায় ব্যাসের আদেশে।
মদনমোহন কৃপা কৈলা ব্রাহ্মণের বেশে॥

অন্যত্র,—

পরাভব পায়্যা দৈত্য গেল রাজা পাশে।
কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পুরাণেতে ভাষে॥

শেষে,—

সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে হইয়া সদায়॥

প্রসাদ চরিত্র অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এ[illegible] লিখিতং শ্রীগোপীচরণ ষড়া সাং রামপুর পর[illegible] ষিষ্ট। সরকার সেলিমাবাদ। এই পুস্তক[illegible] শ্রীনিধিরাম মাঞ্চিতি নিবাস রামপুর পরগণে[illegible] বেলা একপ্রহর স্থিতে পুস্তক হইল ইতি ১১[illegible] সাল তারিখ ২৬ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিব[illegible] কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী। শ্লোকসংখ্যা ৪২০।

২২। প্রেমবিষয়-বিলাস। যুগলকিশে[illegible]

আরম্ভ,—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

বন্দেঽহং শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দসহগণৈঃ[illegible]
শ্রীকৃদ্বৈতাদ্বৈতবন্দং গৌরভক্ত প্রণমা[illegible]

বন্দিব শ্রীরূপ রসিকের শিরোমণি।
অনুবাদ কহি ইহার বিধেয় কি জানি॥

শেষ,—

আমারে করহ সবে কৃপাবলোকন।
যুগল কিশোরদাসের এই নিবেদন॥
শ্রীস্নেহমঞ্জরীর পাদপদ্ম করি আশ।
এই যে কহিল প্রেমবিষয়বিলাস॥

ইতি প্রেমবিষয়বিলাস গ্রন্থ সমাপ্ত। শ্লোকসংখ্যা ৪৪২।

২৩। ভক্তিরসাত্মিকা। অকিঞ্চনদাস।

আরম্ভ,—আজানুলম্বিত ভুজৌ ইত্যাদি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥

মধ্য,—

নিত্যানন্দ বলেন প্রভু শুন দয়াময়।
বৈষ্ণব অবৈষ্ণব প্রভু কেমতে জানয়॥
বল প্রভু কোন বৈষ্ণব করিব পূজন।
কোন বৈষ্ণব দ্বারে করি মন্ত্র উপাসন॥
প্রভু কহেন নিত্যানন্দ কর অবধান।
বৈষ্ণব চিনিতে হয় কৃষ্ণের সমান॥
নৈষ্ঠিক ভজনে যার বিশ্বাস দৃঢ় হয়।
সর্ব্বজীবে সমভাব করুণাহৃদয়॥
এইত বৈষ্ণব স্থানে আশ্রয় করিয়া।
বৈষ্ণব সঙ্গ করিব সদা বেদবিধি ত্যজিয়া॥

শেষ,—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তিরসাত্মিকা কহে অকিঞ্চন দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভক্তিরসাত্মিকা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবাণেশ্বর দাস চক্র সাং খাতসি। শ্লোকসংখ্যা ১৭৫।

মন্তব্য [illegible]খানি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ সংবাদ। ইহাতে [illegible]ত্যানন্দ তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং শ্রীচৈতন্য-উত্তর দাতা।

২৪। যোগাদ্যাবন্দনা। কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

আরম্ভ,—অথ যোগাদ্যার বন্দনা লিখ্যতে।

নীলকমলদলখণ্ডননয়নী।
আর কত দিনে দয়া করিবে ভবানী॥
জয় জয় যোগাদ্যা বন্দ ক্ষীরগ্রামবাসী।
অবনীতে মহা স্থান গুপ্ত বারাণসী॥
বাম হস্তে খর্পর মায়ের দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা।
লঙ্কায় রাবণ ঘরে ছিলে উগ্রচণ্ডা॥

শেষ,—

দ্বিজের স্তবেতে দেবী হরষিত হৈল।
জল হৈতে দুটী বাহু শঙ্খ দেখাইল॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ॥
যোগাদ্যার পালা সাঙ্গ শুন সর্ব্বজন॥

ইতি যোগাদ্যাবন্দনা সমাপ্ত। তাং ১০ ফাল্গুন সন ১২৩৬ সাল লিখিতং শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং মদনমোহনপুর (ভাঙ্গামোড়া) পঠনার্থে শ্রীপীতাম্বর দাস শেঠ, সাং ভাঙ্গামোড়া।

মন্তব্য,—পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত যোগাদ্যা বন্দনা কবিচন্দ্র প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত, কিন্তু আমার সংগৃহীত পুথি খানিতে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভণিতিযুক্ত। রচনারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

২৫। রত্নমালা। এখানি সংগ্রহ গ্রন্থ।

ইহাতে কতকগুলি শ্লোক এবং সেই সকল শ্লোকের ভাবানুগামী চন্দ্রশেখর, শশিশেখর এবং গোবিন্দদাস এই তিন মহাজনের কতকগুলি সুমধুর পদ সংগৃহীত হইয়াছে।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তাম্।

নমামি সততং ভক্ত্যা গুরুদেব দয়ানিধিং।
অগতের্মম সর্ব্বস্বং কৃষ্ণকিঙ্করসংজ্ঞক॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ নত্বা যথামতিঃ।
অভিসারাদিকানাঞ্চ বিভবামি প্রভেদকম্॥

প্রথম শ্লোক,—

কুচকল্পভরার্ত্তাং কেশরী ক্ষীণমধ্যা।
বিপুলতরনিতম্বা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী॥

ধবল-বসন-বেশা মালতী-রন্ধ-কেশা।
নিধুবন-রসপুঞ্জং যাতি রাধা নিকুঞ্জং ॥

ধানসী,—

সুচারু চন্দ্রিকা কুটিল পানি।
শ্যাম অভিসারে চলল ধনী ॥
লোটান লম্বিত-মালতী-মাল।
সৌরভে মাতল ভ্রমরা জাল ॥
কুচগিরি-কল-চন্দন মাখা।
নূপুর ধবল বসন ঢাকা ॥
সোণাতে জড়িত মুকুতা কশা।
ওঠ মাঝে খেলে লম্বিত মাসা ॥
গজদশনের সুচারু শাখা।
করমূলে কিবা দিয়াছে দেখা ॥
নিশিসঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি।
শশী কহে কুলে মিলিল নাগরী ॥

শেষ,—

শ্রীরাধায়াঃকুসুমবিপিনে রাজবেশং বিমোদীঃ।
কৃত্বা ছত্রং কনকরচিতং চাপি দণ্ডং দদাতি ॥
শ্রীকালিন্দ্যাঃ সলিলশিশিরৈস্তাঞ্চ সিক্তাং করোতি।
প্রেম্নাকৃষ্টো ব্রজপতিসুতঃ কৌতুকী বেণুপাণিঃ ॥

মঙ্গল,—

রাইক নরপতি বেশ বনাওত কুম বিপিনে হরিরায়।
কাঞ্চনছত্র দণ্ডতারে দেয়ল নিজ করে চামর ঢুলায় ॥
সখী হে দেখ দেখ রাইক ভাগই।
অভিষেক করি যমুনা জল
সুশীতল কলতাই অনুমতি মাগই ॥ ধ্রু
নব নব যৌবনী রসিকিনী রঙ্গিনী
সারি সারি করিয়া বসায়।
কুঞ্জ সহরে হরি করে এক শাঠ করি
রাইক দোহাই কিরায় ॥
যৌবন রতন পসার পসারল নবনব নাগরী ঠাট।
চন্দ্রশেখর কনে তুহি গ্রাহক যোই পাতারল হাট ॥

ইতি শ্রীনায়িকারত্নমালায়ামষ্টপ্রকারস্বাধীনভর্তৃকা সমাপ্তা। শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ ভৃত্বানামনুকম্পয়া সমাপ্তেয়ং বভূবশ্রীনায়িকা রত্নমালিকাঃ ॥ ইতি শ্রীরত্নমালা-গ্রন্থঃ সমাপ্তশ্চায়ম্।

২৬। লক্ষ্মণভোজন। কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

শ্রীশ্রীসীতারামচন্দ্রায় নমঃ। অথ লক্ষ্মণভোজনং লিখ্যতে।

আরম্ভ,—

আনন্দে বসিলা রাম লয়্যা পরিজন।
হেনকালে আইলা তথা কশ্যপ তপোধন ॥
শ্রীরাম বসিলেন রত্ন সিংহাসনে।
শিরে ছত্র ধরেছেন আপনি লক্ষ্মণে ॥

শেষ,—

লক্ষ্মণভোজন চৌদ্দভুবন উল্লাস।
মোহ পায়্যা বিরচিল কৃত্তিবাস ॥

ইতি লক্ষ্মণভোজন সমাপ্তঃ। লিখিতং শ্রীগোরাচাঁদ দাস, সাং কালিকাপুর, পরগণে বালিগড়ি। ইতি তাং ১৩ ভাদ্র, সন ১২৫০ সাল। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৮০।

২৭। লক্ষ্মণের শক্তিশেল। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ,—অথ লক্ষ্মণের শক্তিশেল লিখ্যতে।

মরিল সকল সেনা শূন্য হইল পুরী।
অবিরত মোহে কান্দে সবাকার নারী ॥
দিবানিশি মন্দোদরীর শুনিয়া ক্রন্দন।
কোপ করি রণমাঝে সাজে দশানন ॥

মধ্য,—

নব-দুর্ব্বাদলশ্যাম, ধূলায় ধূসর রাম,
শোকানলে হইয়া অস্থির।
এলাইলা জটাভার, ভাই ডাকে বার বার,
ধরিলে না ধরে ধনুতীর ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, ক্ষণে লক্ষ্মণের পাশে,
ক্ষণে ক্ষণে করে হায় হায়।

শেষ,—

লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ ডাকে রাম জয়।
রাবণ সাজিল বলি কবিচন্দ্র কয় ॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেল সাঙ্গ। ইতি সন ১২৫১ সাল। পাঠক শ্রীরামভদ্র বিশ্বাস। পরগণে বালিগড়ি লাট ঘনশ্যামপুর সাং দরাপুর। দিবসের শেষ [illegible] প্রহর বেলায় সময় সাঙ্গ। শ্লোকসংখ্যা ৪২০।

রাগ—কানড়া।

মোহন মূরতি কান।
অবলা কি রহে প্রাণ॥
চূড়ায় ময়ূরের পাখা।
তাহে ইন্দ্রধনু দেখা॥
তা দেখি রমণী জিয়ে।
নব মধু যেন পিয়ে॥
হাসির হিল্লোলে তারা।
অমিয়া বরিখে ধারা॥
নবীন চাতক যেন।
ঘনরস পিয়ে ঘন॥
চাহনি চঞ্চল শরে।
তারা কি রহিব ঘরে॥
নব নব বেশ খানি।
রহিব কোন বাধনি॥
মুরলী অপার গান।
পাষাণ গলিয়া যান॥
সে নব চলন গতি।
মদন মোহিত তথি॥
চণ্ডীদাস রূপ হেরি।
[illegible] ধরণী পড়ি॥ ২॥

চলিতে গমন ময়মত্ত হাতী
অঙ্কুশ নাহিক মানে।
মদন বেদন উপজে তখন
আপন পর কি জানে॥
মনসিজ শরে বিন্ধিল বিন্ধিল
ধানুকী আর কি চেতন রহে।
নিবারণ নহে মরম বেদন
মনহি মাঝারে বহে॥
বরজ-রমণী রমণ-কারণ
চলিলা গভীর বনে।
এই রস তত্ত্ব সঙ্কেত বেকত
কেহত নাহিক জানে॥
প্রবেশ করল বৃন্দাবন মাঝে
দেখিয়া নিভৃত স্থান।
রতন-বেদিকা অতি সুশোভিত
বৈঠল নাগর কান॥
চণ্ডীদাস কহে অপরূপ রাস
বিহার করল কানু।
রস-সুখ-রতি করিতে পীরিতি
সুধুই রসের তনু॥ ৩॥

রাগ—জয়শ্রী।

যমুনার তট অতি রম্য স্থল
রতন-বেদিকা তায়।
নানা তরুবর পুষ্প বিকশিত
নানা[illegible]
[illegible]ারা

৫ম ভাগ।] [২য় সংখ্যা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী।

চণ্ডীদাসের বাসস্থান নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে চণ্ডীদাসের রাসলীলাত্মক এই কয়েকটি পদ পাইয়াছি। যতদূর জানি, এই পদগুলি পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের আরও অনেক অপ্রকাশিত পদ আছে। অনুসন্ধান করিতেছি, পাইলেই প্রচারিত করিব।

অথ রাসলীলা।

রমণীমোহন রমণী মোহিতে
সে দিনে করল বেশ।
চূড়ার টাননি কিবা সে বান্ধনি
বিচিত্র সুচারু কেশ॥
মণি হেম মালে বেড়িয়া দুধারে
তাহাতে মুকুতার মাল।
প্রবাল [illegible]

ময়ূর শিখণ্ড ঝলমল করে
তাহা সে উড়িছে বায়॥
নাগর বরণ যেন
অঞ্জন গনিতে [illegible]
ভাঙ ধনু [illegible]

চণ্ডীদাস কহে আহীর-রমণী
চলিয়া যাইতে নারে ॥ ১০ ॥

শ্রীরাগ।

এই মত সব গোপেরি রমণী
চলিল নাগরী রামা।
রাই পাশে গিয়া চলিলা ধাইয়া
সঙ্কেত বলহিঁ ধা(ই)য়া ॥
চল চল ধনি রাই প্রেমমণি
চল চল যাব বনে।
রসের আবেশে কহে নব রামা
কহিছে ধনির স্থানে ॥
ইথে ধ্বনি আসি রাধার শ্রবণে
পশিল যতনে তাই।
তরল কথন (?) রমণী অন্তর
কহেন সুন্দরী রাই ॥
পুনঃ শুন শুন ডাকে ঘন ঘন
মধুর মরলী তান।
শুনিতে চমকে মুরলী ধমকে
চিতে নাহি কিছু আন ॥
রাধার আরতি সে নহে পীরিতি
তথায় আছয়ে মন।
বৃন্দাবন যেতে বেশের আবেশে
কহিছে সকল জন ॥
সুখময়ী রাধা বেশ বনাইল
বন্ধন করিল জাল।
নানা ফুলদাম বেড়ি অনুপাম
দিয়া মুকুতার মাল ॥
দুসারি মাণিক তার পাশে পাশে
প্রবাল গাঁথিয়া মাল।
কনক চম্পক কবরী বেঢ়ল
ভ্রমরা গুঞ্জরে ভাল ॥
সিঁথায় সিন্দূর তার মাঝে মাঝে
দিয়েছে চন্দন ফোঁটা।
যেন শশধর চৌদিকে বেঢ়ল
কি তার কহিব ঘটা ॥
নাসায় বেসর অতি মনোহর
হাসিতে মুকুতা খসে।
কনক কাঁচুলি তার পরিপাটী
মুকুতা গাঁথনি পাশে ॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে রিণি রিণি
পিঠেতে দুলিছে ঝাঁপা।
তাহার মাঝারে গাঁথি থরে থরে
সুবাস কনক চাঁপা ॥
নীল উরণী ভুবনমোহিনী
সোণার নূপুর পা[redacted]
চলিতে চরণে
হংস গমনে যায় ॥
চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা
রূপে করিয়াছে আলো।
দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে
দেখিতে যাইবে চল ॥ ১১ ॥

রাগ—কামদ।

দেখ সখি অপরূপ মনোহর।
এ ভব সংসার মাঝে হেন কভু নাহি দেখি
বেশে যেন করে ঢল ঢল ॥
মাঝে রসবতী রাধা ব্রজজন হ'য়ে রাধা
পাছে দেখি ধরিয়া রহায়।
ভয়েতে আকুল হৈয়া ত্বরিতে রাধারে লৈয়া
বৃন্দাবন মুখে সব ধায় ॥
মন্দ মন্দ গতি চলে রাই কহে কুতূহলে
আজ বড় আনন্দ অপার।
সেরূপ আনন্দ নিধি দেখিব চরণ দুটি [redacted]

(১) কিছু বাদ গিয়াছে।

আনহি ব্যঞ্জনে আনহি দেওল
আনহি হাঁড়িতে ঝাল ॥
রন্ধন উপেখি চলে সেই সখী
শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে আবেশে গমন
হইবে উথল হাসি ॥ ৮ ॥

রাগ তথা।

কে[illegible] আছিল শিশু কোলে করি
পিয়াইতে আছিল স্তন।
[illegible] ভূমে ফেলি গেলা
[illegible]হন তাহার মন ॥
[illegible] গমন সেই বৃন্দাবন
[illegible]তে লাগিল শিশু।
সব পরিহরি
[illegible]না নাহিক কিছু ॥
কোন জন ছিল পতির শয়নে
ঘুমে অচেতন হৈয়া।
হেন বেলে শুনি মুরুলির ধ্বনি
উঠিল চেতনা পা(ই)য়া ॥
বিচিত্র বসনে মুখানি মুছিয়া
চলন পতিরে ত্যজি।
পতি কোল সেই ত্যজিলা তখনি
চলন বনেতে সাজি ॥
কোন গোপী ছিল, কোন আরম্ভণে
ত্যজিয়া তখনি চলে।
রসের আবেশে কিছু নাহি জানে
কারে কিছু নাহি বলে ॥
কোন জন ছিল বেদনে দুঃখিত
অঙ্গেতে আছিল দোষ।
[illegible]ী গীত অঙ্গ পুলকিত
সব দূরে গেল শোষ ॥
চণ্ডীদাস বলে কিবা সে দেখল
অপার অখল রাগা।
তেই সে প্রেমেকে বন্ধন সবাই
গোপের রমণী জনা ॥ ৯ ॥

রাগ—কানড়া।

ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া
আকুল হইয়া চিতে।
নিজ বেশ করে মনের সহিত
শুনিয়া মুরলী গীতে ॥
রসের আবেশে পদ আভরণ
কেহ বা পরল গলে।
গল আভরণ কোন ব্রজরামা
পরিছে চরণে ভালে ॥
বাহুর ভূষণ কনক কঙ্কণ
পরিল হৃদয় মাঝে।
হিয়ার ভূষণ পরিছে যতন
কটিতে ভূষণ সাজে ॥
কেহবা পরল একই কুণ্ডল
শোভই একই কানে।
ঐছন চলিল বরজ রমণী
ধৈরজ নাহিক মানে।
এক করে পরে কনক-কঙ্কণ
সিন্দুর পরল ভালে।
কোন জন পরে নয়নে অঞ্জন
একহিঁ নয়ন চালে ॥
নানা আভরণ পরে কোন খানে
তাহা সে নাহিক জানে।
আবেশে রমণী গমন করল
সেই বৃন্দাবন পানে ॥
কেহ নব রামা বসন ভূষণ
উলট করিয়া পরে।

চণ্ডীদাস বলে ব্রজ-জনাচিত
আকুল হইয়া গেল।
নাহি আন কথা পাই হিয়া ব্যথা
কি বুদ্ধি করিব বল ॥ ৬ ॥

রাগ—ধানসী।

শুনগো মরম সখি।
ঐ শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকয়ে কমল আঁখি।
ধৈরজ না ধরে প্রাণ কেমন করে
ইহার উপায় বল।
আর কিয়ে জীব গোপের রমণী
বৃন্দাবনে যাব চল ॥
এই অনুমান করে গোপিগণ
শুনি সে বাঁশীর গীত।
শুধু তনু দেখ এই তনু মোর
তথায় আছয়ে চিত ॥
মুগধ রমণী কুলের কামিনী
না জানে আপন পথ।
যেনক চাঁদের রসের পরশ
চকোর অমুহি রথ ॥
সেজন পাইলে চাঁদের সুধাটী
সুখের নাহিক ওর।
কতক্ষণে মোরা ভেটব নাগর
পাবহ তাকর কোর ॥
যেন মেঘ রস তাহাতে আবেশ
চাতক (না ?) পায় বারি।
সেজন পিয়ারে না পাই আবেশে
সেজন হতাশে মরি ॥
জলের আবেশে চাতক ঝরয়ে
তেমনি আমরা হই।
ভবে সে জিয়ই অথির রমণী
জলদ গতিক সেই ॥

চণ্ডীদাস বলে চলহ নিকুঞ্জে
ভেটিতে নাগর কান।
ঐ শুন বাঁশী বাজে এই নিশি
ত্বরিতে চলিয়া যান ॥ ৭ ॥

শ্রীরাগ।

কি করিতে পারে গুরু দুরুজন
হয় হউ অপযশ।
চল চল যাব শ্যাম দরশনে
ইথে কি আনের বশ ॥
যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলক
তিলে কত যুগ মানি।
সেজন ডাকিতে মুরলী সঙ্কেতে
ত্বরিতে গমন মানি ॥
কেহ বলে শুন আমার বচন
রহিতে উচিত নহে।
চল চল চল যাব বৃন্দাবনে
মোর মন হেন লয়ে ॥
কোন গোপী ছিল গৃহ পরিবারে
করিতে গৃহের কাজ।
গৃহ কাজ ত্যজি চলিলা তখনি
যেমত আছিল সাজ ॥
কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আ
তেজিল দুগ্ধের খুরি।
আবেশে দুগ্ধেতে ঢালিয়া
গাগারি ভরিয়া বারি ॥
চলিলা ত্বরিতে সব
দুগ্ধ আবর্ত্তন ছাড়ি।
বৃন্দাবন মুখে তখনি
রহল তেমতি পড়ি ॥
কোন গোপী ছিল রন্ধন
শুধুই হাঁড়িতে জাল।

ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
পেকন ধরিয়া তারা।
চাতক চাতকী ডাহুক ডাহুকী
হংস জোড়ে ডাকে তারা॥
যমুনার নীরে জলচর চরে
সফরী ফিরিছে তায়।
নানাপুষ্প ফুটে পঙ্কজ দুসারী
মধুকর মধু খায়।
চণ্ডীদাস কহে কিবা সুখময়ে
নিভৃত সুচারু বনে।
সেখানে একাকী বৈঠল নাগর
এ কথা কেহ না জানে॥ ৪॥

রাগ—কাফি।

নিভৃত নিকুঞ্জে কুঞ্জ কুটীর
মণিমাণিকের স্তম্ভ।
রতন জড়িত পরশ পাথর
অতি অনুপম রঙ্গ॥
উপরে জড়িত হেম মরকত
মুকুর কিসে বা গণি।
চারি পাশে শোভে মুকুতা প্রবাল
গাঁথিয়া মাণিক মণি॥
ঝলকে অতি মনোহর
ঐছন কুটীর শোভে।
পতাকা উড়ে অনুপম
কুটীর উপরে দিয়া।
কোটী এ কুঞ্জ কুটীর
সকল তাহার ছায়া॥
নাগর চতুর শেখর
চতুর নাগর কান।

ইহার পর আর এক চরণ থাকা উচিত থিতে ক্রিস্ত নাই।

এমন আনন্দ দেখিয়া সে কুঞ্জ
চণ্ডীদাস গুণ গান॥ ৫॥

তথা—

টল টল টল অতি মনোহর,
শরত পূর্ণিমার শশী।
নটবর কানু মুরলী বদনে
সদনে কুটীরে বসি॥
কলরব করু যত পাখীগণ
ময়ূর ময়ূরী নাচে।
ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্কার শবদে
ডাহুক ডাকিছে সাধে॥
মদন বেদন নন্দের নন্দন
করিতে রসের লীলা।
নিভৃতে বসিয়া নাগর রসিয়া
কামেতে হইয়া ভোলা॥
বদনে ভূষণ মুরলী বদন
বাজয়ে কতেক তান।
সঙ্কেত নিশান বাজে আন তান
ছুটল পঞ্চম গান॥
প্রিয় রাধা বলি ডাকিছে মুরলী
শুনিনু শ্রবণে যবে।
যত গোপনারী আন নহে কিছু
কাননে চলহ তবে॥
বিদ্ধল মরমে হিয়া আনচান
কহিতে কাহারে নারে।
মনের বেদন নাহি জানে আন
শুনি মন হিয়া ঝুরে॥
শুনিতে মুরলী যেমত পাগলী
বনের হরিণী প্রায়।
ব্যাধের বাণ খেয়ে ধাওল হইয়া
চারি দিকে যেন চায়॥

ভাসিব আনন্দ রসে পূরিব যতেক আশে
তবে হয় কামনা পূরিত।
চণ্ডীদাস কহে তাথে একা হোথা যদুনাথে
রাধা নামে বাঁশী গায় গীত॥

অভিসারানুরাগ—রাগ সুই।

শ্যাম-মন্ত্র-মালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়॥
রসের আবেশে আনন্দ হিল্লোলে
তরল নয়নে চায়॥
অপার অপার বহুবিধগদ(?)
সুন্দরী সে ধনি রাই।
শ্যাম দরশনে চলিলা ধেয়ানে
শুধু শ্যাম গুণ গাই॥
মন্দ মন্দ গতি চলন মাধুরী
যেমন সোণার লতা।
কিবা সে তড়িত চলিল ত্বরিত
কি কব তাহার কথা॥
চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দ রসে।
কেহ কোন যেন সম্পদ পাইয়া
সুখের সায়রে ভাসে॥
পথে যেতে কহে রাধা শিরোমণি
কত দূরে বৃন্দাবন।
কহ কহ দেখি কোন খানে আছে
রমণী জনার ধন॥
আগে হেরি দেখ দু আঁখি চাহিয়া
এই উপবন মাঝে।
এখানে বসিয়া নাগর আছেন
দেখহ কোন বা কাজে॥
চণ্ডীদাস কহে গোপিনীর বোলে
চাহিয়া দেখিলা রাই।
ঘন ঘন রব মুরলীর শব্দ
তাহাই শুনিতে পাই॥ ১৩॥

রাগ—কানড়া।

রাধার আরতি পীরিতি দেখিয়া
কহেন কোন বা সখি।
আজি সে তোমার মিলিব সুদিন
কমল-নয়ন আঁখি॥
প্রেম অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
হৃদয় পুলক মানি।
প্রেমের হুতাশে কহিছে নিকষে
কহেন রমণী ধনি॥
কেমনে এ বনে যাইব সঘনে
পাছে কোন দশা হয়।
এই দুঃখ উঠে মরম বেদন
মোর মনে হেন লয়॥
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
হৃদয়ে পড়িয়া আছি।
এ দেহ তাহারে মনের মানসে
যতনে লইয়া আছি॥
শ্যাম পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
চলে রসময়ী রাধা।
প্রেমের তরঙ্গে আছে আন বোল
নিগড় আছয়ে বান্ধা॥
গোপীগণ বলে হাসি রস রসে
চলই ত্বরিত করি।
কাননে কালিয়া নিভৃতে বসিয়া
করেতে মুরলী ধরি॥
ঐছন ঐছন মধুর মুরলী
এস এস বলি ডাকে।
চণ্ডীদাস কহে ত্বরিত গমনে
এস বৃন্দাবন মুখে॥ ১৪॥

রাগশ্রী।

চলল গমন, হংস যেমন,
বিজরীতে মন উয়ল ভুবন,
লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল,
ও চাঁদ বদন হেরিয়া।
সরল ভালে সিন্দুর বিন্দু,
তাহে বেঢ়ল কতেক ইন্দু,
কুসুম সুষম মুকুতা মাল
নোটন ঘোটন বান্ধিয়া॥
বিম্ব অধর, উপমা জোর,
হিঙ্গুল মণ্ডিত অতি সে ঘোর,
দশন কুন্দ, যেমন কলিকা,
কিবা সে তাহার পাঁতিয়া।
হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল,
নাসা করপর বেসর আর,
মুকুতা নিশ্বাসে দুলিছে ভাল,
দেখহ রে কত ভালিয়া॥
চণ্ডীদাস দেখি অথির চিত,
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত,
রস ভরে ধনি সুন্দরী রাই,
চলল মরমে মাতিয়া॥ ১৫॥

রাগ—কানড়া।

রাধার আবেশ গমন মন্থর
চলল আবেশ হৈয়া।
শ্যাম-মন্ত্র-মালা জপিতে জপিতে
প্রবেশ করল গিয়া॥
উপবন মাঝে প্রবেশ করিল
সুখময়ী ধনি রাই।
প্রেম-রস-ভরে আধ আধ ব'লে
কহিছে সঘনে তায়॥
এক সখী গিয়া, সেখানে যাইয়া,
কহিছে রাধার পাশে।
কি আর বিলম্ব, করিছ তোমরা,
চলহ ত্বরিত বেশে॥
নাগর-শেখর একলা আছয়ে
চলহ ত্বরিত করি।
গিয়া বৃন্দাবনে দিল দরশন
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥ ১৬॥

কামদ—রাগ।

এক গোপী ছিল পতির শয়নে
ত্যজিয়া যাইতে তারে।
তার পতি ইহা জানিল শয়নে
তাহারে ধরিয়া বলে॥
এত নিশি বল, কোথারে গমন
সরম নাহিক তোর।
লোকে অপযশ, কুযশ কাহিনী
কুলেতে নাহিক ডর॥
বড় বিপরীত, দেখি তোর রীত,
এ নিশি কোথাএ যাবে।
কুলটা হইলি কলঙ্ক রাখিলি
মারি দুখ যায় তবে॥
ত্যজিয়া আমারে, যাই কোথাকারে,
এ বড় বিষম দেখি।
বহুত গঞ্জনা, শুনি নি-শবদে
রহিল কমলমুখী॥
যখন তাহার, ঘুমাইল পতি,
তখন ত্যজিয়া গেল।
রসের আবেশে চলিল সুন্দরী
কিছুই নাহি শুনিল॥
ভয় পরিহরি, চলিল সুন্দরী,
যেখানে নাগর কানু।

চণ্ডীদাস ভনে, কিছুই না মানে,
এমনি বাঁশীর তান ॥ ১৭ ॥

শুন হে কমল আঁখি।
এ বড় সেখানে, পরাণ এখানে
শুধু দেহ আছে সাথী ॥
সকল তেজিয়া, শরণ লয়েছি,
ও দুটী কমল পায়।
ঠেলিয়া না ফেল, ওহে বাঁশীধর,
যে তোর উচিত হয় ॥
তিলেক না দেখি, ও মুখমণ্ডল
মরমে না শুনে আন।
দেখিলে জুড়ায়, এ পাপ পরাণ,
ধড়ে আসি রহে প্রাণ ॥
যেমন ঘরের, দীপ নিভাইলে,
অন্ধকার হেন বাসি।
তেন মত তুমি, লোচন সভার,
হেনক আমরা বাসি ॥
সকল ছাড়িয়া, যে জন শরণ
তাহারে এমতি কর।
তুমি সে পুরুষ-ভূষণ শকতি
বাঞ্ছা সিদ্ধি নাম ধর ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন গোপনারী
কি শুনি দারুণ বাণী।
সরস বচনে সিচহ যতনে
যতেক কুলের নারী ॥ ১৮ ॥

শ্রীমতীর করুণা-দৈন্য উক্তি।

তথা রাগ।

শুনহে নাগর রায়।
কি বলিব রাঙ্গা পায় ॥
আমরা কুলের ঝি।
তোমারে বলিব কি ॥
যে ভজে তোমার পায়।
সে জন তোমারে ধ্যায় ॥
আন কি জানি এ মোরা।
তুমি নয়নের তারা ॥
যে বল সে বল মোরে।
ছাড়িতে নারিব তোরে ॥
তোমার মুরলী শুনি।
ধাইয়া আইনু আমি ॥
শুন হে পুরুষ-ভূষণ।
তুয়া মুখে এমন বচন ॥
কি বলিব আমরা অবলা।
আমি হই দাসী পনসারা(?) ॥
চণ্ডীদাস কহু গুণ গায়।
অদ্ভুত শুনি হে হেথায় ॥ ১৯ ॥

তথা রাগ।

শুন হে নাগর রায়।
তোমার উচিত, এ নয় উচিত
এ কথা কহিব কায় ॥
তোমার কারণে, সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়েছি ডোর।
অবলা অথলে, হেন করিবারে
এ নহে উচিত তোর ॥
আমরা স্বপনে, আন নাহি জানি
কেবল দুখানি পায়।
এতেক বেদন, তোমার কারণ
শুন হে নাগর রায় ॥
সকল তেজিনু, তভু না পাইনু
হৃদয় কঠিন বড়ি।
হাসিয়া হাসিয়া, বঙ্কিম চাহিয়া
এবে কেনে কর দেড়ি ॥
তুমি প্রেম মণি, পরম বাখানি
ছুঁইলে রতন হয়।

রাঙ্গের সমান, ইথে নাহি আন
এমন গতিক নয়॥
বহুর অধন, অমূল্য রতন
যাহার নাহিক মূল।
এ ধন লাগিয়া, পাইয়া আমরা
না পাইয়া কোন কূল॥
চণ্ডীদাস বলে, আমি জানি ভালে
কালার পীরিতি নেঠা।
যেমন জানিবে, সরোরুহকুল
তাহার অঙ্গের কাঁটা॥ ২০॥

রাগ—কানড়া।

তুমি বিদগধ, সুখের সম্পদ
আমার সুখের ঘর।
যে জন শরণ, লইল চরণে
তাহারে বাসহ পর॥
দেখি বল নাথ, এ ভব সংসারে
আর কি আছয়ে মোরা।
এ গোপী জনার, হৃদয় মানস
কেবল আঁখির তারা॥
গৃহপতি ত্যজে, হা হা মরি লাজে
শুন হে নাগর রায়।
এ সব না জানি, মনে নাহি গণি
সকলি গোচর পায়॥
শীতল চরণ, যে লয় শরণ
তাহাতে এমনি রোষ।
অবলা বচনে, কত খেণে খেণে
কত শত হয় দোষ॥
প্রাণপতি তুমি, কি বলিব আমি
আনের অনেক আছে।
আমার কেবল তুমি সে নয়ন
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগর
ইহাতে নাহিক আন।
সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া
তুমি সে সভার প্রাণ॥ ২১॥

শ্রীরাগ।

তুমি বিদগধ রায়।
বলিতে কি জানি, কি আর বলিব
সকলি গোচর পায়॥
যে বল সে বল মোরে নাগরশেখর।
পর কৈল আপন আপন কৈল পর॥
মনের আগুণ কত উঠে অনিবার।
কাহারে কহিব ইহা আচার বিচার॥
এমন ব্যথিত পাই আপনা বলিতে।
আন কথা কহিলে করএ অন্য চিতে॥
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ পাপ ননদিনী।
মিছামিছি বলে সদা শ্যাম-কলঙ্কিনী॥
তোমার কলঙ্ক-হেম-মালা করি গলে।
মিছাই ঘোষণা পাপ ননদিনী বলে॥
ঘরে হৈল পরিবাদ লোকের গঞ্জনা।
তাহাতে নিষ্ঠুর তুমি এবে গেল জানা॥
পরের পরাণ হরি হাসিতে হাসিতে।
বিলোকনে প্রেম দিয়া করিলে পীরিতে॥
তোমার পীরিতি গোপী তেজিয়া সকল।
দাণ্ডাইতে নারী মোরা হইল বিকল॥
চণ্ডীদাস গোপীর দেখিয়া প্রিয় বাণী।
হরষে পরসমণি পরিবে এখনি॥ ২২॥

রাগ—কাফি।

নয়ন তরল বহে প্রেমবারি
অথির কুলের বালা।
খেণে খেণে উঠে বিরহ আগুণ
দুগুণ হইল জ্বালা॥

মলয় চন্দন মৃগমদজাত
অঙ্গেতে আছিল মাখা।
হৃদয় কাঁচুলি তিতিল সকল
তাহা নাহি গেল রাখা॥
প্রেম-ঢল ঢল যেমন বাউল
বনের হরিণী তারা।
ব্যাধ বাণ খায়্যা ঘাইল হইয়া
চারিদিকে চাহি সারা॥
ক্ষীণ গোপীগণে, চাহে চারু পানে
বিরহ বেদনা পায়্যা।
কাষ্ঠ সম যেন চিত্রের পুতলি
সারি সারি দাণ্ডাইয়া॥
কি শুনি কি শুনি বিষম সঙ্কট
হৃদয়ে হইয়া বেথা।
আর কি জীবন সঙ্কট হইল
কি আর দেখহ সেথা॥
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
এমত তাহার রীত।
চল গিয়া জলে প্রেম কুতূহলে
মরিব এ নহে চিত॥
কি আর পরাণ রাখিব আমরা
কি শুনি দারুণ বোল।
যার লাগি এত বিষম বিবাদ
নয়নে বহিএ লোর॥
এই অনুমান করে গোপীগণ
কহত ইহার বাণী।
নাগর বচন কিসের সমান
এবে সে ইহাই জানি॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ গোপিনী
এই মোর মনে লয়।
ভকতি আদরে সরস বচনে
বিনতি করহ পায়॥ ২৩॥

রাগ—জয়শ্রী।

তুমি বঁধু ব্রজের জীবন।
জাতি কুল করিয়া রোপণ॥
তুমি নহ নিঠুরাই পনা।
কেনে দেহ বিরহ বেদনা॥
যে ভজে তোমার দুটী পায়।
তারে নাথ হেন না জুয়ায়॥
গৃহপরিবার পরিহরি।
তোমারে ভজিল ব্রজনারী॥
দেখ নাথ মনে বিচারিয়া।
যত দুখ তোমার লাগিয়া॥
শাশুড়ী-খুরের অতি ধার।
খরতর তাহার বিচার॥
কান্দিতে না পারি তব লাগি।
তবু বলে শ্যামের সোহাগী॥
ঘরে পরে তোমার বিবাদ।
বাহির হইএ সাধে বাদ॥
চণ্ডীদাস দেখিএ দুখিত।
শ্যামে কহিছে অনুচিত॥ ২৪॥

রাগ—ধান্‌সী।

তোমা হেন ধন পরম কারণ
পাইল অনেক সাধে।
বিহি দিয়া পুনঃ করিল এমন
কি আর বলিবে রাধে॥
যে দেখি তোমার আচার বিচার
কুটিল অন্তর বড়ি।
সরল যেজন নাহি তার কোন
কুটিল কটক ছাড়ি॥
ভুজঙ্গে আনিয়া কলসে পুরিয়া
যতনে তাহাকে পুষে।
কোন কোন দিনে সেই বাদিয়ারে
দংশয়ে আপন রোষে॥

ভুজঙ্গ সমান তেন তুয়া মন
তোঁহার চলন বাঁকা।
তোমার অন্তর সেই সে সোসর
এ দুই তুলনা একা॥
যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী
হৃদয়ে বিষের রাশি।
অন্তর কুটিল মুখে মধুপর
আমরা এমন বাসি॥
যে ছিল তা হল তাহাই করিল
নিরমল যেবা ছিল।
তাহে দিয়া কালি ঠাকুরালী ভালি
কলঙ্ক উঠিল ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বলি রাধা
ঐছন কানুর লেহা।
অমিয়া সেচনে সরল বচনে
সঁপহ আপন দেহা॥ ২৫॥

রাগ—সুই।

কানু কহে শুন আমার বচন
যতেক গোপের নারী।
নিশি নিদারুণ কিসের কারণ
জগতে এ সব বৈরী॥
অবলার কুল অতি নিরমল
ছুঁইতে কুলের নাশ।
তাহার কারণে কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস॥
রাধা কহে তাহে শুন যদুনাথে
আর কি কুলের ভয়ে।
এক দিন জাতি কুল শীল পাঁতি
দিয়েছি ওদুটী পায়ে॥
আর কি কুলের গৌরব সূচনা
আর কি জেতের ডর।
তোমার পীরিতে এ দেহ সঁপেছি
এখন কি কর ছল॥
কেবল গোপীর নয়ন অঞ্জন
হিয়ার পুতলি তুমি।
তাহে কর হেন কেন তুয়া মন
এবে সে জানিনু আমি॥
ভাল তুমি বট ব্রজের জীবন
এমতি তোমার কাজ।
চণ্ডীদাস বলে এ নহে উচিত
শুন হে নাগর-রাজ॥ ২৬॥

রাগ—পূরবী।

বঁধুর আদর দেখি অনাদর
কহেন কাহিনী যতি।
তুমি সুনাগর গুণের সাগর
কি জানি তোমার রীতি॥
হাসি রসাইয়া কুল ভাসাইয়া
নিদানে এমনি কর।
এ নহে উচিত তোর অনুচিত
কালিয়া-বরণ-ধর॥
কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
বড়ই কঠিন সেহ।
তা সনে পীরিতি না জানি এ গতি
এবে হে জানিল এহ॥
তখন প্রথম পীরিতি করিলে
দেখি আকাশের চাঁদ।
কত মুখে হাসি বচন সেচন
ইবে সে পাতিলে ফাঁদ॥
হৃদয়ে যা কর কালিয়া-বরণ
সে মেনে কঠিন বড়ি।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিতে
এবে সে হইল গাড়ি॥

আমরা হই এ কুলের বৌহারি
কি বলিতে মোরা পারি।
তাহার উচিত করিলা বেকৃত
শুন হে প্রাণের হরি॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
সকল স্বপন সম।
কানুর ঐছন পীরিতি কেবল
কেন বা করিছ ভ্রম॥ ২৭॥

তথা রাগ।

বঁধু তুমি বড় কঠিন পরাণ।
ইবে মোরা জানি অনুমান॥
কেনে তুমি বিরস বদন।
কহে যত গোপ-সখীগণ॥
ওহে তুমি বিদগধ রায়।
মো সভারে হেন না জুয়ায়॥
শ্রীধর পাতকী ভয় পাবে।
মরিব তোমার নিজ ভাবে॥
দাণ্ডাইয়া দেখহ আপনে।
হয় লয় বুঝ নিজ মনে॥
একে একে ব্রজের রমণী।
হেট মাথে থুটএ ধরণী॥
পাসরিলে সে সব পীরিতি।
পরিণামে হেন কর গতি॥
তুয়া বিনে আর কেবা আছে।
আমরা দাঁড়াব কার কাছে॥
চণ্ডীদাস কহে হেন ভালি।
সুখে রসে কর রাসকেলি॥ ২৮॥

শ্রীরাগ।

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিলা তাথে।
আমরা পরের রমণী হইয়া
বজর পড়িল মাথে॥
পরের পীরিতি আগে না গণিয়া
যে জন পীরিতি করে।
আপনার হাতে বিষ ধরি খায়্যা
পরিণামে হেন করে॥
ছায়ার আকার ছায়াতে মিলাএ
জলের বিম্বুকি প্রায়।
যেন নিশিকালে নিশার স্বপন
তেমত পীরিতি ভায়॥
যেমন বাদিয়া কাঠের পুতলি
নাচায় যতন করি।
দেখিতে মিছাই সকল ছায়াটী
বাজীকরে করে কেলি॥
তেমতি তোমার পীরিতি জানিল
শুনহে নাগর রায়।
পরের পরাণ হরিয়া যতনে
ভাসাইলে দরিয়ায়॥
মুখে কতজন সরল বচন
হিয়াতে কুটিল সারা।
তখনি এমন না জানি কখন
এমন তোমার ধারা॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী
কে বলে পীরিতি ভাল।
পীরিতি-গরলে এ দেহ জারল
অন্তর হইল কাল॥ ২৯॥

সুরুই সিন্ধুড়া।

সে নারী মরুক জলে ঝাঁপ দিয়া
যে করে পরের প্রেম।
পরিণামে পায় অতি পরাভব
যেমত পঙ্কজ হেম॥
তাহে কি বলিব সকল জানহ
যার লাগি যেবা জিয়ে।

সে কেনে নিদয়া নিঠুর হইয়া
এতেক যাতনা দিয়ে ॥
তোমার ঘরণী ডাকিল সুস্বরে
আইল ধাইয়া বনে।
তাহে হেন কর ওহে বাঁশীধর
ফিরিয়া না চাহ কেনে ॥
তোমা হেন বিধি মিলাইল রাধা
পুন তা হইল বাধা।
এ সব বচন কহিতে কহিতে
শোকেতে মরিবে রাধা ॥
তোমার কারণ এ ঘর দুয়ার
বেঁধেছি অনেক দুখে।
তাহা ভাসাইতে এ নহে মহিমা
আর সে বলিব কাকে ॥
চণ্ডীদাস দেখি বড়ই ব্যথিত
মুখে নাহি সরে বাণী।
চিত বেয়াকুল হইল আকুল
যতেক ব্রজের ধনী ॥ ৩০ ॥

রাগ—সুরুই-সিন্ধুড়া।

বঁধু আর কি ঘরের সাধ।
হ্যাদে গো সজনি কহ মোরে বাণী
এ সুখে হইল বাদ।
যে জন ব্যথিত সে জন নৈরাশ
মনে না পূরল সাধ ॥
কাঠের পুতলি রহে সারি সারি
চাহিয়া নাগর পানে।
যেন যে চান্দের রসের লাগিয়া
চকোর থাকয়ে ধ্যানে ॥
তেমত নাগরী রসের গাগরী
মুগধ তাহাতে করি।
যেন বা কো আশে ধনের লালসে
তৈছন গোপের নারী ॥
যেন মেঘবর চাতক অবশ
করিতে রসের পান।
সফরী জীবন যেন জল বিন
সে জন কুলেতে জান ॥
সুধা মাখে যেন করি আনচান
চণ্ডীদাস কহে তবে ॥ ৩১ ॥

রাগ—কানড়া।

এ কথা শুনিয়া রাধা বিনোদিনী
বড়ই আকুল হৈয়া।
যা লাগি এতেক হল পরমাদ
রহল বিয়োগ পেয়া ॥
উপজল মান যেন বিষতুল
সে নব কিশোরী রাধা।
বিমুখ বিয়োগী হইলা কিশোরী
কম্পিত এ তনু আধা ॥
নয়ন কমল যেন রাতাপল
তেজিয়া আনের কাছ।
বৈঠল কিশোরী আপনা পাসরি
মাধবীলতার গাছ ॥
মাধবীলতাতে বসি এক ভিতে
অতি সে বিরস ভাবে।
শ্রীমুখ বিছুটি(?) ধরণী ধূসর
কছু না বচন লবে ॥
বাম সে চরণে অঙ্গুলী সঘনে
ধরণী স্বভাবে খুটে।
নিশ্বাস হুতাসে তাহার বাতাসে
নানা আভরণ ছুটে ॥
ঐছন মনের উঠিল আগুনি
সে ধনি কিশোরী রাই।
কাছে একজন ছিল গোপীগণ
তাহারে উঠাল তাই ॥

তুমি হেথা কেন কোন অভিমান
তুমি যাহ শ্যাম পাশে।
অতি সে বিমুখী রাধা চন্দ্রমুখী
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥ ৩২ ॥

মান।

রাগ সুই।

রাধার চরিত দেখি সেই সখী
চলিলা রাধার কাছে।
সুধামুখী ধনি হয়েছে মানিনী
অতি কোপ মনে আছে ॥
কহে এক সখী শুনহে বচন
যদি বা মানেতে রাধা।
তবে কিবা সুখ উঠে কিবা দুখ
সে ধনি তেজিয়া কিবা ॥
চল মোরা যাব রাধা মানাইব
করিয়া তাহার সেবা ॥
দুই চারি সখী রাই পাশে গিয়া
কহিতে লাগিল তায়।
কেন অভিমান কিসের কারণ
এ দুখী হয়্যাছ কায় ॥
শ্যাম সুনাগরে এ দেহ সঁপেছি
তার কিছু নাহি ভয়।
সে জন বচনে অভিমান কেন
এ তোর উচিত নয় ॥
শ্যাম পরসঙ্গ না কহ আরতি
তোমরা সুরীতে গিয়া।
শ্যামসোহাগিনী যতেক গোপিনী
তোমরা সেবহ সিয়া ॥
আমি না যাইব শ্যাম সাধ গেল
কি বাসে রহল তোরা।
চণ্ডীদাস দেখি মনের বিপথ
ধাইয়া চলিল ত্বরা ॥ ৩৩ ॥

রাগ—সুই।

গেলা যত সখী বচন না শুনি
যুকতি করিছে কতি।
রাই মানাইতে না পারিল মোরা
কি কব ইহার গতি ॥
চলে ব্রজনারী যেথানে গোপিনী
কহিতে লাগিল তায়।
রাই মানাইতে না পারিবে কত
এ কথা কহিবে কায় ॥
হেথা শ্যামরায় রাধা না দেখিয়া
পুছে রসময় কান।
কহে এক সখী শুন সুনাগর
রাধার হয়েছে মান ॥
অনেক যতনে বুঝাইল রাধা
কহেন বিষয় আন ॥
কেন বা মানিনি হয়েছে সে ধনি
কিসের কারণে বল।
কহে সুনাগরী শুন প্রাণ হরি
মানেতে হয়েছে ঢল ॥
তোমার বচন কহিলে যখন
কেন বা আইলে বনে।
সেই সে কারণে অতি অভিমানে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥ ৩৪ ॥

ধান্‌সী রাগ।

নিকুঞ্জে রসিয়া নাগর বসিয়া
বড়ই হইলা দুখী।
রাধার পীরিতি মনে হয়ে তথি
হিয়াতে না হয় সুখী ॥
বাঁশী মুখে দিয়া ব্যথিত হইয়া
পূরত সুস্বর বাণী।
রাধা রাধা বই আন নাহি কই
তুরিতে গমন ধনি ॥

এই বাঁশী কয় মধুরস প্রায়
মনে ঘনে কহে রাই।
বাঁশীতে সকলি নিশান ব্যাকত
ভাবিয়া অমৃত তাই॥
শুনি পশু পাখী পুলকিত মনে
বনের হরিণী যত।
বাউল হৈয়া মিলাইছে শিলা
শুনি সে মুরলী গীত॥
মান ভাঙ্গাইতে পূরিল মুরলী
রাধার না ঘুচে মান।
অতি সে কোপিত না হয় সরল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥৩৫॥

রাগ—সুই।

রাই রাই নাম আর সব আন
চিবুকে মুরলী দিয়া।
রাধা নাম দুটী আখর জপিছে
কোথা হে রসের পিয়া॥
খেণে রাধা রূপ ধেয়ান করয়ে
অন্তরে ওরূপ দেখি।
খেণেক নিশ্বাসে অতি সে হতাশে
রাধা নাম তাহে লিখি॥
মুদিত নয়ন সদা রাধা নাম
গাইয়া আপন মনে।
তেজল সকল বেশ পরিপাটী
রহই একটী ধ্যানে॥
করের অঙ্গুলী ধরি কত বেরী
জপয়ে রাধার নাম।
এই তন্ত্র মন্ত্র এই সুধারস
সঘনে কহই শ্যাম॥
মুগধ মুরারি রসের চাতুরী
আকুল হৈয়া চিতে।
রাধা রাধা বিনে আন নাহি মনে
বসিল কুঞ্জের ভিতে॥
কোথা রসময়ী দেহ দরশন
তো বিনে সকলি আন।
তুমি কুঞ্জেশ্বরী তুমি সে মাধুরী
তোর সদা করি গান॥
তোমার কারণে বাঁশীটী বদনে
শুনি বা কেমন রতি।...(?)
এই সে বাঁশীতে সঙ্কেত নিশান
বাজই রসিক রায়॥
তবু না ভাঙ্গল মান অভিমান
চণ্ডীদাস পুনঃ গায়॥ ৩৬॥

রাগ—করুণা।

বাঁশী ঝাটপনা কতেক প্রকারে
বাজল রসের তান।
তবু না আইল বৃষভানুসুতা
রহল নিভৃত মান॥
বিনোদ নাগর হইল ফাঁপর
তেজিল সকল সুখ।
রাধা পথপানে চাহি ঘনে ঘনে
বাড়ল বিরহ দুখ॥
খেণে কত বেরী উঠল মুরারি
সঘনে নিশ্বাস নাসা।
আলসে কাতর রসিক নাগর
না করে একহি ভাষা॥
না জানি কোথারে পড়ল মাথার
পিঞ্চ মুকুট চূড়া।
কোথা না পড়ল কটির ঘাগর
সে পীতবসন ধড়া॥
কোথা না পড়ল মণিময় হার
বলয়া বাহুর বালা।

কোথা না পড়ল চূড়ার বন্ধন
সে নব গুঞ্জার মালা ॥
কোথা না পড়ল মধুর মুরলী
নূপুর পড়ল কতি।
নয়নে রহত বহুতর বারি
চণ্ডীদাস দুখমতি ॥ ৩৭ ॥

রাগ—সুই।

খেণে রাধা পথ পানে চাই।
মুগধ সে লুবধ মাধাই ॥
কুঞ্জে লুঠত মণি ঠাম।
রাধা রাধা নাম করি গান ॥
কোথা রাধা সুকুমারী গৌরী।
হেরত নয়ন পসারি ॥
পুন মুদত দুই আঁখি।
ধনি মণি কতি নাহি দেখি ॥
এখনি কুঞ্জ নিকুঞ্জে।
গান করত কত পুঞ্জে ॥
হা রাধা রাধা তনু আধ।
হেরইতে পুন ভেল সাধ ॥
তো বিনু সব ভেল রাধে।
হৃদি পরজা তাত রাধে ॥
ঐছন কাতর মুরারি।
গদগদ নয়নক বারি ॥
খেণে উঠে খেণে করে গান।
রাইক পথ পানে চান ॥
চণ্ডীদাস কহে পুন বেরি।
আমি মিলব পুন হরি ॥ ৩৮ ॥

দুর্জ্জয় মান।

রাগ—শ্রী।

এই পরমাদ ব্যথিত হইলা
নাগর রসিক রায়।
রাই ভাবে তনু পরিত হইয়া
তাম্বূল নাহিক খায় ॥
বিসর সকল পূরব পীরিতি
এবে ভেল অভিমান।
কহে সুনাগর চতুর শেখর
দূতী যাহ রাধা ঠাম ॥
রাই মানাইয়া আনিবে যতনে
তবে সে জীয়ই কান।
ত্বরিত গমন করহ এখন
ইহাতে না হয় আন ॥
বড় অভিমানী রাই বিনোদিনী
বসিয়া মাধবী মাঝ।
সঙ্কেতে মুরলী ডাকিল সুস্বরে
অনেক মানের কাজ ॥
তাহে যে গোপিনী গেছিল সেখানে
না ভাঙ্গে রাধার মান।
সেই গোপরামা পরাভব মানি
আয়ল আমার ঠান ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসময়ি
রাধার বড়ই মান।
আন আনিবারে কেহ সে নারিব
শয়ান করহ কান ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমতীর নিকট দূতীর গমন।

রাগ—কামদ।

এ কথা শুনিয়া শ্যাম-মুখ চেয়া
দূতী কহে এক বাণী।
রাই মানাইয়া এখনি আসিব
শুন হে নাগর মণি ॥
কহিছে নাগর চতুরশেখর
এখনি চলিয়া যাও।...
চলি এক মন দূতীর গমন
যেখানে আছয়ে রাই।

সেইখানে গিয়া দিল দরশন
কহিতে লাগল তাই ॥
দূরে হতে দেখি দূতীর গমন
করিল শ্রীমুখ বঙ্ক।
হেন কালে দূতী দাঁড়াই সম্মুখে
কহেন রসের রঙ্গ ॥
দূতী বলে ভাল তোমার চরিত
বুঝিতে নারিল এ।
সে হেন নাগরে পরিহরি ধনি
তাহারে সঁপিল দে ॥
যার লাগি তুমি পথের মাঝারে
সঘনে সঘনে চাও।
সে হেন বঁধুরে ভেজি বহু দূর
কত মেনে সুখ পাও ॥
যাহার কারণে বেণীর বন্ধনে
দিনে কত বার কর।
কালিয়ার সাধে কাল জাদ(?)খানি
ভাবে বেণী পর ধর ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন সুধামুখি
কুঞ্জেতে আকুল কান।
ত্বরিত গমন বিলম্ব না কর
তেজল দারুণ মান ॥ ৪০ ॥

রাগ—গরা।

সে হেন বেশের কেনে রবি তথা
মলিন শ্রীমুখ চাঁদ।
যেন সেই বিধু তাহে নাহি মধু
কেবল বিষের ফাঁদ ॥
বিষের কাছেতে অমিয়া টলকে
কেবল গরল সারা।
যে দেখি আমি তোমার চরিত
বিষম বিপাক ধারা ॥
হেন লয় মন শুনহ বচন
এই সে বাসিএ ভাল।
সে হেন নাগরে তোমার হাবাশে
বিরহে হয়্যাছে ঢল ॥
শীতল পঙ্কজদল বিছাইয়া
শয়ন করিতে চায়।
বিরহ হুতাশে সেই দল জল
খেণে শুকাইছে গায় ॥
সে চুয়া চন্দন মৃগমদ আদি
লেপন করিতে অঙ্গে।
তাহা খেণে খেণে গরল সমান
শুকাইল দেখ রঙ্গে ॥
কমল নয়ন মলিন বয়ান
সঘনে তোঁহারি ধ্যান।
রাধা রাধা বই আন নাহি কই
কিছুই নাহিক জ্ঞান ॥
তেজল নাসার নানা আভরণ
ও নব মুকুটচূড়া।
অতিপ্রিয় বাঁশী তাহা পড়ে কতি
আর সে পীতের ধড়া ॥
শুনহ সুন্দরী করহ গমন
বিলম্ব না কর রাধা।
চণ্ডীদাস বলে তুমি নাহি গেলে
সকলি হইল বাধা ॥ ৪১ ॥

রাগ—মালব।

কি আর দেখহ রাই।
কানু তুয়া গুণ গাই ॥
পরিয়া নিকুঞ্জ ঠাম।
কেবল তোমার নাম ॥
তুয়া পথ কত বেড়ি।
হেমরতন হার তোরি ॥

ডারল অভরণ ভার।
তাম্বূল দূরে করি ডার॥
হেম নূপুর করি দূর।
না কহি বরণ পুর॥
যে হেন নাগররাজে।
অতি মান কন সাজে॥
চণ্ডীদাস কহে ভালি।
তোঁহার ধেয়ান বনমালী॥ ৪২॥

রাগ—কামদ।

কি আর বিলম্ব কাজ।
তুরিতে গমন, করহ যতন,
ভেটহ নাগররাজ॥
কিসের কারণে, মানিনি হয়াছ
শুনহ কিশোরী গোরী।
সে শ্যাম নাগর, তারে পরিহরি
এ তোর মহিমা বোড়ী॥
দেখিল যেমন, শুনহ কারণ
নিদান দেখিল শ্যামে।
তোমার বেণীর পদ্ম পড়েছিল
তাহাই ধরিয়া বামে॥
সেই পদ্ম ধরি নিজ করে করি
তাহাত লইএ কান্দে।
এমনি দেখিল, দেখাই বচন
বড়ই নিদান ছান্দে॥
তোমার ধেয়ানে যেন যোগীজনে
যেনমত দেখিয়াছি।
তাহার কারণে, আমি সে আসিয়ে
তোমা নিতে আসিয়াছি॥
বাম করে ধরি করের অঙ্গুলী
জপই তোমার নাম।
মান তেয়াগিয়া তুরিতে যাইয়া
ভেটহ নাগর শ্যাম॥
চণ্ডীদাস বলে শুন শুন রাধে
বিলম্ব কেন বা কর।
শ্যাম সম্ভাষণে কানুর মালাটী
যতন করিয়া পর॥ ৪৩॥

রাগ—কানাড়া।

এই দেখ ধনি, চান্দ মুখ তুলি
কানুর সন্দেশ লহ।
তোমার লাগিয়া, রজনী জাগিয়া
নিদান হইল সেহ॥
এই লহ রাধা, শ্যামের কুসুম
অতুল তামূল হার।
গলায় পরিলে মান দূরে যাবে
মুখ তোল একবার॥
যে হরি তিলেক, দেখিতে না পায়া
হৃদয় ফাটিয়া মর।
সে জন কুঞ্জেতে, একাকী বসিয়া
এখন এমত কর॥
তুমি সুনাগরী, প্রেমের আগরী
সে রস ছাড়িয়ে কেনে।
এত অভিমান, কিসের কারণ
তিলেক না কর মনে॥
মুখ তুলি চাহ, নিদারুণ নহ
শুন বিনোদিনী রাধা।
সে হেন নাগরে, পরিহর কেনে
সে রসে করহ বাধা॥
অতি নিদারুণ, দেখিনি করুণ
না দেখি না শুনি কভু।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর
তোমার বিরহে প্রভু॥

পুরুষ ভূষণ, কমল নয়ন,
তুরিতে ভেটহ কানে।
রাধারে বিনয় বচন কহিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ৪৪ ॥

রাগ—কানড়া।

রাই তুরিতে শ্যামেরে দেখ গিয়া।
যেন মরকত মণি ধূলায় লোটায়া ॥
কোথা না পড়িল চূড়া মালতী মালা।
কোথা না পড়িল সেই বরিহার জালা ॥
কোথা না পড়িল প্রিয় ধড়ার অঞ্চল।
কোথা না পড়িল নব মুঞ্জরীর দল ॥
নিকুঞ্জে পড়িয়া অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
রাধা রাধা বলি কান্দে করি উচ্চ স্বর ॥
মধুর মুরলী যার অতি প্রিয় সুধা।
সে কোথা বাড়িল তার নাহিক সম্বোধা ॥
অচেতন মুদিত নয়ন কলেবর।
রাধা বিনু বিকল হইলা বংশীধর ॥
তোমার কারণে ধনি তেজি সুখোল্লাস।
খেণে খেণে উঠে যেন বিরহ হুতাশ ॥
মুখ তুলি কহ কথা শুন প্রেমময়ি।
চণ্ডীদাস ব্যথিত শুনিয়া ইহা হই ॥ ৪৫ ॥

শ্রীরাগ।

দূতীর বচনে সুধামুখী ধনি
বয়ানে নাহিক বাণী।
হেঁট মাথে রহে, ও চাঁদবয়ান
তাহাতে অধিক মানী ॥
একে ছিল মান, তাহাতে বাঢ়ল
শতগুণ করি উঠে।
বিরহ আগুন নহে নিবারণ
সে যেন সঘনে ছুটে ॥
বিরহ আগুন নহে নিবারণ
নাহিক বচন ভাষা।
মনে অভিমানী রাই বিনোদিনী
সঘনে নিশ্বাস নাসা ॥
বিরস বদন আন ছলা করি
উত্তর না দেই কিছু।
মাধবী তলাতে বসি ধনি রাধে
নখেতে ধরণী নিছু ॥
বঙ্কিম কটাক্ষে, চাহে দূতী পানে
খেণেকে মুদিত আঁখি।
তা দেখি ব্যথিত মানে গুণি আর
চণ্ডীদাস তাহে সাখী ॥ ৪৬ ॥

রাগ—মালব।

তবে কহে রাই দূতীর গোচরে
কেন বা আইলে ইথে।
কিসের কারণে তোমার গমন
কহ কহ শুনি তাথে ॥
কহে সেই সখী শুন চন্দ্রমুখী
তোমারে আইল নিতে।
নিকুঞ্জে একলা বসিয়া নাগর
চাহিয়া তোমার পথে ॥
কেন বা তা সনে মান অভিমান
যারে না দেখিলে মর।
সে হেন পীরিতি, তেজিয়া আরতি
তাহারে গুমান কর ॥
সে নব নাগর, তেজিয়া বৈভব
তোমার ধেয়ান রাধা।
তুয়া গুণগান জপিতে জপিতে
সে শ্যাম হইল আধা ॥
তুমি বিদগধ তুমি বৈদগধি
গুণের নাহিক সীমা।

চতুর নাগরী, গুণের আগরী
মান পথে দেহ ক্ষেমা ॥
জগজনে কয় রাধা ধীরময়
সকল গোচর আছে।
সে বুঝে যে বুঝে কহি তার মাঝে
কহি এ তোঁহার কাছে ॥
তুমি শ্রেয় সমা তুমি কুলরামা
তুমি সে রসের নদী।
যার সব গুণ, নিগুড় মরম
পঞ্চ তত্ত্ব যার সিদ্ধি ॥
আট গুণ গুণ, তার পহু গুণ
এ নব যাহার গতি।
চণ্ডীদাস কহে রস তত্ত্ব লাগি
কুঞ্জেতে যাহার স্থিতি ॥ ৪৭ ॥

রাগ—গরা।

শুনহ সুন্দরী রাধা।
কে জন পরসে লাখ সুধানিধি
সেজনে কেনবা বাধা ॥
তোমারো লাগিয়া যেমন যোগিনী
ভজয়ে পরম পদ।
তেমত যে শ্যাম তোমাতে ধেয়ান
তারে কেন কর রদ ॥
রস রস পর, আর রস পর
পাঁচ রস আট মিট।
বেদ গুণ গুণ, গুণ রস পর
সায়র আসিয়া বিঠ ॥
যে জন রসের সমুদ্র থাকিতে
পিয়াসে মরয়ে কেনে।
তুমি চাঁদ হয়া চকোর পাখীর
রসটী না দেহ পানে ॥
তুমি সে প্রেমের গাগরী থাকিতে
আন জন মরে শোষে।
এ কোন চরিত আচার বিচার
সেই সে আছয়ে আশে ॥
চল চল রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী
নিকুঞ্জ মন্দিরে চল।
চণ্ডীদাস বলে তুরিতে ভেটহ
সে শ্যাম ভাবেতে চল ॥ ৪৮ ॥

রাগ শ্রী।

তুমি বড় নিদয় নিদান।
উহারি কেবল ধেয়ান ॥
সেজন ছাড়িয়া এখনে।
একলা বসিয়া কুঞ্জবনে ॥
শুনহ সুন্দরি ধনি রাই।
খেণে খেণে বিরহে লোটাই ॥
এত কিবা সহই পরাণ।
ঝাট করি দেখ গিয়া কান ॥
তাহারে করহ ধনি রোষ।
সকল সে জন দোষ ॥
তুমি সে নাগরী রামা।
চিতে দেহ ধনি ক্ষেমা ॥
চলহ নিকুঞ্জ মাঝ।
তেজহি আনহি কাজ ॥
চণ্ডীদাসে ভাল জান।
কহে দূতী কত অনুমান ॥ ৪৯ ॥

রাগ—সুহা।

কালার জ্বালাটি, বড় উপজল
বেশ কথা কিছু কয়া।
তাহে কেন রাধা, সেই সুখ বাধা
চলহ বিমুখ চায়া ॥
পরশ রতনে তেজহ সঘনে
রস কথা কিছু কয়।

দের দেখা দিয়া লহ না আসিয়া
এতন তাম্বূল লয় ॥
মুখ রস মধু কত শত বিধু
উলটা কহত বোল।
উত্তর না দেহ পরমাদ এহ
শ্যামে কর গিয়া কোল ॥
মুখ তুলি বল মানে আছে চল
এ কোন বিচারি পণা।
একে নাম ধরি, তরুর ছায়াতে
আছে হরি মন মনা ॥
আমি আহ্বানিতে কিবা তোর রীতে
কহ কহ চন্দ্রমুখি।
কিবা কহ শুনি শুন বিনোদিনি
কহত বচন লখি ॥
এত পরমাদ মান পরিহরি
সুন্দরী শ্যামের প্রিয়া।
চণ্ডীদাস দেখি বেথিত হইয়া
বিরস পাওল হিয়া ॥ ৫০ ॥

রাগ শ্রী।

কহে ধনি রাধা কেন তুমি হেথা
কি হেতু ইহার বল।
কেনবা আইলে, কিসের কারণে
কে তোমা পাঠায়া দিল ॥
তবে কহে দূতী শুনহ আরতি
মোরে পাঠাইল শ্যাম।
সে হেন নাগর আমি সে আইল
ভাঙ্গিতে দারুণ মান ॥
সে হেন নাগরে, পরিহর ধনি
আছহ মাধবীতলে।
শ্যামের বিধতা শুনি তার কথা
কহিতে পরাণ ঝুরে ॥
কহে ধনি রাধা শুন মোর কথা
জানিল তাহার চিত।
তা সনে কিসের, মান অভিমান
জানিল তাহার রীত ॥
পরের বেদনা পর কি জানয়ে
পর কি আনের বশ।
পরের পীরিতি, আন্ধারে বসতি
কিবা সে জানয়ে রস ॥
রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে
সুদৃঢ় চতুর জনা।
যত বড় তেঁহো রসের রসিক
সে সব গেলই জানা ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন হে সুন্দরী
তুরিতে গমন কর।
শ্যামের সন্দেশ হৃদয়ের মালা
যতন করিয়া পর ॥ ৫১ ॥

রাগ—কামদ।

দূতি না কহ শ্যামের কথা।
কালা নাম দুটী, আখর শুনিতে
হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা ॥
আমি না যাইব, সে শ্যাম দেখিতে
পরশ কিসের লাগি।
শ্রবণে শুনিতে শ্যাম পরসঙ্গ
অন্তরে উঠএ আগি ॥
কিসের কারণে, তা সনে মিলন
চলিয়া তুরিতে যাও।
তাহার মরম জাগিল এখন
রহিল মাধবী ছাও ॥
তাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া।
তভু না পাইল সে নব নাগর
কেমন রসের পিয়া ॥

কুল শীল ছিল, সকলি মজিল
নিদানে কলঙ্ক সারা।
সুখের লাগিয়া, পীরিতি করল
তাহার এমতি ধারা॥
সুখের আরতি, করিল পীরিতি
সুখ গেল অতি দূরে।
সুখের সাগরে, করহ পয়ান
মনোরথ পরিপূরে॥
পাড়ার পরসী, কবে লোক হাসি
শুনিএ এসব কথা।
অন্তর বেদন বুঝে কোন জন
কে জন বুঝিব হেথা॥
কানুর পীরিতি, দিল সমাধান
না কহ আমার কাছে।
কেবল বিষের, রাশির সমান
হেন কেবা আর আছে॥
তুমি যাহ সখি, কানুর সমাজে
আমি সে নাহিক যাব।
চণ্ডীদাস বলে বড় অভিমান
আমি শ্যামে যেয়ে কব॥ ৫২॥

রাগ—কানড়া।

বেরি বেরি দূতি, বচন সরস
কত সে আর শুনব।
যথা না শুনব, শ্যাম নাম সুধা
সেখানে চলিয়া যাব॥
তবে ত দারুণ, ব্যথা উপজল
তবে সে ভালই হব।
বেরি বেরি দূতি, বচন সরস
একথা না শুনি তব॥
শ্রবণে না শুনি কহে আন বাণী
কথা সে মনে না বাসি।
শুনগো সজনি যে জন গরল
খায় সে বিষের লাগি॥
জানিয়া শুনিয়া বিষ হাতে লয়া
খাইল করম ভাগি॥
যে খায়ে গরল, বিষে ঢল ঢল
তখনি মরিয়া যায়।
আমি সে ভুখিল, কাল কালবিষ
ঝাড়িলে রহে সে গায়॥
কারে কি বলিব, বলিতে না পারি
গুপথে গুমরি গেহা।
কালিয়া বরণ দেখিতে সুজন
করিতে রসের লেহা॥
ভাবিতে শুনিতে মরিএ ঝুরিয়ে
শুনগো স্বজনি সখি।
হেন মনে লয়, পরাণ সংশয়
নিদানে মরণ দেখি॥
যেন যে জলের বিম্বুক উপজে
তেমতি কানুর প্রীত।
এবে সে জানল সে জন লালস
চণ্ডীদাস কহে হিত॥ ৫৩॥

রাগ—কানড়া।

কালা হৈল ঘর, আন কৈল পর
কালা সে করিল সারা।
কালার ধেয়ান, আন নাহি মন
কালিয়া আঁখির তারা॥
পরাণ অধিক হিয়ার মানস
কালিয়া স্বপনে দেখি।
গমনে কালিয়া জপেতে কালিয়া
নয়নে কালিয়া দেখি॥
গগনে চাহিতে, সেখানে কালিয়া
ভোজনে কালিয়া কানু।

ভ্রূদ্বয় মুদিলে, সেখানে কালিয়া
কালিয়া হইল তনু ॥
শুন হে স্বজনি, কহিতে আগুনি
উঠয়ে কালার জ্বালা।
সেজন বিমুখ, বিরাগ বচনে
পরাণ হইল সারা ॥
তা সনে কিসের, আরতি পীরিতি
সুচারু রসের লেহা।
যাহার কারণে, সব তেয়াগিনু
পরিহরি নিজ গেহা ॥
কুজন সুজন, তার কিবা হয়
গরল অমিয়া নয়।
কুটিল না হয়, সরল না হয়
কাজেতে বুঝিলে হয় ॥
কহে চণ্ডীদাসে এই অভিলাষে
আশ পাশ তুয়া কাছে।
তুমি সে তাহার, সেজন তোমার
কোথা বা খুঁজিলে আছে ॥ ৫৪ ॥

রাগ—মালব।

দূতী কহে শুন আমার বচন
করিয়ে আদরপণা।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর
অতি সে সুজন জনা ॥
তোমার লাগিয়া, রজনী জাগিয়া
সে হরি কাতর হয়।
দিয়া দরশন, কর পরশন
আমার মনেতে লয় ॥
এখণে ছাড়িয়া যাহত চলিয়া
দুগুণ উঠয়ে দুখ।
তাহার সনেতে, কিবা পরিচয়
এ লেহা রসের সুখ ॥
জানিল তাহার, যত বড় তেঁহো
কালিয়া বিষের রাশি।
কুলের ধরম, সরম ভরম
সকল হইল হাসি ॥
সে দেশে যাইব, যথা না শুনিব
কালিয়া বরণ নাম।
সেই দেশে যাব, শুনহ সজনি
রহব সেই সে ঠাম ॥
অনেক যতন, করিল সঘন
রাধার না ঘুচে মান।
কাষ্ঠের পুতুলি রহে দাণ্ডাইয়া
মনেতে ভাবয়ে আন ॥
মান না ভাঙ্গিতে পারল স্বজনি
চলিল শ্যামের পাশে।
দূতী গেল যথা, নাগর শেখর
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণের নিকট দূতীর পুনরাগমন।

রাগ—সোয়ারি।

মাধবী তলাতে রহে এক ভিতে
সে হেন সুন্দরী রাই।
মানে মনরিত, এ তার চরিত
অনেক বুঝাল তাই ॥
তোমার কুসুম, হার মনোহর
দূরেতে ডারিয়া দিল।
এ তিন তাম্বূল কিছু না ছোয়ল
ক্রোধেতে কুপিত ভেল ॥
অনেক প্রবন্ধ, প্রকার করিয়া
বুঝাইল রাই পাশ।
হেট মাথে রহে, বচন না কহে
মুখেতে নাহিক ভাষ ॥

[redacted] সে রসে ভোরা ॥
[redacted] দেখি কিশোরী বিধুমুখী গৌরী
কহিতে লাগিল তায়।
তুমি সে কালার বরণ ধরিয়া
কেন বা ধরিলে কায় ॥
এথানেহ তুমি ফুলে ভ্রমি ভ্রমি
ভ্রমহ কিসের লাগি।
মোরে দিতে চাহ বিরহবেদনা
উঠাইতে দারুণ আগি ॥
তোমার চরিত্র আছে বেয়াপিত
সে শ্যাম অঙ্গের মালে।
মধু খেয়্যা খেয়্যা রসেতে পূরিয়া
আইলে মাধবী ডালে ॥
একে মরি জালা, আছি এ একলা
তাহে দেখা দিলে ভালে।
অতি সে বিষাদ বাঢ়য়ে দ্বিগুণ
চণ্ডীদাস কিছু বলে ॥৫৯॥

রাগ—তুড়ী।

শুন হে ভ্রমর কেন বা ঝঙ্কার
তোমার কালিয়া তনু।
তোমারে দেখিএ বাঢ়ল বিষাদ
বিয়োগ উঠল দুনু ॥
ঝাট চলি যাও কেন দুখ দাও
চমকে আমার হিয়া।
যাহ বৃন্দাবনে, নিকুঞ্জ ভবনে
যথায় রসের পিয়া ॥

[redacted] এ কথা
এ কথা শ্রবণে শু[redacted]
তখনি চলিয়া গেল[redacted]
কোথাও না দেখি মেলি দুটী আ[redacted]
তবে সে ধৈরজ ভেল ॥
নীল কাল যদি, ফেলিল ছিনিয়া
কিছু না রাখল ভালে।
অঙ্গের কাঁচলি ফেলি দূর করি
নীলের উড়নী দুরে ॥
কাল আভরণ, ফেলিয়া তখন
পরল ধবল বাস।
হিয়ার কাঁচলী পরল ধবল
কহেন এ চণ্ডীদাস ॥৬০॥

তথা রাগ।

নয়ন কাজল, মুছিয়া ডারল
কাল আভরণ যত।
সখী এক সঙ্গে, কহে কিছু রঙ্গে
কহিছে রাধার মত ॥
শুন সুধামুখি, আমার বচন
তেজহ দারুণ মান।
যে দেখি তোমার, অভিমান অতি
পাছেতে তেজহ মান ॥
ধৈরজ ধরহ, শুনহ সুন্দরি
এতেক কেন বা মান।

[illegible]বাধা ॥
[illegible]নি সুনাগর
[illegible]হইলা সুখী।
একথা উচিত, জানিল বেকত
চণ্ডীদাস আছে সাথী ॥ ৫৬ ॥

অথ সখ্য-দূতী।

মাধবী তলাতে দূতী পাঠাইয়া
বসিয়া চিবুকে হাত।
আকুল সঘনে, নিশ্বাস হুতাশ
কাঁহা না বোলই বাত ॥
এক নব রামা, আছে রাধা কাছে
তা সনে না কহে বোল।
মাধবী ডালেতে, এক পিক বসি
কহত পঞ্চম বোল ॥
চাহিয়া দেখিল, মাধবী উপরে
রসময়ী ধনি রাই।
কালার বরণ দেখি সুনাগর
হেরিয়া দেখিল তাই ॥
করতালি দিয়া, দিল উড়াইয়া
পিকেরে কহিছে কিছু।
কি কারণে বসি, ডাকহ সুস্বরে
তেই সে দিলাউ নিছু ॥
যাহ শ্যাম পাশ, নিকুঞ্জ-বিলাস
এখানে কিসের বাণী।
[illegible]
কহিতে বলিতে রা[illegible]

রাগ—জয়শ্রী।

ময়ূর ময়ূরী, নাচে ফিরি ফিরি
আসিয়া মাধবী তলে।
দেখিয়া কুপিত, হইল বেকত
তারে ধনি কিছু বলে ॥
হেথা কেন তোরা, নাচ হয়া ভোরা
দিতে সে সোচনা সারা।
ঝাট করি যাও, যেখানে রসিক
নাগর-শেখর তারা ॥
নিকুঞ্জ ভবনে, যাহ সেই খানে
এখানে নাচহ কেনে।
হেথা কিবা সুখ, সুখের বিচার
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥
তুমি না ধরিতে, শ্যামল বরণ
তবে সে হইত ভাল।
কালিয়া বরণ, দেখি মোর মন
অনল উঠিয়া গেল ॥
কালা আছে যথা তোরা যাহ তথা
এখানে কিসের কাজ।
কালিয়া বরণ, বরণ মিশাহ
যেখানে রসিক রাজ ॥
কোপে সুধামুখী, করতালি দিয়া
ময়ূর উড়ায়ে দিল।
চণ্ডীদাস বলে অপর মানেতে
সে ধনি হইল ঢল ॥ ৫৮ ॥

সরম ভরম দূরে তেয়াগিয়া
কোপিত কহত আন ॥
যদি আছ তুমি, বিরস বদনে
শুনহ সুন্দরী রাই।
কেন বা অঙ্গের, ভূষণ সকল
তেজিয়ে তেজিলে ভাই ॥
তুমি সুনাগরী, রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান।
সখীর বচনে, কমল নয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান ॥
শুন গো স্বজনি, কালিয়া বরণ
দেখিএ উঠএ তাপ।
চণ্ডীদাস কহে, হেন মনে হয়
মানসে দারুণ পাপ ॥ ৬১ ॥

শ্রীরাগ।

কহে যদুমণি, শুনহ স্বজনি
রাধা আনিবারে গেলে।
কি শুনি বচন, কহ কহ দেখি
সঘনে সঘনে বলে ॥
সখী কহে তায়, শুন শ্যামরায়
রাধার বড়ই রোষ।
তুমি গেলে যদি তার মান ঘুচে
আমার কি আছে দোষ ॥
সখীর বচনে, কমলনয়ন
আপনি সাজত যান।
বেশ সে সুবেশ, অতি মনোহর
ভাঙ্গিতে রাধার মান ॥
বাঁধল কুণ্ডল, লোটন সুন্দর
বেড়িয়া মালতী দাম।
তাহার পাশেতে, মুকুতার মালা
শোভে অতি অনুপাম ॥
নানা আভরণ, কঙ্কণ ভূষণ
নিবিড় কিঙ্কিণী জাল।
নীল বসনের, ওড়নী সুন্দর
করে বীণাযন্ত্র ভাল ॥
এক সখী সঙ্গে, চলে বেশ ধরি
কেবল একহি রামা।
চলত নাগর, বেশ মনোহর
সেই সে মাধুরী ধামা ॥
নারী বেশ ধরি, চতুর মুরারি
মাধবীতলাতে যায়।
কিবা অদভুত, দেখিয়া বেকত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥ ৬২ ॥

রাগ—তুরী।

মন্দ মন্দ গতি, চলন চাতুরী
কুঞ্জর গমনে চলি।
যেমন কুঞ্জর, চলন সুন্দর
এ দুই চলন ভালি ॥
মদনমোহন, নবঘন শ্যাম
কিবা এ আপন বেশ ॥
কান্ধে লই বীণা, নবঘন শ্যাম
পরিমলে ভুলে দেশ ॥
চলিতে চরণে, বাজএ সুতানে
বাজন নূপুর পায়।
ফুলের সৌরভে, অলিকুল যত
যূথে যূথে সব ধায় ॥
দূরে হতে রাই, দেখি নব রামা
বিস্মিত হইলা চিতে।
কোন নব রামা, কাঁধে যন্ত্র করি
আমারে আইল নিতে ॥
এই অনুমান, করে দুইজন
রাধা বলে হের দেখ।

রাধার বচনে, দেখে মুখ তুলি
চন্দ্রবদনী মুখ ॥
হেনই সময়, আসিয়ে মিলন
সেই সে মাধবীতলে।
নব পরিচয়, চণ্ডীদাস তথা
হাসিয়া হাসিয়া বলে ॥ ৬৩ ॥

রাগ—সুই।

দেখি নব রামা, তুমি কোন জনা
কহ কহ দেখি মোরে।
কেনে বা এখানে, তোমার গমন
কহ কহ বলে তারে ॥
সখী কহে তাথে, শুনহ সুন্দরী
গেছিল কাননকুঞ্জে।
যথা রসময়, ব্রজরামাগণ
আছয়ে কতেক পুঞ্জে ॥
মোরে বোলাইয়া, গেছিল লইয়া
আমি সে বটিয়ে যতি।
কিছু তাল মান, করিয়াছি গান
যে ছিল আপন শক্তি ॥
গৌরী নট আর, কেদার সুন্দর
পূরবী সিন্ধুড়া আঢ়া-কো।
শ্যামনট আর, মাধবী মঙ্গল
হিল্লোল মঙ্গলা দো ॥
পাহিড়া দীপক, আর বেলাবলি
সুরট মল্লার রাগ।
গাইতে প্রবন্ধে, প্রকার করুণে
তাহার মরমে লাগ ॥
এ রাগ শুনিতে, বিনোদ নাগর
মোহিত হইলা গীতে।
পুনঃ পুনঃ কহ, ইহার উপর
আর কিছু শুনি চিতে ॥
তবে কৈলা গান, যে ছিল সুতান
তাহাই করিলা গান।
রাধাকৃষ্ণ নাম, অতি অনুপাম
বীণাতে উঠিল তান ॥
এ তান শুনিয়া, নাগর রসিয়া
হরষ হইল বড়ি।
এই সে গানের মধুর শুনিয়া
আমারে না দিল ছাড়ি ॥
রহ রহ ধনি, আর গান শুনি
কহত প্রথম নাম।
শুনিতে মধুর, ও দুটী আখর
রাধানাম অনুপাম ॥
কানুর পীরিতি, যে দেখিল রীতি
এ কথা কহিব কত।
রাধা নামে কত, অমিয়া আওল
রস উপজিল যত।
গাও গাও ধনি, কহে গুণমণি
রাধানাম কর গান।
ঐ রস বই, আন না শুনিব
এ বড় মধুর তান ॥
আলাপে রাগিণী, রাগের উরলি
রাধা বলি যেন বাজ।
তোমার ও গানে, মোর মনে হানে
যেমতি হৃদয়ে বাজ ॥
চণ্ডীদাসে বলে, এই গীতে মোহ
রসে ভেল অতি ভোর।
মুগধ মাধব, বহু বিদগধ
সুখের নাহিক ওর ॥ ৬৪ ॥

রাগ—সুই।

শুন ধনি রাই, তান কিছু গাই
রাগেতে রাগিণী মেলা।

গাইতে গাইতে, মুগধ হইলা
নন্দের নন্দন কালা ॥
পুনঃ কহে শ্যাম, অতি অনুপাম
শুনিতে মধুর ধ্বনি।
রাধা রাধা বলি, ডাকিছে বাঁশীটী
মুগধ হইল শুনি ॥
এই রস তান, অনেক সন্ধান
শুনিল রসিক শ্যাম।
অতি বড় সুখী সুখেতে মোহিত
গাইতে রাধার নাম ॥
ভাবে গদগদ, অতি সে আমোদ
সে হেন রসিক কান।
রাধা নাম বিনে, আন নাহি জানে
শ্রবণে শুনল গান ॥
নয়ন কমল, যেন ঢল ঢল
লোরেতে কমল আঁখি।
যেমন ঘমের, বরিখে শ্রাবণে
তেমতি ধরণ দেখি ॥
রাধা রাধা রাধা, আন সব বাধা
কেবল রাধার ধ্যান।
রাধা নাম গানে, কমল নয়নে
কিছুই নাহিক আন ॥
এই সব রস, শুনিয়া অবশ
রসিক নাগর কান।
সে নব নাগর, রসের সাগর
শ্রবণে শুনয়ে গান ॥
যখন বাজায়ু রাই নাম সুধা
কান্দিয়া আকুল শ্যাম।
হইয়া মুগধ, অতি সে আমোদ
দিল মুকুতার দাম ॥
দেখ দেখ ধনি, আমার উরতে
এই মুকুতার মালা।
সে নব নাগর, গুণের সাগর
রাধানামে বড় ভোলা ॥
এই সব রসে, তার মন তোষে
বীণাতে করিল গান।
বিকল কিসে বা, না জানি কেন বা
কিসের কারণে ধ্যান ॥
কুঞ্জে একাকিনী, করেতে বাঁশীটী
ধরিয়া নাগর রায়।
তোমারে কিছুই, তান শোনাইতে
আইল মাধবী ছায় ॥
চণ্ডীদাস দেখি, অতি অপরূপ
অপার দোঁহার লীলা।
কে ইহা জানিবে, নিগূঢ় মরম
দোঁহে দুঁহু রসমেলা ॥৬৫॥

রাগ—কেদারা।

শুন শুন রাধা, কহে সেই ধনি
শুনহ রসের গান।
তোমারে এ গান, শ্রবণ করাতে
আইল মাধবী স্থান ॥
মুখ তুলি চাহ, রসের প্রেয়সী
গাই এ একটী রাগ।
শ্রবণ পরসি এ গান শুনিতে
কতি যাব অনুরাগ ॥
এ কথা শুনিয়া, কহে সুধামুখী,
শুনহ সুন্দরী রামা।
কর কিছু গান, শুনি কিছু তান
নবীন নাগরী শ্যামা ॥
বীণাতে কেদার, রাগ আলাপন
গাওই মুগধ রসে।
রাধাকৃষ্ণ নাম, উঠে অনুপাম
শুনিতে শ্রবণ পাশে ॥

এ চারি আখর, বাজন মধুর
বীণাতে কহত রাই।
কেন বা মানিনী, হয়াছ সে শ্যামে
মধুর মধুর গাই॥
সে হেন নাগরে, পরিহরি রাধে
কি সুখে আছএ বসি।
মলিন হইল, সে মুখমণ্ডল
ঝলকে সে মুখশশী॥
মানে মন দুনু, দেখি ক্ষীণ তনু
যেতি আভরণ ভার।
বচন কহিছ, তাথে নাহি রস
এত বা কিসের তার॥
সে হেন নাগরে, বিরস বদনে
আছএ মাধবীতলে।
বীণা গীত তালে, বুঝায়ে সঘনে
দীন চণ্ডীদাস বলে॥ ৬৬॥

রাগ তথা।

মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া,
নন্দের নন্দন কান।
সেখানে এ গুণ কিছু সে গাইল,
কিছুই রসের তান॥
সেখানে হইতে আইল হেথায়
দেখিয়া দুঃখিত কান।
সে হেন নাগরে ভেটহ সুন্দরী,
তেজিয়া বিষম মান॥
চণ্ডীদাস কহে ওতি বড় মোহে,
সুন্দরী কিশোরী রাই।
ইহার কোপের বিপাক বিষম,
ভাঙ্গিতে নারিল সেই॥ ৬৭॥

রাগ—কাফি।

শুণী না কহ কানুর কথা।
শুনিতে মরমে, সেইখানে হানে,
উঠত দারুণ ব্যথা॥
মনের আগুণ বাঢ়ল দ্বিগুণ,
নিভাইতে যদি সাধ।
যে জানে বেদনা মরমে পশিল,
তনুখানি হল আধ॥
এ বড়ি বিষম বাঁশিটী বেঁধল,
বুকে বাজী মিঠে নার।
টানিলে যতনে বাহির না হয়,
এ দুখে জীব কি আর॥
দারুণ শেল যে নহে নিবারণ,
আর সে বিরহ আসি।
এ দুই যাহার অন্তরে পেশল,
কি ছার দিবার লাগি॥
কাননে অনল কেহনা নিভায়,
আপনি নিভায় সেই।
হৃদয় অনল কেবা নিভাইব,
বিষম আগুণ এই॥
কাহারে কহিব এ সব বিচার,
মরম জানএ কে।
চণ্ডীদাস কহে যে জানে মরম,
সে জন বেথিত দে॥ ৬৯॥

রাগ শ্রী।

শুন নব রামা ওই পরসঙ্গ,
না কহ আমার কাছে।
আন কথা কহ এ যন্ত্র বাজাহ,
ও বোল কি বোল আছে॥
যে জন কুজন সে নহে সরল,
গাও গাও কিছু শুনি।
এ কথা শুনিয়া হাঁসিয়া হাঁসিয়া,
বীণা কাঁধে নিল গুণী॥

গাইতে লাগিল হিল্লোল নায়ক,
রাগিণী ভুপ্পায় তায়।
মধুর মধুর তান মান রাগ,
সে স্বর মধুর প্রায়॥
প্রথম রাগেতে রাগিণী ডুবায়ে,
গাওল প্রিয়ার নাম।
দুটীয় আখরে রাধা নাম ওটে,
শুনিতে মধুর তান॥
এই দুটী নাম বাজে অনুপাম,
মুগধ হইলা রাধা।
* * * সুধা॥
শুন শ্যামা সখি * *
বচন শুনহ * *
* * *
কে জানে এমন তোমার ধরণ,
কপট আগুণ ইথে।
ধ মান কপট অন্তরে,
ঙ্গল কপট চিতে॥
কিবা আছে মান অভিমান,
হ নিকুঞ্জ বনে।
বশের পরিপাটী যত,
সখীর সনে॥

শ্যাম সুনাগর চতুর শেখর,
চলিল নিকুঞ্জ ধামে।
হেথা সুধামুখি বেশ পরিপাটি,
কত সে মনের সনে॥
চলল কিশোরী, শ্যাম দরশনে,
বদনে মধুর হাসি।
সঙ্গে সহচরী মন্থর গমন,
চাতুরী বদনশশী॥
যেমন চিত্রের পুতলি চলিছে,
ও চাঁদবদনী রাধা।
নীল লোচনী আধেক ওড়ণী,
বচন কহত আধা॥
শ্রীঅঙ্গ চলিতে গদ গদ ভেল,
বচন চপল আধা।
চলিতে মধুর বাজএ পঞ্চম
মধুর মধুর নাদা॥
সুগন্ধ মলয় চন্দন কস্তুরী,
অগুরু সৌরভ প্রায়।
মত্ত অলিগণ কুসুম কোকিল,
এ সব সঘনে ধায়॥*

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

---

* ...ছে, তাহার অধিকাংশ চরণই খণ্ডিত বলিয়া উদ্ধৃত হইল না। মূল ...করা গেল। কোনরূপ সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। ...কাশিত পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। সুবিধামত প্রকাশ

উপসর্গের অর্থ বিচার।

কিয়ৎমাস পূর্ব্বে আমি "উপসর্গের অর্থ-বিচার" নামক একটী প্রবন্ধ এইখানে পাঠ করি। প্রবন্ধটী দীর্ঘ হওয়াতে সে দিবস আমি তাহার সমস্ত অংশের পাঠ সমাপন করিতে না পারিয়া অবশিষ্ট অংশ বারান্তরে আপনাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে, অতি সত্বরে আমি আমার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব; কিন্তু কিয়ৎপরেই আমার হস্তে বিশেষ একটী প্রয়োজনীয় কার্য্যের ভার আসিয়া পড়াতে আমি তাহাতেই ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম—আর কোন কার্য্যে যে হস্তার্পণ করিব তাহার তিলমাত্রও অবকাশ রহিল না। দুই মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে সেই অভীষ্ট কার্য্যটী নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়া যাওয়াতে আমি আজ দ্বিগুণ আহ্লাদের সহিত সেদিনকার সেই পঠিত প্রবন্ধের শেষাংশ লইয়া আপনাদের সমক্ষে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইতেছি।

প্র নি সং বি অপ পরি এই ছয়টী উপসর্গের অর্থ আমি যেরূপ অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছি গতবারে তাহা সাধ্যানুসারে বিবৃত করিয়া বলিয়াছি। বিগত সংখ্যার পূর্ব্ব-সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে আপনারা তাহা দেখিতে পারেন। শুদ্ধিপত্রে ছাপার ভুল সবই সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে কেবল এক স্থানের একটী ভুল অসংশোধিত রহিয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম

"শিষ্য=যাহাকে শেষ করিয়া তুলিতে হইবে; অর্থাৎ বিদ্যার সঞ্চার
গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

কিন্তু ছাপায় দেখিলাম যে, শিষ্যের পরিবর্ত্তে শিষ্টের ঐরূপ অর্থ করা স্থানটীতে দুইটি কথা আমার বক্তব্য ছিল; একটি কথা এই যে,

শিষ্য=যাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আর একটি কথা এই যে,

শিষ্ট=যাহাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ছাপার ব্যতিক্রম বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে ঐ স্থানটিতে পাঠকের একটু ধাঁদা ছয়টি উপসর্গ সম্বন্ধে আমি আর আর যাহা বলিয়াছিলাম হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট উপসর্গগুলির কাহার ভিতর যণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। অনেক সময়ে কেঁচো ক্রমে

ইহাদের মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই—সবই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এই সঙ্গে 'অপি' উপসর্গকে আর এক কারণে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইতে পারে; সে কারণ এই যে, অপি উপসর্গের প্রয়োগ কেবল একটি মাত্র স্থানে দৃষ্ট হয়; পিধান-শব্দে; তদ্ভিন্ন আর কোনো স্থানেই তাহার দর্শন মিলে না। পিধান-শব্দে অপি'র অ খসিয়া গিয়া তাহার পি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। খোট্টাই ভাষায় বস্ত্র-পরিধান=কাপ্‌ড়া পিন্না। পিন্না শব্দ ঠিক পিধান শব্দের না হউক্ তাহারই সহোদর পিন্ধন শব্দের অপভ্রংশ। অপি=Epi তাহাতে আর ভুল নাই, কেননা দুইই বহিরাবরণ-জ্ঞাপক; তার সাক্ষী

Epidermis=শরীরের বহিশ্চর্ম্ম; পিধান=অপিধান=গাত্রাবরণ।

গতবারে ছয়টি উপসর্গের একপ্রকার বিচার নিষ্পত্তি হইয়া চুকিয়াছে; এক্ষণে, আর ছয়টি উপসর্গ অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট রহিল পরা অব নিঃ অধি প্রতি অভি উপ আ এই আটটি উপসর্গ।

প্রথমে, ঐ আটটি উপসর্গের মধ্যে যে তিনটি অক্ শব্দের শিরোভাগে বসিতে আসন পায়, সেই তিনটির প্রতি মনোনিবেশ করা যা'ক। সে তিনটি হ'চ্চে—অব প্রতি এবং পরা; তার সাক্ষী

অব+অক্=অবাক্
প্রতি+অক্=প্রত্যক্
পরা+অক্=পরাক্।

[redacted]য়াছে অঞ্চ ধাতু হইতে। অঞ্চ ধাতুর আর আর অর্থের মধ্যে একটি প্রধান

অব+অক্=নিম্ন দিকে যাহার গতি অথবা নিম্নদিকে যাহার ঝোঁক।

অবাঙ্মুখ=অবাক্+মুখ=হেঁট মুখ।

[redacted]ইলাম" এ অবাক্ স্বতন্ত্র, আর, অবাঙ্মুখ-শব্দের অবাক্ স্বতন্ত্র।

পূর্ব্বোক্ত অবাক্=অ+বাক্=বাক্যরহিত;
শেষোক্ত অবাক্=অব+অক্=নিম্নে অবনত।

অব=Sub।

অব উপসর্গের লক্ষ্য নিচের দিকে। প্রথমতঃ নিচু দুই প্রকার—(১) দেশে নিচু এবং (২) ভাবে নিচু। দ্বিতীয়তঃ ভাবে নিচু তিন প্রকার—(১) লৌকিক ভাবে-নিচু, (২) দার্শনিক ভাবে-নিচু, এবং (৩) জ্যামিতিক ভাবে-নিচু। সবশুদ্ধ ধরিয়া চারিপ্রকার নিচু পাওয়া যাইতেছে—(১) দেশে নিচু, (২) লৌকিক ভাবে-নিচু, (৩) দার্শনিক ভাবে-নিচু, (৪) জ্যামিতিক ভাবে-নিচু। অব উপসর্গের এই চারিপ্রকার নিচু অর্থেরই উদাহরণ যথেষ্ট রহিয়াছে; তাহার গোটা কত নমুনা দেখাইতেছি প্রণিধান করা হোক্ঃ—

দেশে নিচু ... ... { অবরোহন, অবতরণ, অবলুণ্ঠন

লৌকিক ভাবে-নিচু··· { অবজ্ঞা, অবহেলা, অবমাননা

দার্শনিক ভাবে-নিচু··· { অবান্তর, অবধারণ, অবগতি

জ্যামিতিক ভাবে-নিচু··· { অবশেষ, অবচ্ছেদ, অবকাশ

অবতরণ, অবরোহন, অবলুণ্ঠন, এই তিন শব্দের আদিস্থিত অব-উপসর্গের দেশে-নিচু অর্থ, আর, অবজ্ঞা অবহেলা এবং অবমাননা এই তিন শব্দের আদিস্থিত অব-উপসর্গের লৌকিক ভাবে-নিচু অর্থ ঐ ঐ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রণিধান করা হো'ক্ ঃ—

অবরোহন = নিচে নাবা।

অবতরন = নিচে উত্তীর্ণ হওয়া।

অবলুণ্ঠন = নিচে গড়াগড়ি দেওয়া।

অবজ্ঞা = হেয় জ্ঞান করা = নিচু করিয়া দেখা।

অবহেলা = নিচে হেলন করা = নিচে ঠেলিয়া ফেলিবার মতন ভাব-ভঙ্গী [redacted]

অবমাননা = নিচু করিয়া মানা = তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।

অবধান শব্দের মৌলিক অর্থ—নিচের দিকে প্রণিধান ; কিন্তু কালক্রমে "[redacted] এই সূক্ষ্ম অংশটি ব্যাঙাচির ল্যাজের ন্যায় খসিয়া গিয়া উহার স্থূলাংশটি মাত্র অবশিষ্ট শুধু প্রণিধান এই অর্থটি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অবলোকন-শব্দের আদি[redacted] সর্গেরও ঐরূপ দশা। উভয়স্থলেই অব-উপসর্গের নিম্নশীলতা অর্থ সাপের [redacted] লুপ্তাবশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। তোমার আমার চক্ষে সাপের পা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা—চর্ম্ম-চক্ষে এক আনা এবং জ্ঞান-চক্ষে পোনেরো আনা সবশুদ্ধ ধরিয়া ষোলোআনা—সাপের পা তাহার পাঁজরের ভিতরে লুক্কায়িত দেখেন। অবধান এবং অবলোকন শব্দের আদিস্থিত অব-উপসর্গের নিম্নশীলতা-অর্থ সাপের পায়ের মতো লুপ্তাবশিষ্ট আকার ধারণ করিলেও ঐ দুই শব্দের গোটা দুই মুখ্য প্রয়োগ-স্থলে উহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকটে স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রণিধান করা হউক ঃ—

সাবধান = স + অবধান।

এ শব্দটি প্রধানতঃ পথের কাঁটা খোঁচা এবং জঞ্জাল উপলক্ষেই ব্যবহৃত হয়। "দেখো যেন কাদায় পা পড়ে না—দেখো যেন পা'য়ে কাঁকর বেঁধে না—দেখো যেন ভিজে মাটিতে পা

পিছলোয় না—সাবধান!" এ সকল স্থলে সাবধান শব্দের অর্থ পষ্টই নিচের দিকে মনোযোগী হওয়া। তা ছাড়া, চাসা রাইয়ত "অবধান" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া জমিদারের দৃষ্টি নিচের দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকে, আকর্ষণ করে। কৃপাবলোকন=কৃপাপাত্রের প্রতি অবলোকন =নিচু ব্যক্তির প্রতি উচ্চ ব্যক্তির অবলোকন। নিম্নগামী স্নেহ-দৃষ্টি উপলক্ষেই আমরা বেশীর ভাগ মুখাবলোকন শব্দ ব্যবহার করি; যেমন পুত্রের মুখাবলোকন, বধূর মুখাবলোকন ইত্যাদি। তবে কিনা স্নেহ-দৃষ্টি বা রসপূর্ণ দৃষ্টি মাত্রই নিম্নগামী—বাস্তবিক নিম্নগামী যদি নাও হয় তথাপি ভাবে নিম্নগামী তাহাতে আর ভুল নাই। এইজন্য উচ্চ স্থানীয় বস্তুর প্রতি যখন আমরা সস্নেহ অথবা রসপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করি, তখন সেই রসাত্মক ঊর্দ্ধগামী দৃষ্টিকেও এক হিসাবে অবলোকন বলা যাইতে পারে।

এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, অব-উপসর্গের দেশে-নিচু এবং লৌকিক ভাবে-নিচু এই দুই প্রকার অর্থ তাহার মধ্য হইতে খুব সহজে বাহির হয়; কিন্তু তাহার দার্শনিক এবং জ্যামিতিক ভাবে-নিচু অর্থ উন্মোচন করা অতটা সুখসাধ্য নহে—উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া তাহা টানিয়া বাহির করিতে হয়।

ইংরাজি ন্যায় দর্শনের ভাষায় "To class under" কাহাকে বলে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। যাহা classed under তাহাকেই আমরা বলি—নিম্নশ্রেণী। অবান্তর শ্রেণীর অর্থ তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানে অব-উপর্গের অর্থ—বিশেষ একপ্রকার সম্বন্ধে নিচু; কি সম্বন্ধে? না ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধে। ব্রাহ্মণজাতি একটী ব্যাপক শ্রেণী; আর, রাঢ়ীশ্রেণী, বারেন্দ্র-শ্রেণী, বৈদিক শ্রেণী এগুলি হ'চ্চে তার অবান্তর শ্রেণী অর্থাৎ নিম্নস্থ শ্রেণী। রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী ব্যাপক ব্রাহ্মণ-জাতির নিম্নস্থ শ্রেণী বলিয়া অবান্তর শ্রেণী, আর ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি শ্রেণী ব্রাহ্মণজাতির পার্শ্বস্থ শ্রেণী বলিয়া জাত্যন্তর শ্রেণী। এস্থলে

জাত্যন্তর=পার্শ্বস্থ শ্রেণী;

অবান্তর=নিম্নস্থ শ্রেণী;

এই দুয়ের প্রভেদ সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

অবধারণ কাহাকে বলে?

অবধারণ করা=জিজ্ঞাস্য বিষয় কোন্ নৈয়ায়িক শ্রেণীর নিম্নে অবস্থিতি করে তাহা স্থির করা। তার সাক্ষী—সম্মুখস্থিত জীবকে গোরু বলিয়া অবধারণ করা আর তাহাকে গোরু-শ্রেণীর বা গোজাতির নিম্নে নিক্ষেপ করা একই কথা। অবগত হওয়া কাহাকে বলে? সংস্কৃত ভাষায় অনেক স্থলে গত শব্দের অর্থ প্রাপ্ত; যেমন

নিদ্রাগত=নিদ্রাপ্রাপ্ত;

শরণংগত=শরণ-প্রাপ্ত;

অবগত হওয়া=অব+গত হওয়া=নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া।

কাহার নিম্নে কাহাকে প্রাপ্ত হওয়া? জিজ্ঞাস্য বিষয়কে কোনো একটী নৈয়ায়িক শ্রেণীর

নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া; তার সাক্ষী—"চীন জাতিকে নির্বীর্য্য বলিয়া অবগত হইলাম" এই কথাটি নৈয়ায়িক ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে বলা উচিত যে, "চীনজাতিকে নির্বীর্য্য-শ্রেণীর নিম্নে প্রাপ্ত হইলাম।" ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ একপ্রকার দার্শনিক আধার-আধেয় সম্বন্ধ বা আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ। এই কারণ গতিকে পাশ্চাত্য ন্যায়-দর্শনের অবয়ব-ব্যূহে হেতু-স্থানীয় এবং উদাহরণ-স্থানীয় ব্যাপক-তত্ত্বের নাম দেওয়া হইয়াছে Premise। এ দেশীয় ন্যায়-দর্শনের অবয়ব-ব্যূহের অভ্যন্তরে যদিচ Premiseএর তুল্যার্থবোধক কোনো-একটা পৃথক্ অবয়বের উল্লেখ নাই, কিন্তু দেশীয় ন্যায়-দর্শনের মূল গ্রন্থে যে-স্থানটিতে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেই স্থানটিতে Hypothesisএর নাম দেওয়া হইয়াছে অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত, আর, Premiseএর নাম দেওয়া হইয়াছে অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। Premise এবং Hypothesisএর এই দুই খাঁটি স্বদেশীয় তান্ত্রিক সংজ্ঞা (Technical term) আধুনিক বঙ্গীয় লেখকদিগের হয় তো বা কোন না কোন সময়ে কাজে লাগিয়া যাইতে পারে; অতএব প্রণিধান করা হোক,—

গৌতম-সূত্রের ভাষ্যকার বলিতেছেন "অনবধারিতার্থ পরিগ্রহঃ" যে বিষয় এখনো অবধারিত হয় নাই তাহা গ্রহণ করা;—কি অভিপ্রায়ে? না "বিশেষ পরীক্ষণায়" বিশেষের পরীক্ষা অভিপ্রায়ে অর্থাৎ Verificationএর অভিপ্রায়ে:—

"অনবধারিতার্থ পরিগ্রহঃ তদ্‌বিশেষ পরীক্ষণায় অভ্যুপগম সিদ্ধান্তঃ" বিশেষের পরীক্ষা অভিপ্রায়ে (Verificationএর অভিপ্রায়ে) অনবধারিত বিষয় গ্রহণ করা'র নাম অভ্যুপগত সিদ্ধান্ত। আপেল্-পাত দেখিয়া নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তখন সেটা তাঁহার অনবধারিত বিষয় ছিল—অনবধারিত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন; কি অভিপ্রায়ে গ্রহণ করিলেন? না তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণের পরীক্ষ অভিপ্রায়ে; অর্থাৎ সে সিদ্ধান্তটীকে বিশেষ বিশেষ দৃষ্ট ঘটনার সহিত মিলাইয়া দেখিয়া তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে। তবেই হইতেছে যে, অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত = Hypothesis। কিন্তু অভ্যুপগম শব্দটা বেজায় খট্‌মোটে—তাহা বাঙ্গালায় চালানো দুষ্কর; যদিচ তাহার অর্থ খুব সোজা। অভ্যুপগত কি? না যাহা সম্মুখে উপগত বা উপস্থিত। আপেল্-পাত দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্ত নিউটনের মনোনেত্রে উপস্থিত হইল—অভ্যুপগত হইল, তাই তাহার নাম অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত; সে সিদ্ধান্তটি তখন মনোনেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল মাত্র—তাহা কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা ভবিষ্যতের কার্য্য;—তখনকার কার্য্য তাহা নহে—তখনকার কার্য্য সেই অভ্যাগত অতিথিকে hypothesis বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাকে পরীক্ষিতব্যের কোটায় স্থান দান করা। এখানে অভ্যাগত এবং অভ্যুপগত এই দুই শব্দের অর্থ-সাদৃশ্য সবিশেষ দ্রষ্টব্য। অতএব, অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত যে, hypothesis ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তবে কি? না যাহা বলিলাম—শব্দটা বেজায় খট্‌মোটে! কিন্তু আর একদিকে তেমনি

এটাও দেখা উচিত যে, খট্‌মোটে ভাষা দর্শন-শাস্ত্রের অঙ্গের ভূষণ। যদি খট্‌মোটে ভাষাকে দর্শন-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিয়ম করা যায়, তাহা হইলে জগদ্‌বিখ্যাত জর্ম্মাণ-দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রের সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহার এরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হয় যে, তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন হইয়া উঠে। অত কথায় প্রয়োজন নাই—মহর্ষি গৌতম যখন hypothesisকে অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত নামে সংজ্ঞিত করিয়াছেন তখন তাহা উল্টানো তোমার-আমার সাধ্য নহে। এই গেল অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। অধিকরণ-সিদ্ধান্ত কি? মহর্ষি গৌতম স্বয়ং বলিতেছেন "যৎসিদ্ধৌ অন্য প্রকরণ সিদ্ধিঃ সোঽধিকরণ সিদ্ধান্তঃ।" যাহা সিদ্ধ হইলে অন্য প্রকরণ সিদ্ধ হয় তাহারই নাম অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার বলিতেছেন "যস্যার্থস্য সিদ্ধৌ অন্যে অর্থা অনুষজ্যন্তে" যে বিষয় সিদ্ধ হইলে অন্যান্য বিষয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধ হয়, "ন তৈর্বিনা সোঽর্থঃ সিদ্ধ্যতি" সেই সকল অন্বাশ্রিত বিষয় ব্যতিরেকে যাহা আপনাআপনি সিদ্ধ হয় না, আর, "তেঽর্থা যদধিষ্ঠানা" সেই সকল অন্বাশ্রিত বিষয় যাহাতে ভর করিয়া অবস্থিতি করে "সোঽধিকরণ সিদ্ধান্তঃ" তাহারই নাম অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ইহার নব্য টীকা এইরূপ ঃ—"মনুষ্য জ্ঞানবান্ জীব" এই বিষয়টি সিদ্ধ হইলে "দেবদত্ত জ্ঞানবান্ জীব" এ বিষয়টি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধ হয়; আবার দেব-দত্ত, ধনঞ্জয় এবং আর আর ব্যক্তি (individual) যদি জ্ঞানবান্ জীব না হয়, তবে "মনুষ্য জ্ঞানবান্ জীব" এ কথাটা কাঁচিয়া যায়; কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানবান্ জীব এ কথাটা যদি পাকাপোক্ত রকমে সিদ্ধ হয়, তবে "দেবদত্ত জ্ঞানবান্ জীব" এ কথাটা তাহারই লেজুড় ধরিয়া পার পাইয়া যায়। এরূপ স্থলে "মনুষ্য জ্ঞানবান্ জীব" এই সিদ্ধান্তটি অধিকরণ শব্দের বাচ্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রে যাহার নাম Premise, দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে তাহারই নাম অধিকরণ। Premise এবং অধিকরণ উভয়েরই অর্থ আশ্রয়-স্থান। ফলে, ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধকে একপ্রকার আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধরূপে কল্পনা করিবার প্রথা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়-দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রেই আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধ যদিচ ঠিক্ গণিত শাস্ত্রানুযায়ী উচ্চ নীচ সম্বন্ধ নহে, তথাপি তাহা ভাবে একপ্রকার উচ্চ নীচ সম্বন্ধ; তার সাক্ষী—

আশ্রিত কর্ম্মচারি = under officer = নিচের কর্ম্মচারী।

দার্শনিক হিসাবে যেমন ব্যাপ্য-শ্রেণী ব্যাপক-শ্রেণীর আশ্রিত, জ্যামিতিক হিসাবে তেমনি অংশ অংশীর আশ্রিত। এইজন্য, এক হিসাবে যেমন ব্যাপ্য-শ্রেণীকে অবান্তর-শ্রেণী (কিনা নিম্নস্থ শ্রেণী) বলা হইয়া থাকে, তেমনি ঠিক্ সেই হিসাবে না হউক্ তাহারই অনুরূপ আর এক হিসাবে বিচ্ছিন্ন অংশকে অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ নিচের শেষাংশ বলা হইয়া থাকে। অবশেষ, অবচ্ছেদ, এবং অবকাশ, এই তিন শব্দে অব-উপসর্গের জ্যামিতিক ভাবে-নিচু-অর্থ অতীব স্পষ্টাকার ধারণ করিয়াছে; তার সাক্ষী—

অবশেষ = নিচের শেষভাগ = প্রথম অংশ বা প্রধান অংশ অপনীত হইলে দ্বিতীয় অংশ বা

লেজুড় অংশ যাহা পড়িয়া থাকে।

অবচ্ছেদ=নিয়ন্থ বিষয়ের ছেদ=মূল বস্তু হইতে খণ্ডাংশের ছেদ।

অবকাশ=আশ্রিত শূন্য এই অর্থে নিচের শূন্য=অংশ-স্থানীয় শূন্য। যেমন, মৌচার্কে মধ্য হইতে মৌমাচিরা উড়িয়া পালাইলে পরিত্যক্ত শূন্য ঘর-গুলি মৌচাকের মধ্যস্থিত অবকাশ;—ইংরাজিতে যাহাকে বলে vacuum। vacationকেও ভাবে গতিকে অবকাশ বলা যাইতে পারে—বলা হইয়াও থাকে।

আমরা যখন কথায় বলি "আমার অবকাশ নাই" তখন সেটা অবকাশ-শব্দের একটা আলঙ্কারিক প্রয়োগ মাত্র। যদিচ, বস্তুরই ফাঁক সম্ভবে, কার্য্যের ফাঁক সম্ভবে না; তথাপি আমরা কার্য্য-প্রবাহের মধ্যস্থিত শূন্য কালাংশকে ফাঁকরূপে কল্পনা করিয়া সেই কালাশ্রিত ফাঁককে অবকাশ-নামে সংজ্ঞিত করিয়া থাকি। এই সকল স্থলে অব-উপসর্গের অর্থ জ্যামিতিক ভাবে-নিচু অর্থাৎ 'আশ্রিত-খণ্ডাংশ' এই ভাবে নিচু। অবকাশ এবং অবসর এ দুই শব্দের অর্থ প্রায় একই রূপ। সর কিনা নড়িবার চড়িবার পরিসর; তাহারই নাম ফাঁকা স্থান। সর=ফাঁকা স্থান, আর, কাশ=শূন্য আকাশ, দুয়ের মধ্যে কেবল নামেরই প্রভেদ। এতক্ষণ ধরিয়া অব-উপসর্গ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম সমস্ত কুড়াইয়া আমরা এইরূপ পাইতেছি ঃ—

(১) অবতরণ, অবরোহণ, অবলুণ্ঠন এ শব্দগুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ পষ্টাপষ্টি দেশে-নিচু।

(২) অবজ্ঞা, অবহেলা, অবমাননা, এ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ লৌকিক ভাবে-নিচু।

(৩) অবান্তর, অবধারণ, অবগতি, এ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ দার্শনিক ভাবে-নিচু।

(৪) অবশেষ, অবচ্ছেদ, অবকাশ, এ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ জ্যামিতিক ভাবে-নিচু।

তাহার পরে আসিতেছে প্রতি-উপসর্গ। প্রতি-উপসর্গের মুখ্য অর্থ দিক্ বৈপরীত্য। মনে কর তুমি আমাকে একখানি পত্র পাঠ করিতে দিলে, আমি তাহা পাঠ করিয়া তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। এরূপ স্থলে পত্রখানি গ্রহণ করিবার সময় আমি যদি তাহা পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে আনয়ন করি, তবে তাহা প্রত্যর্পণ করিবার সময় পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে চালনা করি। এই প্রকার দিক্ বৈপরীত্যই প্রতি-উপসর্গের মৌলিক অর্থ; তা বই উহার আর আর যত প্রকার অর্থ আছে সমস্তই ঐ মৌলিক অর্থ হইতে উৎপত্তি-লাভের স্পষ্ট নিদর্শন স্ব স্ব ললাটে ধারণ করে। "অমুক ব্যক্তির প্রতি অমুক ব্যক্তি সদ্ব্যবহার করিল বা অসদ্ব্যবহার করিল, সন্তুষ্ট হইল বা বিরক্ত হইল" এরূপ বলিলে প্রতি-উপসর্গের মন্ত্রগুণে হঠাৎ মনে হয় যেন সে দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি

পশ্চিমমুখা এবং আর এক ব্যক্তি পূর্ব্বমুখা অথবা এক ব্যক্তি উত্তরমুখা এবং আর এক ব্যক্তি দক্ষিণমুখা হইয়া দণ্ডায়মান থাকা কালীন উভয়ের মধ্যে ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল। এরূপ যে মনে হয় তাহার অবশ্য কারণ আছে; সে কারণ এই ঃ—

(১) মনশ্চক্ষে বা চর্ম্মচক্ষে পরস্পরের সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে দুইজনের মধ্যে কোনো প্রকার ব্যবহার চলিতে পারে না।

(২) মানসিক প্রতিমুখিতা ব্যতিরেকে মানসিক সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে না; বাস্তবিক প্রতিমুখিতা ব্যতিরেকে বাস্তবিক সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে না।

(৩) লক্ষ্য সমর্পণের দিক্‌বৈপরীত্য ব্যতিরেকে প্রতিমুখিতা সম্ভবে না।

(৪) দিক্‌বৈপরীত্যের প্রজ্ঞাপনই প্রতি-উপসর্গের একমাত্র কার্য্য।

দিক্‌বৈপরীত্য দুই প্রকার——

(১) অভিমুখী বস্তুদ্বয়ের দিক্‌বৈপরীত্য, আর—

(২) পরাঙ্মুখী বস্তুদ্বয়ের দিক্‌বৈপরীত্য। যদি একটা অপ্‌ট্রেন এবং একটা ডাউন্‌ট্রেন উভয়েই হুগ্‌লি অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তবে একদিকে যেমন দুই ট্রেন দুই বিপরীত দিকে প্রধাবিত হয়, আর একদিকে তেমনি উভয়ে পরস্পরের অভিমুখে প্রধাবিত হয়; ইহাই অভিমুখী বস্তুদ্বয়ের দিক্‌বৈপরীত্য, অথবা যাহা একই কথা—প্রতিমুখী ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য। [redacted]খন হুগ্‌লি হইতে ঐ দুই ট্রেন দুই বিপরীত দিকে প্রধাবিত হয়; তখন তাহারি নাম পরাঙ্মুখী বস্তু-দ্বয়ের দিক্‌বৈপরীত্য অথবা পরাঙ্মুখী ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য। প্রতি-উপসর্গ বেশীর ভাগ প্রতিমুখী ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য-অর্থেই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু স্থলবিশেষে পরাঙ্মুখী-ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য অর্থেও তাহাকে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। "সকল ব্যক্তি" বলিলে বুঝায় যে, ব্যষ্টি সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত; প্রতি-ব্যক্তি বলিলে বুঝায় যে, ব্যষ্টি যেন সমষ্টি হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বিরুদ্ধে আপনার স্বাতন্ত্র্য সমর্থন করিতেছে। প্রতিজন প্রত্যেক প্রত্যহ প্রভৃতি শব্দে এইরূপ পরাঙ্মুখী-ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য অতীব নিগূঢ়রূপে অবস্থিতি করে। মনে কর দশ ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিল—সকলেই বাঙ্গালি, কিন্তু প্রতি জন বিভিন্ন পরিচ্ছদে পরিহিত। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, দশ ব্যক্তির মধ্যে যেখানে ঐক্য সেই খানেই "সকল" শব্দ বসিয়াছে, আর দশ ব্যক্তির মধ্যে যেখানে বৈপরীত্য বা প্রতিপক্ষতা সেইখানেই "প্রতি" শব্দ বসিয়াছে। লিব্‌নিট্‌জ্ নামক সুবিখ্যাত জর্ম্মাণ পণ্ডিত একদা ফরাসীস দেশীয় রাজ-সভার মহিলাবর্গের সহিত রাজবাটীর উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে পার্শ্বচরী মহিলাগণকে লীলাচ্ছলে বলিলেন যে, সমস্ত উদ্যান ঘুঁটিয়া যদি আপনারা এমন কোনো দুইটী বৃক্ষপত্র বাহির করিতে পারেন যেদুটি সর্ব্বাংশে সমান, তবে যে দণ্ড বলেন আমি তাহাই স্বীকার করিব। বলা বাহুল্য যে, মহিলাবর্গ সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেরূপ দুইটী পত্র খুঁজিয়া পাইলেন না। এই প্রকার ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যকে একটু বেশী মাত্রা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আমি ইতিপূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে দশজন বাঙ্গালিকে দশ প্রকার ভিন্ন পরিচ্ছদ

পরিধান করাইয়াছিলাম; কিন্তু উক্ত স্থলে ভিন্ন পরিচ্ছদের কথা উল্লেখ না করিলেও দৃষ্টান্তের বিশেষ কোনো অঙ্গহানি হয় না। দশজনের প্রতিব্যক্তি বলিলেই বুঝায় যে, প্রতি ব্যক্তি এক পক্ষ, এবং অবশিষ্ট নয় ব্যক্তি আর এক পক্ষ, আর, সেই প্রকার দুই দুই পক্ষ অল্প পরিমাণেই হউক্ আর অধিক পরিমাণেই হউক্ কোনো না কোনো পরিমাণে—কাজে না হউক্ ভাবে—পরস্পরের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে—শারীরিক মুখ না হউক্ মানসিক মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। 'প্রতি' শব্দের এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবের পরাঙ্মুখিতা অর্থে যদি শ্রোতা বা পাঠকের মন প্রবোধ না মানে, তবে তিনি প্রতীচী শব্দের আদিস্থিত 'প্রতি' উপসর্গের অর্থের প্রতি প্রণিধান করিলেই আশানুরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব প্রণিধান করা হো'ক্,—

প্র + অক্ = প্রাক্ = প্রাচী।

প্রতি + অক্ = প্রত্যক্ = প্রতীচী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্র-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে; কাজেই প্রাচী শব্দের মৌলিক অর্থ সম্মুখের দিক্ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্রাচী যখন সম্মুখ দিক্, তখন প্রাচী'র বিপরীত দিক্ অবশ্য পশ্চাৎ দিক্। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই যে প্রাচীর বিপরীত দিক্—পশ্চাৎ দিক্—তাহা কোন্ দিক্? পশ্চিম এবং পশ্চাৎ এ দুই শব্দের মধ্যে কেবল ইম এবং আৎ এই দুই লেজুড় মাত্রের প্রভেদ; কিন্তু সে প্রভেদ কার্য্যেরই নহে—পাশ্চাত্য শব্দ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

পাশ্চাত্য জাতি = পশ্চিম প্রদেশীয় জাতি;

অথবা, যাহা একই কথা—

পশ্চাৎ প্রদেশীয় জাতি = পশ্চিম প্রদেশীয় জাতি।

তবেই হইতেছে যে,

পশ্চাৎ দিক্ = পশ্চিম দিক্। কিন্তু পশ্চিম দিকের আর এক নাম প্রতীচী। অতএব এটা স্থির যে,

প্রতীচী দিক্ = পশ্চাৎ দিক্। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রাচী শব্দের মৌলিক অর্থ সম্মুখের দিক্; এখন দেখিতেছি যে, প্রতীচী শব্দের মৌলিক অর্থ পশ্চাৎ দিক্। প্রাচী এবং প্রতীচীর মধ্যে এই যে পরাঙ্মুখী ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য সম্বন্ধ—ইহার জন্য প্রাচী-শব্দের আদিস্থিত প্র-উপসর্গ কোনো অংশেই দায়ী নহে—প্রতীচী শব্দাশ্রিত আদিস্থিত 'প্রতি' উপসর্গই একাকী তাহার জন্য দায়ী; কেননা 'প্রতি' উপসর্গের দিক্‌বৈপরীত্য-সূত্রেই প্রতীচী বলিতে প্রাচী'র উল্টা দিক্ বুঝায়, পশ্চিম দিক্ বুঝায়। প্রতীচী-শব্দাশ্রিত 'প্রতি' উপসর্গের পরাঙ্মুখিতা অর্থ এত করিয়া বুঝাইতে হইল তাহার কারণ এই যে প্রতীচী-শব্দ বঙ্গভাষায় তেমন প্রচলিত নাই;—যদিচ পাশ্চাত্য শব্দের পরিবর্ত্তে প্রতীচ্য-শব্দ শুনিতে মন্দ হয় না। কিন্তু 'প্রতি' উপসর্গের পরাঙ্মুখিতা অর্থের জন্য অত দূরে হাতড়াইবার

প্রয়োজন নাই;—তাহার ঐ প্রকার অর্থ প্রতিনিবৃত্ত এবং প্রত্যাহার এই দুই শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে; কেননা, প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার নামই পরাঙ্মুখ হওয়া; আর, প্রত্যাহরণের নামই উল্টা দিকে টানিয়া লওয়া।

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, প্রতিমুখিতা এবং পরাঙ্মুখিতা দুয়েতেই দিক্‌বৈপরীত্য সমান মাত্রায় সূচিত হয়। যখন একটা অপ্‌ট্রেন এবং একটা ডাউন্‌ট্রেন উভয়েই হুগলি অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, তখনও একটা উত্তরাভিমুখী—একটা দক্ষিণাভিমুখী; আবার ক্ষণপরে যখন উভয়েই হুগলি ছাড়াইয়া চলিল, তখনও একটা উত্তরাভিমুখী—একটা দক্ষিণাভিমুখী। অতএব প্রতিমুখী এবং পরাঙ্মুখী উভয়-ভাবের গতিতেই দিক্‌বৈপরীত্য অবিকল সমান। দিক্‌বৈপরীত্য বিষয়ে প্রতিমুখিতা এবং পরাঙ্মুখিতার মধ্যে এইরূপ যখন মিল রহিয়াছে, তখন দিক্‌বৈপরীত্যের লেজুড় ধরিয়া 'প্রতি' উপসর্গের অর্থাভ্যন্তরে কোনো স্থলে বা প্রতিমুখিতার ভাব, কোনো স্থলে বা পরাঙ্মুখিতার ভাব প্রবেশ করিবে—ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এক্ষণে পরা-উপসর্গের অর্থ কিরূপ তাহা দেখা যাক্। পরা-উপসর্গে আকার আছে—পর-শব্দে আকার নাই, দুয়ের মধ্যে এইরূপ সাকার নিরাকারের প্রভেদ। পর-শব্দে প্রথমতঃ দূরস্থ বুঝায়—যেমন পর-পার অথবা যেমন ঘর আর পর। দ্বিতীয়তঃ শত্রুপক্ষ [redacted] পরন্তপ অর্থাৎ শত্রু-সন্তাপক। তৃতীয়তঃ আপনার মত আর একজন বুঝায়। পর শব্দের প্রথম দুই অর্থের ছায়া পরা-উপসর্গে এবং তৃতীয় অর্থের ছায়া para উপসর্গে সংক্রমিত হইয়াছে।

পর শব্দের দূরতা-অর্থ পরাক্ শব্দের পরা উপসর্গে অতীব স্পষ্টাকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচী এবং প্রতীচী, অথবা যাহা একই কথা প্রাক্ এবং প্রত্যক্, এ-দুয়ের মধ্যে কিরূপ সম্মুখ পশ্চাৎ সম্বন্ধ তাহা ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট দেখা হইয়াছে, এক্ষণে পরাক্ এবং প্রত্যক্ এ-দুয়ের মধ্যে কিরূপ দূর-নিকট সম্বন্ধ তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করা হো'ক। পঞ্চদশী হইতে পরাক্ এবং প্রত্যক্ শব্দের পরস্পর প্রতিযোগিতার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই ঃ——

তে পরাক্ দর্শিনঃ প্রত্যক্ আত্মবোধবিবর্জ্জিতাঃ।
কুর্ব্বন্তে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্মকর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে॥

ইহার অর্থ এই যে, সেই সকল প্রত্যগাত্ম-বোধ-বিবর্জ্জিত পরাগ্‌দর্শী ব্যক্তিরা ভোগ করিবার জন্য কর্ম্ম করে এবং কর্ম্ম করিবার জন্য ভোগ করে। "প্রত্যক্ আত্মা" কিনা নিকটস্থ আত্মা; "পরাক্ বিষয়" কিনা দূরস্থ বিষয় অর্থাৎ বহির্বিষয়। এইটি এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে, প্রত্যক্ শব্দ [redacted] প্রতিযোজিত হয়, তখন প্রত্যক্ বলিতে প্রাক্‌দিক্ [redacted] উল্টাদিক্ বুঝায়—[redacted] যখন পরাক্ শব্দে

সহিত প্রতিযোজিত হয়, তখন প্রত্যক্ বলিতে পরাক্ বিষয়ের উল্টাদিক বুঝায়—দূরস্থ বিষয়ের উল্টাদিক বুঝায়—নিকটস্থ বুঝায়। উভয়স্থলেই দিক্‌বৈপরীত্য ঘটাইবার কর্ত্তা 'প্রতি' উপসর্গ বই আর কেহ নহে।

পরা উপসর্গ যে দূরতা প্রতিপাদক—পরাঙ্মুখ শব্দ তাহার অন্যতম প্রমাণ। বিমুখ হওনের অর্থ মুখ পার্শ্বে ফিরানো—পরাঙ্মুখ হওনের অর্থ মুখ দূরে সরানো; তবে, লৌকিক ব্যবহার-কালে ও-দুই শব্দের অর্থ-বৈষম্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; কেননা মুখ পার্শ্বে ফিরানো এবং দূরে সরানো একই ভাবের অভিব্যঞ্জক—দুইই বিরাগ ভাবে অভিব্যঞ্জক।

পর-শব্দের দূরতা-অর্থ এবং শত্রুতা-অর্থ এই দুয়ের সম্মিশ্রভাব অনেক সময়ে পরা-উপসর্গের অর্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। পরাজয়, পরাভব, পরাহত পরাক্রম, এই সকল শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শত্রুদিগকে দূরে হটাইয়া দিবার ভাব সর্ব্বাগ্রে নেত্র পথে উপস্থিত হয়। দূরতা এবং শত্রুতা এ-দুই অর্থ ব্যতীত পর-শব্দের তৃতীয়-অর্থ আপনার মত আর একজন। পর-শব্দের এইরূপ সমতুল্যতা বা সমকক্ষতা অর্থ para উপসর্গে দিবালোকের ন্যায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে; এমন কি, সে অর্থের কতকটা ছায়া দেশীয়ভাষায় পার-শব্দের গাত্রে সংক্রমিত হইয়াছে। তার সাক্ষী—নদীর এপার ওপার মোটামুটি হিসাবে parallel কিনা সমান্তরপাতী। ফলে, সোজাসুজি ভাবের দূরতার সঙ্গে [redacted] ভাবের যেরূপ ঘনিষ্ট জ্যামিতিক সম্বন্ধ, তাহাতে পরা-উপসর্গের দূরবর্ত্তিতা অর্থ এবং parallel শব্দের সমান্তরপাতিতা অর্থ দুয়ের মধ্যে মূলগত ঐক্য না থাকিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। পরাক্ এবং তির্য্যক্ এই দুই শব্দকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, উভয়েরই অন্তে অক্ রহিয়াছে, আর, উভয়েই জ্যামিতিক ভাবের দূরতা-ব্যঞ্জক; প্রভেদ কেবল এই যে, তির্য্যক শব্দে ত্যাড়্‌চা-ভাবের বা কোণাকুনি-ভাবের দূরবর্ত্তিতা বুঝায়, পরাক্ শব্দে সোজাসুজি ভাবের দূরবর্ত্তিতা বুঝায়। পর, পার, পরা এবং পরাক্—এই শব্দগুলির মধ্যে যেমন নিকট সম্বন্ধ; তর, তীর, তরা এবং তির্য্যক্—এ গুলির মধ্যেও সেইরূপ। তা ছাড়া, নদীর তীর এবং নদীর পার—একই। নদী তরিয়া যেখানে পৌঁছানো যায় তাহাই নদীর তীর; নদী পেরিয়ে যেখানে পৌঁছানো যায়, তাহাই নদীর পার। কিন্তু উহারই মধ্যে পার এবং তীরের ভিতরে অল্প একটু অর্থের ইতর-বিশেষ আছে; তাহা এই যে, তীর বলিতে যেমন-তেমন নদীর কিনারা বুঝায়; পার বলিতে এপার ওপারের মধ্যে মোটামুটি রকমের Parallel ভাব বুঝায়। এখন বক্তব্য এই যে, (১) Para উপসর্গের সমকক্ষতা অর্থ; (২) পার-শব্দের Parallelধাঁচার দূরত্ব অর্থ; (৩) পরা-উপসর্গের সোজা[redacted] রকমের [redacted] "আপনার সদৃশ অথচ আপনা হইতে দূরবর্ত্তী" এই [redacted] অর্থ [redacted] গুলির মধ্যে ভাব সা[redacted]

খুব সহজ—কিন্তু তাহার মূল অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারিলে ভাষাতত্ত্ব-বিজ্ঞানের বিশেষ একটী অভীষ্ট কার্য্য নিষ্পাদন করা হয়, তাহাতে আর ভুল নাই।

"পরামর্শ-শব্দের 'পরা' উপসর্গও যে, দূরতা ব্যঞ্জক, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। নৈয়ায়িক ভাষায় পরামর্শ-শব্দের অর্থ "ব্যাপ্যস্য পক্ষত্ব ধর্ম্মধীঃ" অর্থাৎ ব্যাপ্য-বিষয়ের পক্ষত্ব-ধর্ম্ম অবধারণ। "পক্ষত্ব" কিনা partyত্ব। এখানে পৌরুষেয় ভাব (personality) বাদ দিয়া party শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হোক ঃ—যদি বলা যায় যে, জীবজন্তু বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্ঘাত, তবে অন্তরিন্দ্রিয়কে party করা হয় নাই বলিয়া কথাটায় দোষ পড়ে ;—এখানে অন্তরিন্দ্রিয়কে আলঙ্কারিক হিসাবে party বলা হইতেছে। পক্ষত্ব-অবধারণ বলিতে এইরূপ আলঙ্কারিক ভাবের partyত্ব-অবধারণ বুঝায় ; সে partyত্ব-অবধারণ এইরূপ ঃ—

"ব্রাহ্মণোচিত আচার" বলিতে আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর আচার ব্যবহার বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকি—সারস্বত ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনো দূর-দেশীয় ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার গণনার মধ্যে আনি না। সারস্বত-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় আমাদের চক্ষের সম্মুখ হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিলেও—তাহা যখন ব্রাহ্মণত্বের ব্যাপ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কোটায় স্থান পাইবার যোগ্য, তখন—ব্রাহ্মণ-জাতিবিষয়ক কথার আন্দোলন [redacted] সারস্বত ব্রাহ্মণকেও একটা পক্ষ বলিয়া (party বলিয়া) গণনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ, ব্যাপ্য-বিষয় দূরবর্ত্তী হইলেও তাহার পক্ষত্ব (partyত্ব) অবধারণ করা'র নাম পরামর্শ—"ব্যাপ্যস্য পক্ষত্ব ধর্ম্মধীঃ"। অতএব এটা স্থির—যে, পরামর্শ একপ্রকার দূরান্বয়-গর্ভ যুক্তি।

তাহার পরে আসিতেছে অভি উপসর্গ। অভি উপসর্গের লক্ষ্য প্রার্থনীয় বস্তুর প্রতি। পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্র-উপসর্গের লক্ষ সম্মুখের দিকে। 'প্রার্থনীয় বস্তু' কিনা প্র + অর্থনীয় বস্তু। প্রার্থনীয় বস্তু বলাও যা, আর, মনোনেত্রের সম্মুখবর্ত্তী অভীষ্ট বিষয় বা উদ্দেশ্য বলাও তা, একই কথা। প্র-উপসর্গের সম্মুখবর্ত্তিতা-অর্থের সহিত বিষয়ের ভাব, অর্থের ভাব, বা উদ্দেশ্যের ভাব, সংযোজিত হইলেই তাহা অভি-উপসর্গে পরিণত হয়। প্র এবং অভি দুয়েরই লক্ষ্য সম্মুখদিকে ; তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, অভি-উপসর্গের বিশেষ কোনো একটা বিষয় বা উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকা চাই—প্র-উপসর্গের তাহা চাই না।

তার সাক্ষী——

প্রধাবন = সম্মুখে দৌড়িয়া চলা মাত্র।

অভিধাবন = সম্মুখস্থিত ব্যক্তির প্রতি তাড়াইয়া যাওয়া।

প্র-উপসর্গের লক্ষ্য সামুদ্রিক দীপস্তম্ভের আলোকের ন্যায় (Light-houseএর আলোকের ন্যায়) প্রমুক্তভাবে সম্মুখে প্রসারিত হয়; অভি উপসর্গের লক্ষ্য ঐন্দ্রজালিক প্রদীপের আলোকের ন্যায় (magic lanternএর আলোকের ন্যায়) সম্মুখবর্ত্তী দৃশ্যে মূর্চ্ছিত হয়।

তার সাক্ষী—অভিধ্যানের ঐন্দ্রজালিক আলোকে ধ্যেয় বস্তু চিত্তপটে প্রত্যক্ষবৎ উদ্ভাসিত হয়। ফলে, অভি = ob।

অভি + প্রায় = ob + ject

আমার যা অভিপ্রায় তা এই = The object I have in view is this.

Object এবং অভিপ্রেত বিষয় দুয়ের অর্থ-সাদৃশ্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। নিম্নে প্রণিধান করা হউক ঃ—

প্রেত = প্র + ইত = প্র + গত। প্র-গত বলিতে দুইরূপ বুঝায়—সম্মুখ-গতও বুঝায়, আর, যাহা সম্মুখ হইতে গত হইয়াছে, এক কথায়—যাহা প্রস্থান করিয়াছে, তাহাও বুঝায়। ভূত-প্রেতের প্রেতের সহিত শেষোক্ত অর্থ, আর, অভিপ্রেতের প্রেতের সহিত পূর্ব্বোক্ত অর্থ, বিশিষ্টরূপে সংলগ্ন হয়।

অভিপ্রেত = সম্মুখে গত ; আর,

Object = অভিject = সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত ; দুয়ের মধ্যে এই যা প্রভেদ। ভাবার্থ দুয়েরই প্রায় সমান ; তাহা আর কিছু না—যাহা মনোনেত্রের সম্মুখে প্রভাসিত হয়। তার সাক্ষী—আভিপ্রেত বিষয়, অভীষ্ট বিষয়, অভিলষিত বিষয়, অভিধেয় বিষয়, এ সমস্তই বিশিষ্টরূপে object-স্থানীয় বিষয়। অভি-উপসর্গ স্বর্ণধারের ন্যায় ঐ সকল শব্দের মূল স্থানে বসিয়া সমস্তেরই গতি সম্মুখবর্ত্তী কূলের দিকে নিয়মিত করিতেছে।

"অভিমুখ" বলিলেই সম্মুখস্থিত একটা কোন লক্ষ্য বস্তুর প্রতি [illegible] বুঝায়। "অভিধ্যান" বলিলেই ধ্যেয় বস্তুকে মনোনেত্রের সম্মুখে আনয়ন করা বুঝায়। "অভিজ্ঞান" বলিলেই জ্ঞেয় বস্তু মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে বুঝায়। শকুন্তলার আঙ্গটি দেখিয়া দুষ্মন্ত রাজা যেমন অতীত বৃত্তান্ত মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন, সেইরূপ অল্প কোনো সূত্রে জ্ঞেয় বিষয়কে মনোনেত্রে প্রাপ্ত হওয়ার নাম, অথবা যাহা একই কথা—চিহ্ন বা লক্ষণ দেখিয়া জ্ঞেয় বস্তুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়ার নাম—অভিজ্ঞান।

অভিনয় = সম্মুখে আনয়ন = রঙ্গভূমিতে দর্শকের সমক্ষে নানা প্রকার দৃশ্যের আনয়ন।

অভিধান = সম্মুখে স্থাপন করা = নামোচ্চারণের মন্ত্রবলে নামীকৃত বস্তুকে মনশ্চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করানো।

সংস্কৃত কাব্যাদিতে অভিসার নামক একটা উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়ের ব্যাপার মধ্যে মধ্যে বর্ণিত হইয়া থাকে ; বিজ্ঞান-চর্চ্চার অনুরোধে সে বিষয়টার সম্বন্ধে একটী কথা স্বল্প উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। অভিসরণ = অভি + সরণ। সরণ শব্দে শুধু কেবল চলা বুঝায় ; কিন্তু তাহার সহিত অভি-উপসর্গ সংযোজিত হওয়াতে চলার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—মনোনেত্রের সম্মুখবর্ত্তী গন্তব্য প্রিয়-নিকেতনের অভিমুখে চলা। অভিবাদন, অভ্যর্থনা, প্রভৃতি শিষ্টাচার-ব্যঞ্জক অভিপূর্ব্বক শব্দগুলিতে অভি-উপসর্গের লক্ষ্য এরূপ স্পষ্টভাবে সম্মুখস্থিত ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার সবিশেষ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। উদাহরণ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—এখন একটী পৌরাণিক রহস্যের প্রতি প্রণিধান করা হউক ঃ—

মূল আর্য্যজাতি যে, এক আদিম নিবাস হইতে দুই বিপরীত দিকে দুইশাখা প্রসারণ করিয়াছিলেন, সেই রহস্য-কাহিনীর একটী দুইমুখা চাবি এতকালের পর খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে ;—সে চাবির একটী মুখ প্রতি-উপসর্গ এবং আর একটি মুখ অভি-উপসর্গ।

Occident = ob + cident = অভি + পতিত = যাহা সম্মুখে পড়ে। এখানে পড়া এবং উপস্থিত হওয়া এ দুয়ের অর্থ-সাদৃশ্য সবিশেষ দ্রষ্টব্য ; এইটি দ্রষ্টব্য যে,—

বিপৎপাত = বিপদ পড়া = বিপদ উপস্থিত হওয়া।

Accident = যাহা ad + cident = যাহা আ + পতিত = আপদ = যাহা গায়ের উপর আসিয়া পড়ে।

Occident = ob + cident = অভি + পতিত = সম্মুখে উপস্থিত। শুধু যে কেবল সম্মুখে উপস্থিত তা নয়—তা অপেক্ষা আর একটু বেশী। কি ? না সম্মুখে উপস্থিত প্রার্থনীয় বিষয়, অভিপ্রেত বিষয়, অভীষ্ট বিষয়, objectরূপী বিষয় ; কেননা সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়াছি যে, অভি-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখবর্ত্তী প্রার্থনীয় বস্তুর প্রতি।

এইরূপ যখন আমরা পাইতেছি যে, occident দিক = সম্মুখবর্ত্তী অভিপ্রেত দিক, এক কথায়—গন্তব্য দিক, তখন তাহা অপেক্ষা এবিষয়ের আর অধিক প্রমাণ কি হইতে পারে যে, আদিম নিবাস হইতে বহিঃপ্রয়াণকালে, পশ্চিমদিক, যাহা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের পশ্চাৎদিক ছিল, তাহাই পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের সম্মুখদিক ছিল। তখন দিক্‌দর্শনী অর্থাৎ সামুদ্রিক কম্পাস্ ছিল না—কাজেই বিদেশ-যাত্রাকালে পূর্ব্বতন আর্য্যেরা একপ্রকার শাব্দিক দিক্‌দর্শনী গড়িয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় পুরাতন দিক্‌দর্শনীর চারিটী কাঁটা এইরূপ ঃ—

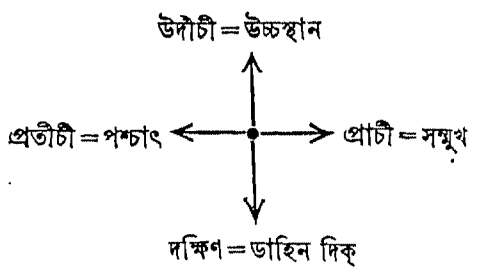

পূর্ব্বদিক = প্রাচীদিক = সম্মুখের দিক = গন্তব্য দিক।

পশ্চিমদিক = প্রতীচী-দিক = সম্মুখের বিপরীত দিক = পশ্চাৎ দিক = পরিহার্য্য দিক।

দক্ষিণদিক = পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রাকালে দক্ষিণ-হস্ত যে দিকে পড়ে সেই দিক।

উত্তরদিক = উদীচী = উৎপ্রদেশ = উচ্চপ্রদেশ = Highlandপ্রদেশ = হিমালয়-সংশ্রিত পার্ব্বত্য-প্রদেশ।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের দিক্‌দর্শনীতেই পশ্চিমদিক = পশ্চাৎ দিক; কিন্তু পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের দিগ্‌দর্শনীতে—

পশ্চিমদিক = Occident দিক = ob + cident দিক = অভি-পতিত দিক = সম্মুখবর্ত্তী অভিপ্রেত-দিক = গন্তব্য দিক।

ইহাকে এক যাত্রায় পৃথক ফল বলে না—ইহাকে বলে দুই যাত্রায় পৃথক ফল।

Latin অভিধান আমার নিকটে নাই সুতরাং ল্যাটিন্ অভিধানকারেরা Occident শব্দ ভাঙিয়া তাহার মধ্য হইতে 'পশ্চিম' অর্থ কিরূপে টানিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা বলিয়া, আপনারা এরূপ মনে করিবেন না যে, Occident শব্দের ঐ যেরূপ অর্থ আমি প্রদর্শন করিলাম তাহা আমার স্বকপোল-কল্পিত। আমি আমার একজন বন্ধুকে দিয়া ঐ বিষয় সম্বন্ধে সেণ্ট্ জেবিয়র কালেজের রেক্টর এল্ হ্যাগেন্-বেক সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম; রেক্টর সাহেব আমার কৃত ঐ অর্থ সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন, আর, সেই সঙ্গে মাক্সমুলার এবং অন্যান্য প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ (অর্থাৎ Orientalist.) পণ্ডিতদিগকে ঐ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া তাঁহারা কি বলেন তাহা জানিতে পরামর্শ দিলেন।

অতঃপর আসিতেছে নিঃউপসর্গ অর্থাৎ সবিসর্গ নি উপসর্গ।

নিঃ = ex

তার সাক্ষী

নিঃশেষণ = নিঃ + শেষণ = ex + terminaton = Extermination.

এখানে নির্বিসর্গ নি এবং সবিসর্গ নি দুয়ের অর্থ-বৈষম্য—অর্থের বৈষম্য শুধু নয়, অর্থের বৈপরীত্য, সবিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

সবিসর্গ নিঃ = ex = out,

নির্বিসর্গ নি = in;

তার সাক্ষী

নিবসন = বাসস্থানের অভ্যন্তরে থাকা।

নির্বাসন = বাসস্থান হইতে বহিষ্করণ।

নিরীক্ষণ = বাহির করিয়া দেখা অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তুকে আশ-পাশের জঞ্জাল হইতে পৃথক করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

নির্ধারণ = জ্ঞাতব্য বিষয়কে পার্শ্ববর্ত্তী সমজাতীয় বস্তুর দল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাহার বিশেষত্বের প্রতি মনশ্চক্ষু নিবদ্ধ করা।

গৌতম-সূত্রে নির্ণয় শব্দের যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করা হউক ঃ—

"বিমৃষ্য পক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যাং অর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।"

অর্থাৎ বিচার-পূর্ব্বক পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের মধ্য হইতে (অর্থাৎ thesis এবং antithesisএর মধ্য হইতে) প্রকৃত সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির করার নাম নির্ণয়। ইহার একটী উদাহরণ দিতেছি—তাহা দেখিলেই নির্ণয়-শব্দের প্রকৃত অর্থ, এবং সেই সঙ্গে তাহার আদিস্থিত নিঃউপসর্গের সার্থকতা, পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) চন্দ্র হয় গ্রহ, নয় উপগ্রহ।

(২) গ্রহ মাত্রই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

(৩) চন্দ্র তাহা করে না।

(৪) অতএব চন্দ্র গ্রহ হইতে পারে না।

(৫) তবেই হইতেছে যে, চন্দ্র উপগ্রহ। ইহারই নাম চন্দ্রকে উপগ্রহ বলিয়া নির্ণয় করা। এখানে যাহা করা হইল তাহা এই ঃ—

একটী পক্ষ এই যে, চন্দ্র গ্রহ; আর একটী পক্ষ এই যে, চন্দ্র উপগ্রহ। এই দুই পরস্পর-বিরোধী পক্ষের একটীকে সরাইয়া অপরটীকে যুক্তিদ্বারা টানিয়া বাহির করা হইল ঃ—ইহারই নাম নির্ণয়। নির্ণয় শব্দের অর্থের মধ্যে, এইরূপ, সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির করিবার ভাব সঞ্চারিত করা সবিসর্গ নি উপসর্গেরই কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রচলিত বঙ্গভাষায় ক্রিয়াবাচক-শব্দের লেজুড় স্বরূপে যেখানে 'তোলা' শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেখানে তোলা-শব্দের অর্থ—বাহির করা; তার সাক্ষী টানিয়া তোলা=টানিয়া বাহির করা। আমরা একদিকে যেমন বলি যে, "মুখচক্ষু দিয়া সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে" আর একদিকে তেমনি বলি যে, "চিত্রকর মুখের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে"; এস্থলে দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, ফুটাইয়া তোলাও যা, আর, ফুটাইয়া বাহির করাও তা, একই কথা। এইজন্য, টানিয়া তোলা, ফুটাইয়া তোলা, করিয়া তোলা, গড়িয়া তোলা, এই ভাবের সংস্কৃত-ঘ্যাঁসা শব্দে প্রায়ই নিঃউসপর্গ সংযোজিত হইয়া থাকে। তার সাক্ষী—

নির্ব্বাহ বা নিষ্পাদন=করিয়া তোলা।

নির্ম্মাণ=গড়িয়া তোলা।

নির্ব্বাচন বা নির্ব্বচন=বাক্যের ঠিক অর্থটি বিবৃত করিয়া তোলা—Define করিয়া তোলা।

বস্তু-বাচক বা ভাব-বাচক শব্দে অনেক সময় নিঃউপসর্গের বহিষ্কার-অর্থ বিহীনতা-অর্থে পরিণত হয়; কিন্তু সে বিহীনতা বহিষ্কারেরই ফল-স্বরূপ। তার সাক্ষী—

নিস্তেজ=তেজোহীন; তেজোহীন কেন? না যেহেতু তেজ বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। বস্তুবাচক বা ভাব-বাচক শব্দের আদিস্থিত নিঃউপসর্গেরই ঐরূপ অর্থান্তর ঘটে; ক্রিয়াবাচক শব্দের আদিস্থিত নিঃউপসর্গের অর্থ যেমন তেমনি অবিকৃত থাকে। তার সাক্ষী—

সম্বল শব্দ বস্তু-বাচক তাই—নিঃসম্বল=সম্বলবিহীন।

গমন শব্দ ক্রিয়াবাচক তাই—নির্গমন=বহির্গমন।

শ্বাস শব্দ বস্তুবাচক তাই—সবিসর্গ নিঃশ্বাস = শ্বাস-বিহীন। শ্বসন-শব্দ ক্রিয়াবাচক তাই নিঃশ্বসিত = বহিঃশ্বসিত।

এখানে এইটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে, আমরা যখন বলি যে, কবির হৃদয় হইতে কবিতা নিঃশ্বসিত হইতেছে, তখন সে নি-উপসর্গ সবিসর্গ; পক্ষান্তরে যখন বলি "নিশ্বাস টানিতেছি" তখন সে নি-উপসর্গ নির্বিসর্গ। সবিসর্গ নিঃশ্বাস এবং নির্বিসর্গ নিশ্বাস দুয়ের মধ্যে এইরূপ স্পষ্ট প্রভেদ সত্ত্বেও অনেকে তাহা দেখিয়াও দেখেন না; এমন কি পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যেও অনেকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নি-উপসর্গে বিসর্গ বসাইতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হ'ন না। সচরাচর আমরা বলি বটে যে, নিশ্বাস ফেলিতেছি কিন্তু সেটা ভারি ভুল—বলা উচিত "শ্বাস ফেলিতেছি"। কেননা, নিশ্বাস যদি সবিসর্গ হয় তবে তাহার অর্থ শ্বাস-বিহীন; আর, তাহা যদি নির্বিসর্গ হয়, তবে তাহার অর্থ ভিতরে টানিয়া লওয়া শ্বাস; দুয়ের কোনোটিরই সহিত নিক্ষেপণ-ক্রিয়া সংলগ্ন হয় না। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে নিশ্বাস-ক্ষেপণ বা নিশ্বাস-পাতন এপ্রকার শব্দ-যোজনার দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

তার পর আসিতেছে উপ-উপসর্গ। উপসর্গ-শব্দ নিজেই উপ-উপসর্গের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল। সর্জ্জন শব্দে ত্যাগ বা প্রক্ষেপণ বুঝায়। মূল-শব্দের গাত্রে যাহা উত্তরীয় বস্ত্রের ন্যায় উপনিক্ষিপ্ত হয় তাহাই উপসর্গ। উপ-উপসর্গের যেখানে যে-ভাবের যত প্রকার প্রয়োগ আছে, সকল স্থলেই একটা বড় বিষয়ের বা প্রধান বিষয়ের প্রান্ত ঘেঁষা ছোটোখাটো বিষয় বা লঘীয়ান্ বিষয় সূচিত হয়। তার সাক্ষী—

উপকূল = কূলঘেঁষা প্রদেশ।

উপান্ত = প্রান্তঘেঁষা প্রদেশ।

উপবেশন = কোনো একটি প্রদেশ ঘেঁসিয়া তাহার একস্থানে বসা।

উপাসনা = সেবার্থে প্রান্ত ঘেঁসিয়া বসা।

ইট কাট প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ সামগ্রী প্রকরণ-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া গঠিতব্য মন্দিরে পরিণত হয়। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উপকরণ প্রকরণের আনুষঙ্গিক ব্যাপার। অভিপ্রায় সাধনার্থেই নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে; অতএব অভিপ্রায়ই মূল, উপায় তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার। অতঃপর আসিতেছে আ-উপসর্গ।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, নি = in; এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, আ = ad। Inhere এবং adhere এই দুই শব্দের অর্থভেদের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে আ এবং নি-উপসর্গের অর্থভেদ স্পষ্ট ধরা পড়িবে। উপরে উপরে সংলগ্ন হওয়ার নাম adhere। হাড়ে হাড়ে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার নাম inhere। তেমনি, আহত = উপরে উপরে হত; নিহত = মর্ম্মান্তিকরূপে হত। সংস্কৃত ভাষায় ঘাড়ে ভূত চাপাকে বলে ভূতাবেশ;—রোবাবেশ বলিতেও ঘাড়ে-ভূতচাপা-রকমের রিপুর আক্রমণ বুঝায়। কিন্তু যদি বলি যে,

"অমুকের মুখচ্ছবি আমার অন্তঃকরণে নিবিষ্ট রহিয়াছে" তবে ভাবে বুঝায় যে, তাহা আমার অন্তঃকরণে এমনি সেঁধিয়া রহিয়াছে যে, তথা হইতে তাহাকে নড়ানো সুকঠিন্। ওঝা ভূত ঝাড়াইতে পারে, সান্ত্বনা-বাক্য ক্রোধ ঝাড়াইতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিবিষ্ট ছবি সেখান হইতে স্থানান্তরিত করা—কাল যদি পারে তো পারে—নহিলে তাহা দেবতারও অসাধ্য।

সংলগ্ন বস্তু মাত্রই প্রথমতঃ দূর হইতে নিকটে উপনীত হয়; দ্বিতীয়তঃ সংলগ্ন হওয়া কালে তাহা আশ্রয়-স্থানের দূর হইতে নিকট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। বাণ গাত্রে সংলগ্ন হইয়াছে বলিলেই বুঝায় যে, প্রথমতঃ তাহা দূর হইতে আসিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ তাহা অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী পক্ষযুক্ত সূক্ষ্মাংশ হইতে নিকটবর্ত্তী তীক্ষ্ণ ফলা পর্য্যন্ত প্রসারিত। পূর্ব্বোক্ত ভাবটি, অর্থাৎ দূর হইতে নিকটে আসিবার ভাবটি, আগমন, আনয়ন, আয়োজন প্রভৃতি শব্দের আ-উপসর্গে খুবই স্পষ্টাকার ধারণ করিয়াছে। শেষোক্ত ভাবটির মধ্য দিয়া, অর্থাৎ 'সংলগ্ন বস্তু অপেক্ষাকৃত দূর হইতে নিকট পর্য্যন্ত প্রসারিত' এই ভাবটির মধ্য দিয়া আ-উপসর্গের অর্থের মধ্যে অনেক সময় অবধি এবং পর্য্যন্তের ভাব প্রবেশ করে; তার সাক্ষী—আ-সমুদ্র=সমুদ্র পর্য্যন্ত; আ-জন্ম=জন্মাবধি। মূল-ভাগ যে স্থানটিতে সংলগ্ন থাকে, তাহারই নাম অবধি, আর, অন্ত-ভাগ যে স্থানটিতে সংলগ্ন থাকে তাহারই নাম পর্য্যন্ত।

আজন্মকাল=জন্মাবধি কাল=যে কাল-প্রবাহের মূলাংশ জন্ম মুহূর্ত্তের সহিত সংলগ্ন।

আমরণ কাল=মৃত্যু পর্য্যন্ত কাল=যে কাল-প্রবাহের অন্তভাগ মৃত্যুর সহিত সংলগ্ন।

আসমুদ্র পৃথিবী=যে পৃথিবীর অন্তভাগ সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন।

আবহমান কাল=আজ পর্য্যন্ত বহমান কাল=যে কাল-প্রবাহের অন্তভাগ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের সহিত সংলগ্ন।

এই সকল দৃষ্টান্তে পুষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সংলগ্ন হওনের ভাবই আ-উপসর্গের অর্থের সমগ্র শরীর, অবধি এবং পর্য্যন্তের ভাব তাহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অতঃপর আ-উপসর্গের মুখ্য অর্থের (অর্থাৎ খাস্ অর্থের) গোটাকত নমুনা দেখাইতেছি—প্রণিধান করা হউক্ ঃ——

আলিঙ্গন=গাত্রে গাত্র সংলগ্ন করিয়া কোলাকুলি।

অশ্বারোহণ=ঘোড়ায় চড়া, অশ্বের পৃষ্ঠে সংলগ্ন হওয়া।

দোষারোপ=দোষ স্কন্ধে চাপানো, দোষ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া।

চলিত ভাষায় এইরূপ দোষ সংলগ্ন করিয়া দেওয়ার নাম—লাগানো; যেমন, অমুকের কাছে অমুকের নামে লাগানো।

আমরা বলি "আজ্ঞাবহ ভৃত্য" আর বলি "আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম।"

তবেই হইতেছে যে, আদেশ একপ্রকার বহন করিবার জিনিস—মাথায় ধারণ করিবার জিনিস। আজ্ঞা বহন করা বা আদেশ বহন করা=আদিষ্ট কার্য্যের ভার বহন করা,

আর, সে ভার যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নির্ব্বাহিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা মনের স্কন্ধে সংলগ্ন থাকে।

তাহার পরে আসিতেছে অধি-উপসর্গ। অধি-উপসর্গের ধি অংশটি মুখ্যরূপে সীমা অর্থে এবং গৌণরূপে—কোথাওবা আধার অর্থে কোথাওবা আধেয় অর্থে ব্যবহৃত হয়; তার সাক্ষী—

অবধি অব + ধি = নিম্ন সীমা অর্থাৎ ইংরাজি গণিত শাস্ত্রে যাহাকে বলে Lower limit। পরিধি = চতুঃসীমা = periphery। আধি = আ + ধি। আধি শব্দের আ-উপসর্গ বলিতেছে যে আধি (কিনা মনঃপীড়া) মনের সহিত সংলগ্ন; ধি বলিতেছে যে তাহা মনের সীমা-প্রদেশে অর্থাৎ শরীর এবং মনের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থান করে। সীমার ভাবের সঙ্গে আধার-আধেয়-ভাবের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তার সাক্ষী—

আধার-পাত্রের অন্তস্তর আধেয়-জলের সীমা-স্থান, এবং আধেয়-জলের বহিস্তর আধার-পাত্রের সীমা-স্থান। সীমা-স্থানের একদিকে আধার এবং আর একদিকে আধেয়, এই সূত্রে ধি শব্দের সীমা-অর্থ কোনো স্থলে বা আধার-অর্থে, কোনো স্থলে বা আধেয় অর্থে পরিণত হয়। তার সাক্ষী—

জলধি = জলের আধার, সমুদ্র।

নিধি = ধনির আধেয় বস্তু, রত্ন।

ধি-শব্দের সীমা-অর্থ অধি-উপসর্গে সংক্রামিত হওয়াতে অধি-উপসর্গের অর্থ দাঁড়াইয়াছে বাচ্য বিষয়ের চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রভাবের বিস্তার। তার সাক্ষী—

অধিষ্ঠান = আশ্রয়-প্রদেশের চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া অবস্থান।

অধিকার = অভিলষিত স্থানের চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার।

বলিলাম "প্রভাব বিস্তার করা"—কিন্তু "প্রভাব বিস্তার" অধি-উপসর্গের অর্থের মুখ্য অবয়ব নহে, তাহার মুখ্য অবয়ব—সীমাবসায়িতা। এই জন্য সংস্কৃত গ্রন্থে অধিকার শব্দে অনেক সময়ে সীমা আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা বুঝায়। "অমুকং অধিকৃত্য বর্ত্ততে" অর্থাৎ অমুকের সীমা আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে—অর্থাৎ অমুককে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। অধ্যাত্ম বিষয় কি? না যে বিষয় আত্মাকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে—অর্থাৎ যাহা আত্মার সীমা আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে—আত্মার সীমার বাহিরে যায় না।

অধি-উপসর্গ এবং অধিক শব্দ উভয়ের মধ্যে উপাধি-গত যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে দেখিয়া দোঁহার মূলগত অর্থ-সাদৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা করা কোনো-ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বেদাদি প্রাচীনতম শাস্ত্রে অনেকানেক স্থলে উপসর্গ পৃথক্ শব্দাকারে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। খুব সম্ভব যে, অত্যতি পূর্ব্বকালে অর্থাৎ মান্ধাতারও মান্ধাতার আমলে সকল স্থলেই উপসর্গগুলি ইংরাজি prepositionএর ন্যায় পৃথক্ শব্দাকারে ব্যবহৃত হইত। যাহাই হউক—অধিক এবং অত্যন্ত এই দুই শব্দের দুই অর্থ পরস্পর মিলাইয়া দেখিলে অধি এবং অতি এ দুই

উপসর্গের দুই অর্থের ভেদাভেদ অতীব উজ্জ্বল-রূপে পরিস্ফুট হয়। অধিক শব্দে বুঝায়—যাহা চরম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অত্যন্ত-শব্দে বুঝায়—যাহা অন্তকে অতিক্রম করে—সীমাকে অতিক্রম করে—সীমা ছাড়াইয়া উঠে। আমরা যখন বলি "অধিক ক্রোধ ভাল নয়" তখন তাহার অর্থ এই যে, যতটা ক্রোধ সম্ভবে তাহার চরম সীমা পর্য্যন্ত ক্রোধ ভাল নয়। পক্ষান্তরে যখন বলি "আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইল" তখন তাহার অর্থ এই যে, আমার ক্রোধের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া উঠিল।

উপসর্গের অর্থ বোঝাই করিয়া প্রবন্ধের জাহাজ-খানি নানা-প্রকার প্রতিকূল স্রোত, ঘূর্ণার পাক, এবং চোরা পাহাড়, বাঁচাইয়া কোনো মত প্রকারে তো বন্দরে আনিয়া উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে যাঁহারা আমার পণ্যদ্রব্য বাজারে যাচাই করিবেন, তাঁহাদিগের সহিত একটি বিষয়ে আমি পূর্ব্বাহ্নে বোঝা-পড়া করিয়া রাখা শ্রেয় বিবেচনা করি—সেইটী হইয়া চুকিলেই আমার আজিকের কার্য্য শেষ হইয়া যায়। কথাটী এই ঃ——

গণিতের প্রমাণ ছাড়া আর যত প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে সমস্তেরই বলবত্তা আপেক্ষিক মাত্র। বিজ্ঞান-মহলে প্রমাণের ঐকান্তিক বলবত্তা কেবল গণিতের যুক্তি প্রণালীতেই সম্ভবে। গণিতকে গণনার মধ্য হইতে সরাইয়া রাখিয়া অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, অভ্রান্ত সত্য সংস্থাপন করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে; তবে কি? না [illegible]তে উত্তরোত্তর সত্য হইতে সত্যে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে তাহার পথ পরিষ্কার করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এমন কি, নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্তটীও একান্ত অভ্রান্ত বলিয়া—নিখুঁত অভ্রান্ত বলিয়া—গৃহীত হইতে পারে না। বলিতেছ মাধ্যাকর্ষণ;—কিন্তু একটা কিছুর মধ্য দিয়া—দৃশ্য বা অদৃশ্য কোনো প্রকার রজ্জু দিয়া—আকর্ষণ না করিলে আকর্ষণ করা হইতেই পারে না। সেই মধ্যবর্ত্তী বস্তু এবং মূল আকর্ষক বস্তুর মধ্যেও আকর্ষণ রহিয়াছে; সেই দ্বিতীয় আকর্ষণের জন্য দ্বিতীয় মধ্যবর্ত্তী বস্তুর প্রয়োজন। দ্বিতীয় মধ্যবর্ত্তী বস্তু এবং মূল আকর্ষক বস্তুর মধ্যেও আকর্ষণ রহিয়াছে; সেই তৃতীয় আকর্ষণের জন্য তৃতীয় মধ্যবর্ত্তী বস্তুর প্রয়োজন। এইরূপ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রভৃতি অসংখ্য মধ্যবর্ত্তী বস্তুর প্রয়োজন। সর্ব্ব প্রথম মধ্যবর্ত্তী বস্তু কে? সেই আদিম মধ্যবর্ত্তী বস্তু বিনা-রজ্জুতে অর্থাৎ অন্য কোনো মধ্যবর্ত্তী বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে কিরূপে মূল বস্তুর আকর্ষণে বাঁধা রহিবে? মূল আকর্ষক বস্তু তবে কি শূন্যের মধ্য দিয়া আকর্ষণ করিতেছে? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? ঐকান্তিক শূন্য দুই বস্তুর মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইলে উভয়ের মধ্যে ভৌতিক সম্বন্ধ সমূলে রহিত হইয়া যাইবারই কথা। অতএব মাধ্যাকর্ষণ-শব্দ কেবল বিজ্ঞানের গন্তব্য-পথ-নির্দ্দেশক একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র; তা বই তাহা পরাকাষ্ঠা সত্যের পরিচায়ক নহে। সেই সাঙ্কেতিক চিহ্নে যৎকিঞ্চিৎ সত্যের আভাস যাহা পাওয়া যায়, সেই আভাস-সত্য প্রকৃত সত্যের পদবী অধিকার করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলে, অনভিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে সর্ব্ব-জগতের মূলাধার বলিয়া

পূজা করিতে পারেন; কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা তাহা দেখিয়া হাসিবেন কি কাঁদিবেন তাহা ভাবিয়া পা'ন না। তবে, নিউটনের আবিষ্কৃত ঐ সাঙ্কেতিক চিহ্নটি যে, সত্য-নিকেতনের একটী প্রশস্ত রাজ-পথের ঠিকানা নির্দ্দেশ করে, এ বিষয়ে কাহারো মনে তিলমাত্রও সংশয় স্থান পাইতে পারে না।

ইহা দেখিয়া শুনিয়া কোন্ সাহসে আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোনো প্রকার অভ্রান্ত মত সংস্থাপনের প্রয়াস পাইব? আমার কি হাস্যের ভয় নাই! ফলে, বর্ত্তমান্ প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত কোনো-একটী স্থানেও আমি গায়ের জোরে কোনো অভ্রান্ত মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করি নাই। অপক্ষপাতী এবং অকপট যুক্তি ও বিচার আমাকে যে পথে চালাইয়াছে আমি সেই পথে চলিয়াছি। চাই আমি আর কিছু না—বর্ত্তমান প্রবন্ধের যে স্থানের যে যুক্তির যত-টুকু প্রামাণিকতা বা বলবত্তা সম্ভবে, তাহার অনুকর্ষিত সিদ্ধান্ত তত-টুকু সত্য বলিয়া গৃহীত হউক্—তা বই আমি অভ্রান্ত সত্যের কোনো দাবি রাখি না। আমার চরম মন্তব্য কথা এই যে, সুবিবেচনাপূর্ব্বক উপসর্গের প্রয়োগদ্বারা বঙ্গভাষার শক্তি শ্রী এবং নিষ্কর্ষতা (অর্থাৎ accuracy) সাধন করিবার যে, একটী সুন্দর পথ আছে, তাহার প্রতি যদি কোনো সজ্জন সাহিত্য-সেবকের চক্ষু ফুটাইয়া দিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

[সভাস্থলে আমার পাঠ সমাপ্ত হইলে, সভাপতির আসনারূঢ় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী সর্ব্বশেষে উঠিয়া বলিলেন যে, আমার প্রবন্ধের সব স্থান তাঁহার স্মরণ নাই—অতএব তিনি আপাততঃ কোনো কথা বলিতে চাহেন না। কিন্তু তাহার পরেই, তিনি আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে এরূপ গোটা দুই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যাহা প্রথম উদ্যমেই তড়িঘড়ি প্রকাশ না করিয়া—আমি কি বলিয়াছি না বলিয়াছি তাহা অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া—পরে প্রকাশ যোগ্য বোধ হইলে, প্রকাশ করা উচিত ছিল।]

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, দুঃ উপসর্গের অর্থ শুধু যে, মন্দ, তাহা নহে—অনেক সময় দুঃ উপসর্গ অভাব-বাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, দুঃ=মন্দ বা কষ্টজনক। "বা কষ্টজনক" এটা যে আমি বলিয়াছি—শাস্ত্রী মহাশয়ের তাহা মনে না থাকাতে তিনি আমাকে অনভিজ্ঞ-বোধে বুঝাইলেন যে, দুঃ-উপসর্গ অনেক সময়ে অভাবজ্ঞাপক। তিনি বলিলেন "অভাব-জ্ঞাপক"—আমি না হয় বলিয়াছি কষ্ট-জ্ঞাপক—ভাবার্থ একই। বরং কষ্টে ভিক্ষা লব্ধ হয় এইরূপ অর্থ দুর্ভিক্ষের সহিত বেশী সংলগ্ন হয়—যেহেতু দুঃসাধ্য, দুষ্কর, দুর্জ্জয় প্রভৃতি ভূরি ভূরি শব্দে দুঃ উপসর্গ কষ্টের পরিজ্ঞাপক। শাস্ত্রী মহাশয় একজন অসামান্য ব্যাকরণ-বিশারদ পণ্ডিত—সেইজন্য আমি কি বলিয়াছি না বলিয়াছি তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়া—উপসর্গের অর্থ-বিচারের অর্থ কি তাহা বিস্মৃত হইয়া—অর্থ-বিচারের কিরূপ প্রণালী-পদ্ধতি আমা কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বিস্মৃত হইয়া—পঠিত প্রবন্ধ উপলক্ষে কতকগুলি বৈয়াকরণিক বাজে কথার বক্তৃতা করিলেন।

প্রতিব্যক্তি প্রত্যহ প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত প্রতি'র অর্থ কি-হিসাবে প্রতিপক্ষতা-সূচক বা পরাঙ্মুখিতা-সূচক তাহা আমি খুলিয়া-খালিয়া বলিয়াছি, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় সে সকল কথা গ্রাহ্যে না আনিয়া প্রতিবাদচ্ছলে বলিলেন যে, "প্রতিজন" বলিলে প্রত্যেকের সহিত অপর সকলের কাহারো কোনো সম্বন্ধ বুঝায় না—সুতরাং প্রতিপক্ষতা সম্বন্ধ বুঝায় না। "প্রতি ব্যক্তি" বলিতে প্রত্যেকের সহিত অপর ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধ বুঝায় না—এটা তিনি ভারি ভুল বুঝিয়াছেন। একটা বটবৃক্ষ যদি একাকী মাঠের মাঝখানে দণ্ডায়মান থাকে তবে তাহার তলে বসিয়া কোনো পথিক এরূপ কথা বলে না যে, আমি প্রতি বটবৃক্ষের তলে বসিয়াছি। পক্ষান্তরে, একজন আম্র-ব্যবসায়ী স্বচ্ছন্দে এরূপ কথা বলিতে পারে যে, আমি আজ আম্রোদ্যানের প্রতিবৃক্ষের সমস্ত আম্র উৎপাটন করিব। তবেই হইতেছে যে, আম্রোদ্যানের এক-একটী বৃক্ষ অপরাপর বৃক্ষের সহিত ব্যষ্টি-সমষ্টি-সম্বন্ধে জড়িত রহিয়াছে বলিয়াই, তদুপলক্ষে "প্রতিবৃক্ষ" এই বচনটীর সার্থকতা হয়। আগে তিন বৃক্ষ, বা চার বৃক্ষ, বা আট বৃক্ষ, বা দশ বৃক্ষ, একত্রে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করে—পরে "প্রতিবৃক্ষ" বলিয়া অপর সকলের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ রহিত করিয়া—তাহাকে এক-ঘরে' করা হয়। সম্বন্ধ রহিত করা প্রতিপক্ষতারই লক্ষণ। আমি যদি বলি যে, তোমার সহিত আমার আজ অবধি সম্বন্ধ রহিত হইল, তবে সেই মুহূর্ত্তে তোমার আমার মধ্যে মিত্রতা-সম্বন্ধ খণ্ডিত হইয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রতিপক্ষতা-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে। সম্বন্ধ সাধারণতঃ দুইরূপ, (১) অন্বয়াত্মক (positive), (২) ব্যতিরেকাত্মক (negative)। শাস্ত্রী মহাশয় যদি বলিতেন যে, "প্রতিজন" বলিলে অপর-সকলের সহিত প্রত্যেকের অন্বয়াত্মক সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার কথা ঠিক্ হইত; কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিতাম যে, অন্বয়াত্মক সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিত্যক্ত স্থানে ব্যতিরেকাত্মক সম্বন্ধ মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হয়—যেহেতু মিলনের সম্বন্ধ রহিত করা'র নামই পরাঙ্মুখিতা-সম্বন্ধ সংস্থাপন করা। আমি তাই বলিয়াছি যে, "সকল" বলিলে বুঝায়—ব্যষ্টি সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রত্যেকে সমস্তের অন্তর্ভুক্ত; "প্রতি" বলিলে বুঝায়—ব্যষ্টি সমষ্টি হইতে (অর্থাৎ সাকল্য হইতে) মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য প্রজ্ঞাপন করিতেছে। ফলে, প্রতি ব্যক্তির আদিস্থিত "প্রতি" এই শব্দটীতে এক রকমের প্রতিপক্ষতা-অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; আর সে প্রতিপক্ষতা যে কি রকমের প্রতিপক্ষতা, তাহা আমি যথাসাধ্য স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে ত্রুটি করি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় আরো বলিলেন যে, প্রতি ব্যক্তির আদিতে যে "প্রতি" শব্দ দেখা যায় তাহা উপসর্গই নহে। তাঁহার এ কথা খুবই সত্য ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় নিজে কি বলিয়াছেন? তিনি তাঁহার বক্তৃতার গোড়াতেই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, উপসর্গ যখন মূল শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে তখনই বিশিষ্টরূপে তাহার নাম দেওয়া হয় উপসর্গ; পক্ষান্তরে, যখন

তাহা মূল-শব্দ হইতে বিযুক্ত থাকে, তখন তাহার আর একটা নাম দেওয়া হয়। তবেই হইতেছে যে, বৈয়াকরণিক নাম-ভেদে উপসর্গের অর্থ-ভেদ হয় না। উপসর্গের অর্থের বিচারই বর্ত্তমান প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য—তা বই তাহার নাম-ভেদ বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাজে কথারই সামিল। অর্জ্জুন ও অর্জ্জুন—বৃহন্নলাও অর্জ্জুন। বিরাট-রাজার ন্যায় একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বৃহন্নলার 'অর্জ্জুন' নাম শুনিলে চমকিয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির বৃহন্নলাকে "অর্জ্জুন" বলিয়া সম্বোধন করিলে সেজন্য তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, "প্রতি" উপসর্গ উপসর্গই থাকুক, আর, তাহা 'অব্যয়' মূর্ত্তিতেই বিরাজ করুক্—আমার নিকটে দুইই সমান; কেননা আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, উভয় স্থলেই তাহার মৌলিক অর্থ একই প্রকার। এমন কি, আমি মৌলিক অর্থের ঐক্য দেখিয়া অধি-উপসর্গ, ধি-শব্দ, এবং অধিক-শব্দ, তিনের মধ্যে বিশিষ্টরূপ ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে ইহা প্রথমে hypothisis স্বরূপে মানিয়া লইয়া, পরে যথোচিত প্রমাণ-প্রয়োগ-দ্বারা তাহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়াছি। প্রথমে পরিধি এবং অবধি এই দুই শব্দের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ দুই শব্দে ধি-শব্দের অর্থ সীমা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। তাহার পরে দেখাইয়াছি যে, অধিকার, অধিষ্ঠান প্রভৃতি শব্দে অধি-উপসর্গের অর্থ স্পষ্টই সীমাবসায়িতা। তাহার পরে, সীমা-ভাবের সহিত আধার-আধেয় ভাবের কিরূপ নিকট-সম্পর্ক তাহা দেখাইয়াছি। তাহার পরে দেখাইয়াছি যে, সেই সম্পর্ক-সূত্রে ধি-শব্দ কোথাও বা আধার-অর্থে কোথাও বা আধেয়-অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমার প্রদর্শিত এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তি গ্রাহ্যে না আনিয়া—ঐ-সকল যুক্তি-প্রদর্শন আমি যেন দেয়ালকে করিয়াছি এইরূপ উচ্চভাব ধারণ করিয়া—তদুপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় একটী কথা ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন;

সে কথা এই যে, ধি-শব্দ ধা-ধাতু হইতে হইয়াছে। অথচ, ধি-শব্দ যে, ধা-ধাতু হইতে হয় নাই এরূপ কথা আমি কোনো স্থানেই বলি নাই। ধি-শব্দ যে-ধাতু হইতেই হউক্ না কেন—তাহার অর্থ কি তাহাই বিচার্য্য। মূল ধাতুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও ভাষার শব্দ-গাঁথনি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ধি এবং ধা একই—বিধি এবং বিধান একই। বিধান কি? না ইংরাজিতে যাহাকে বলে rule। Rule টানা একপ্রকার সীমা নির্দেশ করা—লেখা যাহাতে পংক্তির বাহিরে না যায় সেই উপলক্ষে সীমা নির্দ্দেশ করা। কালিদাস বলিয়াছেন যে,

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাৎ আমনোর্বর্ত্মনঃ পরং ন ব্যতীয়ুঃ প্রজা স্তস্য নিয়ন্তর্নেমিবৃত্তয়ঃ।

এখানে কালিদাস মনুর বিধানকে প্রজাবর্গের আচার ব্যবহারের সীমা-নির্দেশক পথ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব অভিধানে ধা-ধাতুর অর্থ যাহাই থাকুক্ না কেন—ফলে দাঁড়াইতেছে যে, তাহার মৌলিক অর্থ সীমা-নির্দ্দেশ। ধি এবং ধা'র যখন একই রূপ অর্থ তখন আমি ধা'ও বলিতে পারি—ধি'ও বলিতে পারি। বলিয়াছি—ধি।

উপসর্গের অর্থ-বিচারের পরিবর্ত্তে উপসর্গের বৈয়াকরণিক মূলানুসন্ধান যদি আমার প্রবন্ধের ঘুণাক্ষরেও উদ্দেশ্য হইত, তবে ধা-ধাতু হইতে কিরূপে ধি-শব্দ, অধি-শব্দ এবং অধিক শব্দ তিনই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান-স্থলে, সে কার্য্যের ত্রুটির জন্য আমাকে দায়ী না করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নিজে তাহা সুনির্ব্বাহ করিলেই সমস্ত গোলোযোগ মিটিয়া যায়। তাঁহার নিজের মন্তব্য এবং কর্ত্তব্য কার্য্য আমি করি নাই বলিয়া সেই অপরাধে—আমার কর্ত্তব্য কার্য্য আমি যাহা করিয়াছি তাহা যদি সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া যায়—ধি, অধি এবং অধিক তিন শব্দের মৌলিক অর্থ সাদৃশ্য সম্বন্ধে এত যে যুক্তি এবং উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি সমস্তই যদি এক মুহূর্ত্তে কাঁচিয়া যায়—তবে উপসর্গের অর্থ-বিচারে প্রবৃত্ত না হওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিল।

অধি-শব্দ যে পূর্ব্বে এক সময়ে পৃথক্ শব্দাকারে ব্যবহৃত হইত, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় অস্বীকার করেনও না—করিতে পারেনও না;—যেহেতু উপনিষদের এক স্থানে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে "যদ্বিদিতাদথো অবিদিতাৎ অধি।" অধিক শব্দ আর কিছু না—কেবল অধি+ক। অন্তঃ এবং অন্তক এ দুই শব্দের মধ্যে যেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—অধি এবং অধিক এ-দুই শব্দের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ হইবারই কথা। আমি যথেষ্ট উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দেখাইয়াছি যে, অধি উপসর্গের অর্থ সীমাবসায়িতা; আর সেই সঙ্গে দেখাইয়াছি যে, অধিক-শব্দের অর্থ চরম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহা দেখিয়া কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, অধি-উপসর্গ এবং অধিক-শব্দ দুয়ের মধ্যে কোনো প্রকার মৌলিক সম্বন্ধ নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নিতান্তই ব্যাবহারিক practical। তাহা এই যে, বঙ্গভাষার ব্যবহারক্ষেত্রে সুবিবেচনাপূর্ব্বক উপসর্গ-প্রয়োগের পথ যথাসাধ্য পরিষ্কার করা; তা বই, যাহা বঙ্গভাষায় বেশী কাজে লাগে না—অথবা যাহা যথাবৎ প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হয় না—তাহার অর্থের দৌড় এবং উৎপত্তির বিবরণ লইয়া ব্যাপকতা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমি যে সু, দুঃ, অতি প্রভৃতি কতকগুলি উপসর্গকে বিচারের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছি তাহার কারণ এই যে, সেগুলির অর্থ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা একরূপ তেলা মাথায় তেল দেওয়া, অর্থাৎ তেল দেও উত্তম—না দেও কোনো ক্ষতি নাই। তবে কি? না আর আর গুরুতর কার্য্যের পথ আটক করিয়া দাঁড়াইয়া তেলা মাথায় তেল দেওয়া সুপরামর্শ-সিদ্ধ নহে।

পরা-উপসর্গ সম্বন্ধে, আমি আর একটু বিস্তার করিয়া বলিতে পারিতাম—বিস্তার করিয়া না বলা'র কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, পরা-উপসর্গের প্রয়োগ দেশীয় ভাষায় অতীব বিরল। পরাভব, পরাজয়, পরাক্রম, পরাহত, পরাঙ্মুখ, পরামর্শ (আর, তা ছাড়া আর গোটা দুই শব্দ যদি থাকে) এই এক মুষ্টি পরাপূর্ব্বক শব্দের জন্য পুঁথির পাতা বাড়াইবার বিশেষ বা প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। পরা-উপসর্গ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার

গোড়াতেই শাস্ত্রী মহাশয় ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, পর-শব্দ হইতে কিম্বা পার-শব্দ হইতে কি পরা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে? অর্থাৎ আমি যেন প্রকারান্তরে বলিয়াছি যে, পর-শব্দ কিম্বা পার-শব্দ হইতে পরা-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। তাল, নারিকেল এবং খেজুর এই সকল বৃক্ষের একইরূপ শাখাপত্রের ব্যবস্থা প্রণালী দেখিয়া আমি যদি বলি যে, উহাদের একটীর পুষ্টি এবং বর্দ্ধন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম বুঝিতে পারিলে, সেই সঙ্গে অপর গুলিরও তৎসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মের জ্ঞানলাভ হইতে পারে; তবে তাহার অর্থ এ নহে যে, তালগাছ হইতে নারিকেল গাছ হইয়াছে অথবা নারিকেল গাছ হইতে তালগাছ হইয়াছে। ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্বতন্ত্র, আর পিতাপুত্র সম্বন্ধ স্বতন্ত্র। তবে, ডারুইনের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে উহারা সকলেই একই অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সন্তান-সন্ততি সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আমার মন্তব্য কথা কেবল এই যে, পর, পার এবং পরা তিনের মূলগত ঐক্য থাকিবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না, যেহেতু তিনের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ট শব্দ-সাদৃশ্য, আর, তেমনিই ঘনিষ্ট অর্থ-সাদৃশ্য। কঠোপনিষদে আছে "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং" ইহার অর্থ এই যে, মনুষ্যবর্গের পরলোকে গতির বিষয় বালকের মনে (অর্থাৎ চঞ্চলমতি ব্যক্তির মনে) প্রতিভাত হয় না। সম্পরায়=সং+পরা+অয়; তাহার মধ্যে সং উপসর্গের লক্ষ্য সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি; পরা-উপসর্গের লক্ষ্য পৃথিবীর ও-পারের প্রতি —দূর দেশের প্রতি; আর, অয় শব্দের অর্থ স্পষ্টই গতি। "সম্পরায়" কিনা সমগ্র জন-সাধারণের দূরদেশে গতি অর্থাৎ পরলোকে গতি। পরা-উপসর্গ এইরূপ দূরত্ব প্রতিপাদক। পর-শব্দও যে দূরতা-ব্যঞ্জক তাহা আমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। ঘর এবং পর, এপার এবং ওপার, এই দুই কথার উল্লেখ মাত্রেই পর-শব্দের দূরতা-অর্থ আপামর সাধারণ সকলেরই মনে তৎক্ষণাৎ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত পর-শব্দের আর একটী সূক্ষ্ম-ভাবের দূরতা-অর্থ আছে; তাহা এইরূপ ঃ—

স্বার্থপর বলিলে বুঝায়—স্বার্থের দিকে যাহার সবিশেষ টান বা গতি। এই যে সটান গতি, ইহা একপ্রকার সাম্‌না-সাম্‌নি ভাবে সরল-রেখা-পথ অবলম্বন করে। এইরূপ সরল-রেখা-পথই জ্যামিতিক ভাষায় দূরত্ব বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। যাঁহারা সূক্ষ্ম বিচারে নারাজ তাঁহাদের পক্ষে ঘর এবং পর—এপার এবং পরপার—এই স্থূল দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। সেতারে গৎ বাজাইবার সময় মিড়ের প্রয়োজন হয় না, রাগ-রাগিণীর আলাপচারি করিবার সময়েই মিড় কাজে লাগে। যাঁহারা আলাপচারি করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের উপকারার্থেই আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম। সেতারের মিড় যেমন এক সুর মাড়াইয়া আর এক সুরে অলক্ষিত পদসঞ্চারে বিলীন হয়, তেমনি পর এবং পার এই দুই শব্দের 'সটান গতি' এই অর্থ অলক্ষিত পদসঞ্চারে দূরতা অর্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কুমার-সম্ভবে মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গের বর্ণনা-স্থলে আছে—"ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি" অর্থাৎ দৃষ্টি-ছটা প্রেরণ করিলেন। ব্যাপার=বি+আ+পার এবং তাহার অর্থ প্রেরণ-ক্রিয়া। এইরূপ প্রেরণ-ভাবের

দূরত্বের ভাব কেমন লপেটভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহা সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এইসকল ঠাস্ বুনানির কোন্ অবয়বের পর কোন্ অবয়ব তাহা দেখিবা মাত্রই চক্ষে ধরা পড়ে, কিন্তু তাহার সূত্রগুলি টানাটানি করিয়া খুলিতে গেলে সমস্তই জটা পাকাইয়া যায়। অতএব, পর, পার এবং পরা তিনের মৌলিক অর্থ যে, একই রূপ, তাহা সোজা ভাবে স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই জলের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে;—বাদ-প্রতিবাদের টানাটানিতে উহাদের ঐ সোজা মৌলিক অর্থ জটিল হইয়া পড়িলে, তখন তাহা কাহারো কোনো উপকারে আসিবে না।

সর্ব্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে, উপসর্গের অর্থ-বিচারের যুক্তি-পদ্ধতি দুইরূপ হইতে পারে:—

(১) Scholastic deduction এবং (২) Baconian induction। এযাবৎকাল প্রথম পদ্ধতিটীই আমাদের দেশের পণ্ডিত-মহলে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে;—সুতরাং দ্বিতীয় পদ্ধতিটী বৈয়াকরণিকদিগের মনঃপূত না হইবারই কথা। আমি ঐ দুই যুক্তি-পদ্ধতির কোন্‌টী অবলম্বন করিয়া উপসর্গের বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা আমার পূর্ব্ব-পঠিত প্রবন্ধাংশের গোড়াতেই স্পষ্টাক্ষরে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সেই গোড়ার বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় বোধ করি আমার উপর ওরূপ চড়াও হইতেন না। Baconian পদ্ধতি এই যে, অগ্রে প্রচলিত facts সংগ্রহ, পরে তাহার উপর theory সংগঠন;—আমি তাহাই করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। Scholastic পদ্ধতি এই যে, অগ্রে বারো মুনির বারো theoryর কোনো একটী theoryকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা, পরে factকে গড়িয়া পিটিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া দেওয়া। fact কিনা বৃত্তান্ত, theory কিনা সিদ্ধান্ত। Baconion পদ্ধতির আগে বৃত্তান্ত, পরে সিদ্ধান্ত; scholastic পদ্ধতির আগে সিদ্ধান্ত পরে বৃত্তান্ত। শেষোক্ত পদ্ধতির ফলদায়কতা কঠোর সত্যের অগ্নি-পরীক্ষায় জর্জ্জরিত হইয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে—কাজেই পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি ভিন্ন বিজ্ঞানের আর গত্যন্তর নাই। এ যাহা বলিলাম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি যে-কিছু ফললাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি সমস্তই Baconian induction পদ্ধতির প্রসাদাৎ।]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা।

এই গ্রন্থখানি পুরাতন গালদহের এক বর্ণক ব্রাহ্মণের বাটীতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচয়িতার নাম রঘুনাথ। রঘুনাথ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার উপাধি কি ছিল, জানা যায় নাই। গ্রন্থের প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই। উহাতে সম্ভবতঃ কবির পরিচয় লিখিত ছিল। যে সময়ে তৈলঙ্গ মুকুন্দদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে কবি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মুকুন্দদেবের রাজ্যনাশের পরও গ্রন্থে কোন কোন কথা যোগ করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম ভাগে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ শ্রীগুরুদেবচরণেভ্যো নমঃ ॥ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং ॥ দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ। ১। ঃ॥ নিগমকল্পতরোগ'লিতং ফলং শুক-মুখাদমৃতং দ্রবসংযুতং। পিবত ভাগবতরসমালয়ং মুহু রহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ। ২ ॥

প্রণমহুঁ নারায়ণ অনাদি নিধন। সৃষ্টির পালন মূর্ত্তি পরম কারণ ॥
মায়ারূপে জগত কলুষ উদ্ধারিল। ব্যক্ত হৈঞাঁ মুনিগণ সন্তর্পণ কৈল ॥
না বুঝে ইঙ্গিত যার দেব প্রজাপতি। পুনঃ পুনঃ সে দেবকে করিএ প্রণতি ॥
গণপতি প্রণমহুঁ বিঘ্ন বিনাশন। ভগবতী দেবীর সে বন্দহুঁ চরণ ॥
যার অনুভাবে হএ সরস কবিতা। শ্রুতি স্মৃতি অবিদিত বচন দেবতা ॥
আদি কবি বাল্মীকের বন্দহুঁ চরণ। জনক জননী বন্দো আদি গুরুজন ॥
সভা সভাপতির করিএ পরিহার। ক্ষেমিহ সকল দোষ কবিত্বে আক্ষার ॥
ক্ষার জল জলধরে বরিষে সুধা করি। সুপণ্ডিতে গুণ লএ দোষ পরিহরি ॥
ব্রহ্মার সৃজন দোষ গুণেত জড়িত। স্থাবর জঙ্গম আদি নানা দেশ উপনীত ॥
উৎকল পুণ্যদেশে অদ্ভুত কথন। জার্ত জগন্নাথরূপে বৈসে নারায়ণ ॥
নানাদেশ আচ্ছাদিল ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা। পরম বৈষ্ণব সূর্য্যবংশে মহাতেজা ॥
কুনো রাজা দানে বলী কর্ণের সমান। কুনো রাজা জন যুধিষ্ঠিরের গেয়ান্ ॥
সেই রাজা স্বর্গে গেলা সাধি নিজ কাজ। তেন নৃপ মুকুন্দ হইলা মহারাজ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা আদি জিনি সব গুণে। পৃথিবীর রাজা সব জিনিলেক দানে ॥
নিজ কুল-কমল-মিহির-মহাবংশ। দিগন্তর ভ্রমে যার সিতযশোহংস ॥
প্রচণ্ড প্রতাপ বীর পরম সুধীর। আপনিই গঙ্গা যারে দিল গঙ্গানীর ॥
উৎকলের যত রাজা না কৈল যেই কর্ম্ম। শ্রীযুত মুকুন্দদেব সাধিল সেই ধর্ম্ম ॥
মুকুন্দ রাজার গুণ শুনিঞাঁ শ্রবণে। বাঢ়িল বিনোদ বড় শ্রবণ নয়নে ॥
কুন গুণে মহারাজা হইবু গোচর। হৃদয়ে চিন্তিএ সার করহু অন্তর ॥"

ইহার পর প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাই। দুইখানি পত্র বুড়িয়া একখানি ধরা হইয়াছে

এবং তাহার শেষখানিতে অঙ্কপাত করা হইয়াছে। এই শেষখানিতে গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় পত্রে আছে,—

"অশ্বমেধ পুণ্য কথা বিবিধ প্রসঙ্গ। যাতে অশ্বরক্ষক কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গ॥
শ্রীভাগবতে শুনি কৈল প্রবন্ধ পাঞ্চালী। শ্রীমহারাজ কিছু অবধান করি॥
—সগুণ রাজ্যে ভোগ চিরকাল। এহিতে শুনিলে ভক্তি বাঢ়ে তৎকাল॥
শ্রীরঘুনাথ বিপ্র কুলে উৎপত্তি। আইলুঁ তোমার দেশে গুণ শুনি অতি॥
চিরকাল রাজ্য কর উৎকল মাঝে। পাঞ্চালী রচিয়া আইলুঁ তোমার সমাজে॥
অশ্বমেধ পাঞ্চালী সে করিঞা কৌতুকে। আজ্ঞা দেহ আহ্মি পঢ়ি তুমার সভাতে॥
শুনিঞাঁ বিপ্রের বোল রাজা হরষিতে। আজ্ঞা দিল ব্রাহ্মণকে পাঞ্চালী পঢ়িতে॥
তখন সে নারায়ণীকে করিল স্মরণ। পদ ছন্দে পঢ়েন্ত যত বীরের চরণ॥"

গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই ভণিতা,—

"অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃতলহরী। পিবন্ত ভকত জন কর্ণঘট ভরি॥
শ্রীযুত মুকুন্দদেব নৃপ শিরোমণি। পরম বৈষ্ণব দানে বলি কর্ণ জিনি॥
উৎকল দেশনাথ যেন কল্পতরু। প্রচণ্ড প্রতাপ জ্ঞানে যেন সুরগুরু॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সম যার যশের মহিমা। প্রজার পালক যার যশের নাহি সীমা॥
চিরদিন রাজ্য করি হৈল অকল্যাণ। অশ্বমেধ পর্ব্বকথা শ্রীরঘুনাথ ভাণ॥"

প্রাগুক্ত কবিতাগুলি পাঠে অবগত হওয়া যায়; গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করিয়া উৎকলেশ্বর মুকুন্দদেবের সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। মুকুন্দদেবের অকল্যাণ হইয়াছিল। সে অকল্যাণ কি? মুকুন্দদেব ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের পাঠানরাজগণ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন। তখন সোলেমান কররাণী গৌড়ের রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রেরিত সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত যুদ্ধে মুকুন্দদেব পরাজিত হন। রঘুনাথ এই ঘটনার পরে আপন গ্রন্থের সম্পূর্ণতা বিধান করেন। গ্রন্থের রচনা মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে হইয়াছিল, ইহা অনুমিত হইতে পারে।

আমরা হস্তলিখিত যে গ্রন্থখানি পাইয়াছি, তাহা ১০৩১ সালে লিখিত। অতএব গ্রন্থখানি বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের একখানি। পুথিখানি ২৭৪ বৎসরের পুরাতন। কাশীরাম দাসের সময় নির্ণয়ে গোল রহিয়াছে। কাশীরামের গ্রন্থে নানাজনের হাত পড়ায় উহার আদি অবস্থা জানা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। রঘুনাথের অশ্বমেধপঞ্চালিকায় কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। লেখকের দোষে, কোন কোন অংশ যে পরিবর্ত্তিত না হইয়াছে এমন নয়। গ্রন্থের শেষ অংশ এইরূপ,—

"——ইতি শ্রীমহাভারতে পঞ্চালিকা প্রবন্ধে শ্রীরঘুনাথ কৃতৌ অশ্বমেধ পর্ব্বং সমাপ্তেতি॥*॥ শ্রীরস্তু শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৪৬ শকে ১০৩১ সাল। তারিখ ১৩ মাহ শ্রাবণ। কৃষ্ণাদশম্যাং তিথৌ বেলা প্রহর তিন উপরান্ত॥ রোজ সোমবার॥ ফতেয়পুরগ্রামনিবাসীয় শ্রীগৌরীদাস সাহু পুস্তকমিতি॥ জাম্বুকী গ্রামেন লিখিতং সৌ কুলে জন্ম ফতেপুরনিবাসীয় শ্রীগৌরী-

দাসস্য লিখিতমিতি ॥ ভগ্নপৃষ্ঠ কটিগ্রীব স্তব্ধদৃষ্টিরধোমুখঃ দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং শোধয়িষ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। ভীষ্মস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। শ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ। শ্রীমহাদেব্যৈ নমঃ ॥ শ্রীগুরুদেবচরণেভ্যো নমঃ ॥ পিতামাতা চরণেভ্যো নমঃ ॥"

গ্রন্থকার কাশীরাম দাসের পূর্ব্বতন কি অধস্তন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, বোধ হয়, পূর্ব্বতন লোক। কোথায় বাস করিতেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। রাঢ়ের কি মালদহের লোক তাহা বলা যায় না। তাঁহার ব্যবহৃত অনেক গ্রাম্য শব্দ মালদহ জেলার ভাষায় দৃষ্ট হয়। যে গৌরীদাস সাহর এই পুস্তক তাঁহার নিবাস ফতেপুর। এই গ্রাম পুরাতন মালদহের নিকট ছিল, এখানে এখন লোকের বাস নাই। চৈতন্যের নামে পাগল মালদহের লোক, চৈতন্যের নামও করে নাই। বোধ হয়, গ্রন্থলেখনের সময় মালদহের লোক এখনকার ন্যায় বৈষ্ণব হয় নাই।

এই গ্রন্থ, জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব্ব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। যথা ঃ—

"অশ্বমেধ পুণ্য কথা, বিচিত্র প্রবন্ধ গাথা, মন দিয়া শুনে পুণ্যবান্।
নাশ যায় পাপচয়, পুণ্য হয় অতিশয়, জৈমিনি সংহিতা বচন ॥"

এই গ্রন্থে কেবল পয়ার ও ত্রিপদীছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পয়ার ও ত্রিপদী নামকরণ হয় নাই। পয়ারকে হ্রস্ব ছন্দ এবং ত্রিপদীকে দীর্ঘ ছন্দ বলা হইয়াছে। পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরী নিয়ম সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষর অপেক্ষা অধিক বা অল্প অক্ষরেও পয়ারের চরণ রচিত হইয়াছে। যথা,—

(১) "হেন সে ঘোটক আদি নাহি দেখি কুনো কালে।"

(২) "ত্রেতাযুগে ছিলা রাম সেনাপতি।"

অধিকাংশ স্থলে "কে" ও "তে" বিভক্তির স্থানে "ক" ও "ত" ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা "ঘোড়াকে" ও "বেদেতে" না বলিয়া "ঘোড়াক" ও "বেদেত" বলা হইয়াছে।

"যথা" শব্দের স্থলে "জাত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

"জাত জগন্নাথ রূপে বৈসে নারায়ণ।"

"বলিলেন," "দেখেন," করিলেন" প্রভৃতি নকারান্ত ক্রিয়াপদের স্থলে "বলিলেন্ত," "দেখেন্ত," "করিলেন্ত" ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

"পদ ছন্দে পঢ়েন্ত যত বীরের চরণ।"

"ইয়া" প্রত্যয়ের স্থলে ঞিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে,—যথা—"করিয়া," "বুলিয়া," "খাইয়া" স্থলে "করিঞা," "বুলিঞা," "খাইঞা" প্রভৃতি।

"উক" প্রত্যয়ের স্থলে "উ" বা "ঔক" ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন "ধরুক" ও "সহুক" না বলিয়া "ধরৌ," "সহৌক" ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রথমা বিভক্তির এক বচনে কখন কখন "এ" ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা "রাজা" না বলিয়া "রাজাএ" বলা হইয়াছে।

কোন কোন স্থলে "চাও," "কও" প্রভৃতি ক্রিয়া পদের স্থলে "চাহসি" "কহসি" প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৈষ্ণব গ্রন্থের ন্যায় এই পুস্তকে "দেবদেবী" না বলিয়া "দেবাদেবী" বলা হইয়াছে।

পুরাতন বৈষ্ণব গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র "পড়িল," "বাড়িল," "চড়িল" প্রভৃতি স্থানে "পড়িল," "বাঢ়িল" ও "চঢ়িল" প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। যথা—"আঠান্তরে," "সম্বায়," "মুকায়" প্রভৃতি।

কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্ব্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম। কোন কোন স্থানে সুন্দর মিল আছে, কেবল দুটী একত্র মাত্র শব্দ পৃথক্। বলিতে পারিনা, কে কার নিকট ঋণী। গ্রন্থকার যে দেশের লোক, সে দেশে তখন মুসলমান রাজত্বের পূর্ণ প্রতাপ। পুরস্কার পাওয়ার আশায় গ্রন্থকার, উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। পরের রচনা একটু বদলাইয়া নিজের বলিয়া পরিচিত করিতে কি তাঁহার সাহস হইয়াছিল? নানা কারণে অনুমিত হয়, রঘুনাথ, কাশীরামের পূর্ব্বতন লোক। কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণে বর্ণিত রামাশ্বমেধের বর্ণনা আছে। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

"ত্রেতাযুগে ছিলা রাম নরপতি। বিষ্ণু অবতার দশরথের সন্ততি॥
তার পত্নী সীতা যদি রাবণে হরিল। সপুত্র বান্ধব রাম তাক সংহারিল॥
অনল পরীক্ষা দিয়া আনিলেন্তি সীতা। জনকনন্দিনী সতী অতি সুচরিতা॥
সীতাক লইয়া শ্রীরাম কমললোচন। * * অযোধ্যাঞে করিল গমন॥
বিভীষণ আদি করি রাক্ষস প্রভৃতি। আইলা সুগ্রীব নামে বানরের পতি॥
দেশে আসি রাম আইলা অযোধ্যানগরে। বহুকাল রাম রাজা সুখে রাজ্য করে॥
কিঙ্কর সোদর দ্বারে বহু নৃপগণ। পুত্রসম করে রাজা প্রজার পালন॥
তিন বজ্রসম বাক্য রাম নিয়োজিল। বলাবল করিতে কেহ কাকো না পারিল॥
রাজ্য পালিতে রামের আছিল হেন মতি। চারিযুগে তার সম নাহি ছিল নৃপতি॥
নব সহস্র বৎসর সে নিত্য ব্যবহার। রাজ্য করে রাম রাজা বিষ্ণু অবতার॥
কতো কালে রাম রাজার পুত্র না হৈল। হৃদয়েত শ্রীরামের দুঃখ উপজিল॥
বশিষ্ঠ সে নামে রাজার কুলপুরোহিত। শ্রীরামের পুত্র হেতু মন্ত্র জপে নিত॥
তবে সে জানকী দেবী হৈলা গর্ভবতী। শ্রবণার শেষ পাদে গর্ভ উৎপত্তি॥
গর্ভবতী হৈঞা সীতা আছে চারি মাস। কেলি কুতূহলে ছিলা শ্রীরামের পাশ॥
পঞ্চমাসে শ্রীরাম সে এ স্বপ্ন দেখিল। গঙ্গাতীরে সীতা লৈঞা লক্ষ্মণ এড়িল।
"শোকে সে বিলাপ সীতা করে গঙ্গাতীর। হেন স্বপ্ন দেখি যে শ্রীরাম মহাবীর॥
বশিষ্ঠকে স্বপ্ন রাম কহিল সকল। যেন স্বপ্ন দেখিলেন্ত রাম মহাবল॥
এতেক কহিঞা রাম স্থির কৈলা মতি। পুংসবন কর্ম্ম দেখিল হইল সম্প্রীতি॥

শ্রীরাম বোলেন্ত শুন কুলপুরোহিত।
রাজার বচন শুনি কহে ব্যবহার।
এ পুষ্প নক্ষত্রে রাম কর পুংসবন।
মুনির বচন শুনি রাম নরপতি।
পঞ্চ দিবসে আমি করি পুংসবন।
গুরু মোর বিশ্বামিত্র আনহ সত্বর।
রামের বচন শুনি সুমিত্রা নন্দন।
শিল্পী চিত্রগণ সব আনি শীঘ্রগতি।
বিশ্বামিত্র মুনি আইলা রাম সন্নিধানে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা রাম দুহাক অর্চ্চিল।
সীতার সহিত রাম যজ্ঞের মণ্ডপে।
বেদের বিধানে পুংসবন সে করিল।
জনক রাজার আর নাহিকে তনয়।
ই কারণে নিজ রাজ্য শ্রীরামকে দিল।
তপোবনে প্রবেশিল জনক নৃপতি।
যজ্ঞের মণ্ডপ বিপ্রগণ নমস্করি।
শয়নে আছেন্ত রাম পালঙ্ক উপরে।
শ্রীরামে পুছিল সীতা কহ অভিলাষ।
সীতা বোলে তোমার প্রসাদে প্রভুবর।
আর কুন দ্রব্য নাহি মোর প্রতি আশ।
তপোবনে যাই যথা ভাগীরথী-তীর।
সীতার বচনে রাম হাসিতে বুলিল।
পুন বন যাইতে শ্রদ্ধা হইল তুমার।
ই বলিয়া নিদ্রা গেলা রাম মহাশয়।
রজনীত বেড়ায় নগরে সহচর।
* * * রজনীত প্রসঙ্গ শুনিল।
শ্রীরামকে চরে কহে নিভৃত কাহিনী।
সত্য কর চর মোরে অসত্য পরিহরি।
মোর কুন দোষ গুণ বোলে লোকজন।
সীতার কহেন্ত লোক কুন গুণদোষ।
স্বরূপ বচন কহ প্রজার পালন।
রামের বচনে এক চরে কহে কথা।
সীতার পুংসবন চাহ দিবস বিহিত॥
পঞ্চ দিবস লগ্ন আছয়ে এহার॥
তার অনুরূপ তুমার হইব নন্দন॥
লক্ষ্মণকে ডাক দিয়া বোলে শীঘ্রগতি॥
জনক রাজাকে আন করিঞা যতন॥
চলহ লক্ষ্মণ ঝাটে বিলম্ব না কর॥
শ্রীরামকে প্রণমিঞা চলে ততিক্ষণ॥
বিচিত্র মণ্ডপ সব তোলে শীঘ্রগতি॥
জনক লইঞা আইল সুমিত্রা নন্দনে॥
বশিষ্ঠ মুনিএ তব যজ্ঞ আরম্ভিল॥
সবান্ধবে বৈসে রাম উপরে চন্দ্রাতপে॥
বহুধনে রাম সে মুনিক তুষ্ট কৈল॥
দুহিতা জানকী রাম জামাতা মহাশয়॥
বিশ্বামিত্র সঙ্গে রাজা তপোবনে চলিল॥
পাইল শ্বশুর দেশ রাম মহামতি॥
সীতার সহিত রাম গেলা নিজ পুরী॥
বসিয়াছে সীতাদেবী রামের গোচরে॥
কুন দ্রব্য থাকে নিতে তোর প্রতি আশ॥
ত্রিভুবনের দ্রব্য আছে আমার সে ঘর॥
সবে এক বস্তু প্রতি আছে অভিলাষ॥
মুনিপত্নী দেখে গিঞা আশ্রম সুরুচির॥
এতকালে বনবাসে সন্তোষ না হৈল॥
হউক যাইহ কালি ভাগীরথী পার॥
বাহির হইল রাম প্রভাত সময়॥
প্রভাতে কহেন্ত * * শ্রী * *॥
সকল রহস্য আসি রামকে কহিল॥
পুন জিজ্ঞাসিল সে শ্রী * * *॥
দোষ গুণ কিবা বোলে অযোধ্যা নগরী॥
কোন দোষ * * * বোলে ভ্রাতৃগণ॥
মোর কুন গুণতে প্রজার পরিতোষ॥
* * * * *॥
তাহার বচনে রামের নাহিকে অন্যথা॥

সর্ব্ব প্রজানাথ গোসাঞী বলে মহাবল। তুমা সম কেহো নহে পৃথিবী ভিতর ॥
সর্ব্বগুণে তুমাক প্রশংসে সর্ব্বলোক। এক বোল শুনি আজি পাইনু বড় শোক ॥
এক সে রজক নারী কলহ করিঞা। বাপের ঘরতে গেল স্বামীক এড়িয়া ॥
চারি দিন ছিল বাপের ঘরে গিঞা। সুচরিতে ছিল বাপ মাঅ আনন্দিঞা ॥
আর দিন তার বাপ সংহতি করিঞা। বন্ধু সঙ্গে তার ঘরে কন্যা দিল নিঞা ॥
তবে তাগ দেখিঞা রুষিল তার পতি। চারি দিন নাহি তুঞি আমার সংহতি ॥
নারী হৈঞা পর ঘরে থাকে এক রাতি। পুরুষে কি করিতে পারে তাহার শকতি ॥
তুমাক বর্জ্জিল আমি যাহ বাপ স্থানে। রাম রাজা হেন আমি না চিন্তিহ মনে ॥"

স্থানান্তরে—

"নয়ন অগোচর যদি হইল লক্ষ্মণ। মুর্চ্ছিতা হৈঞা সীতা পড়িলা তখন ॥
বনে পশু পক্ষী সব টাকে অতুলিত। সে সব শুনিয়া সীতা পাইলে সম্বিত ॥
চেতন পাইয়া সীতা কান্দে উচ্চস্বরে। হরিণী কাতর যেন ফুটি বিদ্ধশরে ॥
সীতার ক্রন্দন শুনি বনে পশুগণ। ছাড়িয়া আহার পানী চাহে ঘন ঘন ॥
"মহাশোকে কান্দে দেবী ছাড়ি দীর্ঘ নাদে। সঙ্গ ভঙ্গ মৃগ যেন সঙ্গ নাহি বান্ধে ॥
চমকিত নয়ন দেখি চাহে স্থানে স্থান। বন পশু পক্ষী দেখি ভয়ে কম্পমান ॥
কুশের কণ্টক তার ফুটিল চরণে। আকুল হইঞা সব দেখে দেবগণে ॥
ক্ষণে হাটে ক্ষণে কান্দে বনে একাকিনী। যোড় হারাইঞা যেন কাতর হরিণী ॥

স্থানান্তরে—

"রথে আরোহণ করি সুমিত্রা কুমার। রহ রহ করি দিল ধনুর টঙ্কার ॥
অকালে জলদ যেন করিল গর্জ্জন। ধনুর টঙ্কার ভয় পাইল ত্রিভুবন ॥
ক্রুদ্ধ হৈঞা আইল বীর রণ করিবার। হাসএ কুমার লব ভয় নাহি তার ॥
একবারে যোড়ে বীর একাদশ বাণে। চারি বাণে চারি ঘোড়া কাটিল তামনে ॥
আর বাণে কাটিল হাতের ধনুর্ব্বাণ। চারি বাণে রথের চাকা কৈল খান খান ॥"

স্থানান্তরে

"যে জন দুর্ব্বল হয়, সেহি চাহে পরিচয়, বলবন্ত করএ সংগ্রাম।
বীর পথে এড় যবে, পরিচয় করি তবে, তত্ত্ব কথা শুন কহি রাম ॥
আমি দুই কুশ লব, সীতার উদর সম্ভব, মুনিগণ জন মেলি বসি।
ধনুর্বিদ্যা বেদ মন্ত্র, জানিল সকল তন্ত্র, গুরু মোর বাল্মীক মহাঋষি ॥
রামায়ণ বেদ পাঠ, যে মুনির চিন তাক, আমা দুই ভাইরে পঢ়াইল।
সেই মহাপুণ্য অতি, মহামুনি সন্নিহতি, আমি দুই সতত পাইল ॥"

উদ্ধৃত অংশের কেবল বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিয়াছি। গ্রন্থের কোন কোন পত্রের

স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য পড়িতে পারা যায় না। গ্রন্থের কোন কোন স্থানের অর্থবোধ হয় না। রচনা স্থানে স্থানে মনোহর।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

গৌড়াধিপ মদনপালের তাম্রশাসন।

পালবংশীয় রাজগণের প্রদত্ত এপর্য্যন্ত ৫ খানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই কয়খানির উপর নির্ভর করিয়া রাজা রাজেন্দ্রলাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম ও কিল্‌হোর্ণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পালবংশীয়গণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতে কি অনির্দ্দিষ্ট-কালজ্ঞাপক সেই কয়খানি তাম্রশাসন হইতে তাঁহারা কেহই আশানুরূপ ইতিহাস সংগ্রহে সুবিধা করিতে পারেন নাই। তবে এইমাত্র বলিতে হইবে যে পূর্ব্বে পালরাজগণের বংশাবলী সম্বন্ধে যে সকল অমূলক প্রবাদ প্রচলিত ছিল, তাহা ভঞ্জন করিতে ঐ সকল সাময়িক লিপি অনেকটা সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু পালরাজগণের প্রকৃত ইতিহাসের সুশৃঙ্খলা স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। আজ আনন্দের সহিত যে তাম্রশাসন খানির পরিচয় দিতেছি, তিমিরাবৃত পালরাজগণের ইতিহাসে এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি অনেকটা সত্যালোক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই আজ আমরা এই অত্যাবশ্যক তাম্রশাসনখানির সমস্ত পাঠোদ্ধার করিয়া ইতিহাসপ্রিয় সুহৃদ্বর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। বেশী দিনের কথা নয়, দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় দিনাজপুর হইতে দুইখানি খোদিত তাম্রফলক সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়ে অর্পণ করিয়াছেন। এতন্মধ্যে একখানি মহীপালদেবের প্রদত্ত ও অপর খানি আমাদের আলোচ্য মদনপালদেবের তাম্রশাসন। মহীপালের তাম্রশাসন ছাড়িয়া এখন কেবল আমরা মদনপালদেবের তাম্রশাসন সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

কিরূপে এই তাম্রশাসন খানি সাহিত্যানুরাগী বসু মহাশয়ের হস্তগত হইল, এখনও তাহার সকল সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তিনি শীঘ্রই লিখিয়া পাঠাইবেন, এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। তখন সকলে জানিতে পারিবেন।

যতদূর দেখিলাম, এই তাম্রশাসন খানির বিষয় অধিকাংশই সম্পূর্ণ নূতন ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখানির পরিচয় এ পর্য্যন্ত আর কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই; এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

এই তাম্রশাসন একখানি ফলকে উৎকীর্ণ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫½ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ১৫ ইঞ্চ ইহার উভয় পৃষ্ঠায় লিপি আছে।

লাঞ্ছন।—তাম্রশাসনের ঊর্দ্ধভাগে পালরাজগণের রাজচিহ্নজ্ঞাপক লাঞ্ছন মূল-ফলকের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে। মূল ফলক ছাড়াইয়া ইহা ৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সম্মুখভাগ চারিদিক্ পাতালতা ও শঙ্খঘণ্টাদি দ্বারা অলঙ্কৃত; এই অংশের মধ্যস্থানে লাঞ্ছন বা রাজচিহ্ন। উহা একটী গোলাকার চক্রমধ্যে উৎকীর্ণ; ইহার মধ্যভাগ ক্ষুদ্র তারাচিহ্নরূপ দুই সারি সমরেখা দ্বারা দুই ভাগ করা হইয়াছে। তাহার ঊর্দ্ধভাগে মধ্যস্থলে ধর্ম্মচক্র, তাহার দুই পার্শ্বে চক্রাভিমুখী দুইটী মৃগমূর্ত্তি। রেখার নিম্নে উচ্চাক্ষরে "শ্রীমদনপালস্য" এই শব্দ লেখা আছে।

অক্ষরবিন্যাস।—প্রায় আটশত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যেরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, এই তাম্রশাসনখানি সেই অক্ষরে লিখিত। ইহার কতকগুলি অক্ষর মৈথিল অক্ষরের সদৃশ; কতকগুলি বর্ণ কুটিলাক্ষরের অনুরূপ। ডাক্তার বেণ্ডল নেপাল হইতে গৌড়াধিপ গোবিন্দপালদেবের সময়ে লিখিত যে তালপত্রের পুথি বাহির করিয়া প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন, আলোচ্য তাম্রশাসনের লিপিবিন্যাস অবিকল তদনুরূপ। ডাক্তার বেণ্ডল এই লিপিকেই প্রাচীনতম বঙ্গাক্ষর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

অক্ষরবিন্যাস সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আছে—

অন্তস্থ 'ব' ও বর্গীয় 'ব' সর্ব্বত্রই একরূপ, কেবল অন্তস্থ "ব্" ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী মহীপালদেবের তাম্রশাসনে যেরূপ 'ধ' আছে, ইহার একস্থানে কেবল সেইরূপ প্রাচীন আকারের 'ধ' দৃষ্ট হইল[২]। রেফের পর অধিকাংশ স্থানেই ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্বরূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে; কোথাও রেফ উঠে নাই, কিন্তু প্রায় সেই সেই স্থানে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব আছে। কোথাও 'দ' এবং 'হ' এক রকম উঠিয়াছে। অধিকাংশ স্থানেই 'ন' অক্ষরের স্বতন্ত্র রূপই গৃহীত, আবার কোথাও 'ন' এবং 'ত' এক রকমই খোদা হইয়াছে। 'ঘ' এবং 'প'বর্গে' বড় একটা পার্থক্য নাই। 'শ'র পরিবর্ত্তে কএক স্থানে 'স' লিখিত হইয়াছে। ছয় স্থানে অবগ্রহ চিহ্ন দৃষ্ট হইল।

পালরাজগণের নাম।—ইতিপূর্ব্বে কিল্‌হোর্ণ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পালরাজগণের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ধারাবাহিকরূপে মোট ১১ জন পাল রাজার নাম পাওয়া যায়।[৩] কিন্তু আমাদের আলোচ্য তাম্রশাসনে ধারাবাহিকরূপে ১৭ জন রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। পর পৃষ্ঠায় বংশতালিকা উদ্ধৃত হইল—

---

(১) C. Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit MSS, p. iii and plate II, no 4.

(২) ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1891, part I, p. 77-79.

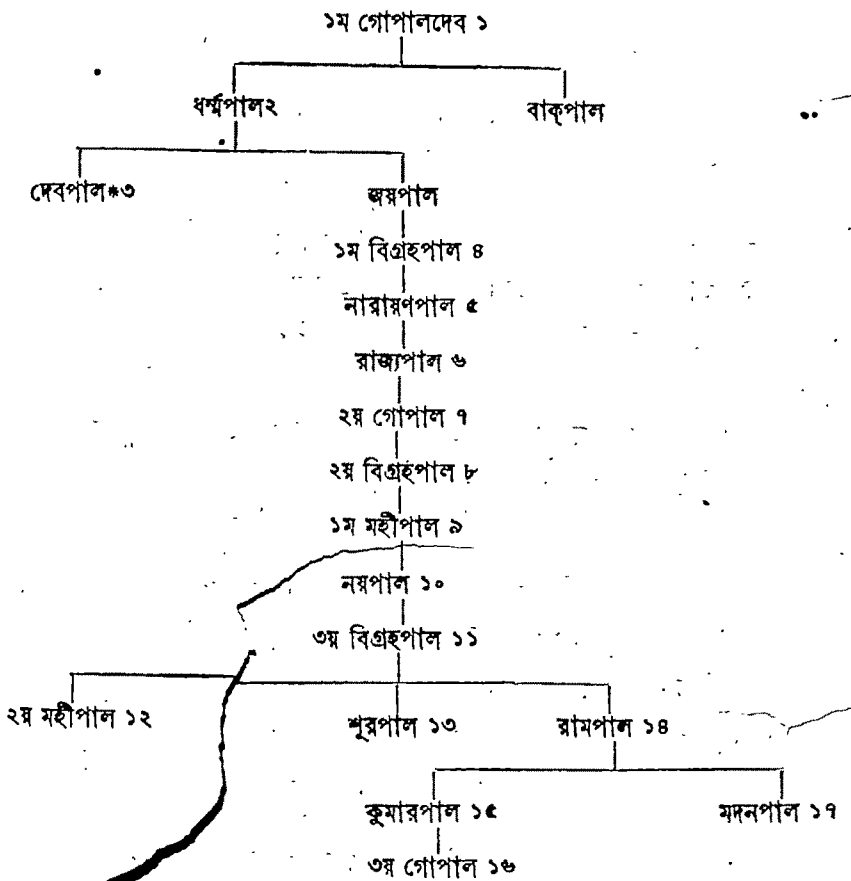

এই ১৭ জন রাজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কে কোন্ সময়ে কতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা এই তাম্রফলকে বর্ণিত হয় নাই।[১] মদনপালদেবের পট্টমহিষী চিত্রমতিকা বটেশ্বরস্বামী নামক একজন ব্রাহ্মণকে মহাভারত পাঠে নিযুক্ত করেন, ভারতপাঠের দক্ষিণাস্বরূপ গৌড়াধিপ মদনপাল উক্ত ব্রাহ্মণকে বর্ত্তমান তাম্রশাসন দান করেন। বর্ত্তমান শাসনের দূতক মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব। মদনপালের রাজত্বের ৮ম বর্ষে তথাগতসর নামক শিল্পিকর্ত্তৃক এই তাম্রফলক উৎকীর্ণ হয়। মূল তাম্রশাসনের যথাদৃষ্ট পাঠ ও অনুবাদ পরে প্রকাশিত হইল।

---

* ৪র্থ শ্লোকের অনুবাদিত অংশের টীকা দ্রষ্টব্য।

(১) পালরাজগণের কাল-নির্ণয় ও বিস্তৃত ইতিহাস স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

(সম্মুখভাগ।)

শ্রীমদনপালস্য।

(১ম পংক্তি) ওঁ নমো বুদ্ধায় ॥ স্বস্তি ॥

মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক্‌সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলঃ[১]-ক্ষালি-
(২য় পংক্তি) তাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তীং[২]
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেব
(৩য় পংক্তি) ঃ ॥[১]
লক্ষ্মীজন্মনিকেতনং সমকরোদ্বোঢ়[৩] ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং
পক্ষচ্ছেদভয়াদুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাং।
মর্য্যাদাপরিপালনৈকনি-
(৪র্থ পংক্তি) রতঃ শৌর্য্যালয়োঽস্মাদ্‌ভূ[৪]
দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসবাসবসতিঃ শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ ॥[২]
রামস্যেব গৃহীত সত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ[৫]
(৫ম পংক্তি) সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ [।]
যঃ শ্রীমান্ নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভির-
(৬ষ্ঠ পংক্তি) করোদেকাৎপত্রা[৬] দিশঃ ॥[৩]
তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুমানঃ[৭]
পুত্রো বভুব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূ-

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী অংশ মূল তাম্রশাসনে নাই।

১ (বিসর্গ হইবে না।)

২ প্রকৃত পাঠ—'শান্তিং'। ৩ বোঢ়ুং। ৪ হস্মাদভূৎ। ৫ গুণৈঃ। ৬ দেকাতপত্রা। ৭ পুনানঃ।

(৭ম পংক্তি) র্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ ॥ [৪]

শ্রীমদ্বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ।

শত্রুবনিতাপ্রসাধনবিলোপিবিমলাসিজলধারঃ* ॥[৫]

(৮ম পংক্তি) দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তান্ গুণান্

শ্রীমন্তং জনয়াম্বভূব তনয়ং নারায়ণং সুতাভ্ভং[৮] ।

যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ সিরোমণি[৯]-রুচা-

(৯ম পংক্তি) শ্লিষ্টাঙ্ঘ্রি পীঠোপলং

ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকারচরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনং ॥[৬]

তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীরগর্ব্বৈ-

দেবালয়ৈশ্চ[১০] কুলভূধর-

(১০ম পংক্তি) তুল্যকক্ষ্যৈঃ[১১]।

বিখ্যাতকীর্ত্তি[১২]রভবত্তনয়শ্চ তস্য

শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ ।[৭]

তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতিঘ্রাম্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্র[১৩]-

(১১শ পংক্তি) কূটান্বয়েন্দো

স্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলেদুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ।

শ্রীমান্ গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইতৈ-

(১২শ পংক্তি) কো[১৪]

র্ভর্ত্তাভূন্নৈকরৎনদ্যুতিখচিতচতুঃসিন্ধুচিত্রাঙ্গকায়াঃ ॥[৮]

তস্মাদ্বভূব সবিভুর্ব্বসুকোটিবর্ষী

কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপাল-

(১৩শ পংক্তি) দেবঃ।

পিতু[১৫] প্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন

---

* এখানে 'ধ' অক্ষর পূর্ব্বতন পালরাজগণের লিপিতে যেরূপ আছে, সেইরূপ গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সহিত এই তাম্রশাসনলিখিত আর কোন 'ধ'র সহিত মিল নাই।

৮ স প্রভুং। ৯ শিরোমণি। ১০ দেবালয়ৈশ্চ। ১১ কক্ষৈঃ। ১২ কীর্ত্তিঃ। ১৩ রাষ্ট্রকূটা°। ১৪ ইবৈকো। ১৫ পিতুঃ।

যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ ॥[৯]

হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্প্পা-

(দ)নধি-

(১৪শ পংক্তি) কৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।

নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মা-

দভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥[১০]

ত্তজন[১৬]যো-

(১৫শ পংক্তি) যাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতাং

বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসৃভ[১৭]মুদয়াদ্রেরিব রবিঃ।

গুণগ্রাম্যা স্নিগ্ধ প্রকৃতিরনুরাগৈ-

(১৬শ পংক্তি)　　কবসতিঃ

সুতো ধন্যপুণৈ[১৮] রজনি নয়পালো নরপতিঃ ॥[১১]

পীতঃ সজ্জনলোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা

সংগ্রামেক[১৯]

(১৭শ পংক্তি) বলোধিকগ্রহকৃতাং কালঃ কুলে বিদ্বিষাং।

চাতুর্ব্বন্য[২০]-সমাশ্রয়ঃ সিতযশঃ পূরৈর্জ্জগল্লম্ভয়ন্

তস্মাদ্বিগ্রহপালদেবনৃ-

(১৮শ পংক্তি)　　পতিঃ পুণ্যৈর্জ্জনানামভূৎ ॥[১২]

তন্নন্দনশ্চন্দনবারিহারি।[২১] কীর্ত্তি[২২]প্রভানন্দিতবিশ্বগীতঃ।

শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো

(১৯শ পংক্তি)　　দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভুব ॥[১৩]

তস্যাভূদনুজো মহেন্দ্রমহিমাকন্দঃ প্রতাপশ্রিয়া-

নেকঃ সাহসসারথিগুণনয়ঃ[২৩]

(২০শ পংক্তি)　　শ্রীশূরপালো নৃপঃ।

---

১৬ ত্যজন্। ১৭ প্রসভ। ১৮ পুণ্যৈঃ। ১৯ সংগ্রামৈক। ২০ চাতুর্বর্ণ্য। ২১ (ছেদ হইবে না)। ২২ ভূর্ণময়ঃ।

যঃ স্বচ্ছন্দনিসগ্গ[২৪] বিভ্রমভরা[২৫]বিভ্রত[২৬] সর্ব্বায়ুধ-
প্রাগল্‌ভ্যেন মনঃসু বিস্ময়ভয়ং সদ্যসূতা[২৭]নদ্বিষাং ॥[১৪]

এ

(২১শ পংক্তি) তস্যাপি সহোদরো নরপতির্দ্দিব্যপ্রজানির্ব্বর-
ক্ষোভাহৃতবিব্রতবাসববৃতিঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ।
শাসত্যেব

(২২শ পংক্তি) চিরং জগন্তি জনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎ
তেজোভিঃ পরচক্রচেতসি চমৎকারং চকার স্থিরং। [১৫]
তস্মাদজায়ত নিজা-

(২৩শ পংক্তি) য়তবাহুবীর্য্য-
নিস্পীতপীবরবিরোধিযশঃপয়োধিঃ।
নেদিষ্ঠি[২৮] কীর্ত্তিশ্চ নরেন্দ্রবধূকপোল-
কণ্ডূরপত্র[২৯] মকরীষু

(২৪শ পংক্তি) কুমারপালঃ ॥[১৬]

প্রত্যর্থি[৩০]প্রমদাকদম্বকশিরঃ সিন্দূরলোপক্রম-
ক্রীড়াপাটলপাণিরেষ সুষুবে গোপালমুর্ব্বীভুজ[৩১]।

(২৫শ পংক্তি) ধাত্রীপালনজৃম্ভমাণমহিমাকপূরপাংশূৎকরৈ-
র্দেবঃ কীর্ত্তিময়ৈর্নিজে[৩২]র্বিতনুতে যঃ শৈশবে ক্রীড়িতঃ ।[১৭]
তদনু মদন-

(২৬শ পংক্তি) দেবীনন্দনশ্চন্দ্রগৌরৈ-
শ্চরিতভুবনগর্ব্বঃ পাংশুভিঃ কীর্ত্তিপূরৈঃ।
ক্ষিতিমববম[৩৩]তাতস্তস্য সপ্তাব্ধিদ্রাক্ষী[৩৪]
মভূতমদনপা-

---

২৪ নিসর্গ। ২৫ ভরান্। ২৬ (এখানে একটী অক্ষর কম আছে। 'বিভৎস্ব' পাঠ হইতে পারে।) ২৭ সূতাঃ। ২৮ নেদিষ্ঠ। ২৯ পত্রং। ৩০ প্রত্যর্থি। ৩১ ভুজঃ। ৩২ নিজে। ৩৩ মন[illegible] ৩৪ কাক্ষীং।

(২৭শ পংক্তি) লো রামপালাত্মজন্মা ॥[১৮]

স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-সন্দাদিত[৩৫]-
সেত্ত[৩৬]বন্ধনিহিতশৈল-

(২৮শ পংক্তি) শিখরণী-বিভ্রমান্নিরতিশয়ঘনায়ন-করিপট্টশ্যামায়মানবা-
সরলক্ষ্মীসমারব্ধ-সন্তত-জলদসমরসন্দেহা-

(২৯শ পংক্তি) দুদিচীনা[৩৭]নেকনরপতিপ্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনী-খরখুরোৎ-
খাত-ধূলীধূষরিতদিগন্তরালাত্ পরমেশ্বরসেবা

(৩০শ পংক্তি) সমাগতাশেষ-জম্বুদ্বীপভূপালানন্তপাদভবনমদবনেঃ শ্রীরামা-
বতীনগরপরিসরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবা-

(৩১শ পংক্তি) রাৎ। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীরামপালদেব-
পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরা-

(৩২শ পংক্তি) জঃ শ্রীমন্মদনপালদেবঃ কুশলী ॥ শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ কোটী-
বর্ষবিষয়ে হলাবর্ত্তমণ্ডলে কোষ্ঠগিরিসংবিংশাত্যাদাধিকোপেতস

(৩৩শ পংক্তি) কৈবর্ত্ত্যধ্বর্সাবদ্ধারজ্বাকে[৩৮] বিংশতিকায়াং ভুমৌ। সমুপগতা-
শেষ রাজপুরুষান্ রাজরাজান্যক[৩৯] রাজপুত্র রাজামাত্য মহাসন্ধিবি-

(৩৪শ পংক্তি) গ্রহিক মহাক্ষপটলিক মহাসামন্ত মহাসেপাপতি[৪০] মহাপ্রতীহার
দৌঃসাধসাধনিক মহাকুমারামাত্য রাজস্থানী-

(৩৫শ পংক্তি) য়োপরিক চৌরোদ্ধরণিক দাণ্ডিক দাণ্ডপাসিক শৌনিক ক্ষেত্রপ
প্রান্তপাল কোট্টপাল অঙ্গরক্ষ তদাযুক্তক বিনিযুক্তক

(পশ্চাদ্ভাগ।)

(১ম পংক্তি) হস্ত্যস্বোষ্ট্র[১] নৌবলব্যাপৃতক কিশোরবড়বাগোমহিষ্যাজাবিকা-
ধ্যক্ষ দ্রুতপ্রেষণিক গমাগমিক অতিত্বরমাণ বি-

---

৩৫ সম্পাদিত। ৩৬ সেতু। ৩৭ উদীচীনা। ৩৮ 'সংবিংশা' হইতে এ পর্য্যন্ত অস্পষ্ট, কোন অর্থগ্রহ হইল না। ৩৯ রাজন্যক। ৪০ সেনাপতি।

১ হস্ত্যশ্বোষ্ট্র।

(২য় পংক্তি) ষয়পতিগ্রামপতি তরিক শৌল্কিকগৌল্মিক গৌড় মালব
চোড় খস হূন কূলিক কর্ণাট লাট চাট ভট্ট-সেবকাদী-
(৩য় পংক্তি) ন্ অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্। রাজপাদোজীবিন[২] প্রতিবাসিনো
ব্রাহ্মণোত্তরান্ মহত্তমোত্তমকুটুম্বীঃ[৩]পুরোগম-চণ্ডালপর্য্যন্তান্ য-
(৪র্থ পংক্তি) থার্হমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ বিদিতমস্তু ভবতাং॥
যথোপরিলিক্ষিতোয়ং[৪] গ্রামঃ॥ স্বসীমাতৃণপ্লুতিগোচরপর্য্যন্তঃ॥
(৫ম পংক্তি) সতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্রমধূকঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোশরঃ[৫] সম্‌সাট[৬]-
বিটপঃ সদরসাপসারঃ সচৌরোদ্ধরণিকঃ পরিহৃতসর্ব্ব-
(৬ষ্ঠ পংক্তি) পীড়ঃ অচাটভট্টপ্রবেশঃ অকিঞ্চিৎপরগ্রাহ্যঃ ভাগ-ভোগকর
হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ রত্নত্রয়রাজসম্ভোগবর্জ্জিতঃ
(৭ম পংক্তি) ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ
পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে[৭] কৌৎস সগোত্রায় শাণ্ডি-
(৮ম পংক্তি) ল্যাসিতদেবলপ্রবরায় পণ্ডিতশ্রীভূষণ স ব্রহ্মচারিণে
সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়িনে চম্পাহিট্টীয়ায়
(৯ম পংক্তি) চম্পাহিট্টীবাস্তব্যায় বৎসস্বামিপ্রপৌত্রায় প্রজাপতিস্বামি-
পৌত্রায় শৌনকস্বামিপুত্রায় পণ্ডিত ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বরশ্বা[৮]
(১০ম পংক্তি) মিশর্ম্মণে পট্টমহাদেবী-চিত্রমতিকয়া বেদব্যাসপ্রোক্ত প্রপা-
ঠিত-মহাভারত-সমুৎসর্গিগত-দক্ষিণাত্বেন ভগব-
(১১শ পংক্তি) ন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।
অতো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি পমিপতি[৯]
(১২শ পংক্তি) ভির্ভূমের্দ্দানফলগৌরবাৎ অপহরণে মহান্ নরকপাতভয়াচ্চ
দানমিদমনুমোদ্যানুমোদ্য পালনীয়ং প্রতিবাসি-
(১৩শ পংক্তি) ভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈ রাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ী ভূয়ঃ যথাকালং
সমুদিত-ভাগভোগকরহিরণ্যাদি-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি॥

---

২ জীবিনঃ। ৩ কুটুম্বী। ৪ লিখিতোঽয়ং। ৫ সগর্ত্তোষরঃ। ৬ সসাট। ৭ বৃদ্ধয়ে। ৮ স্বামিং। ৯ অধিপতি।

(১৪শ পংক্তি) সম্বৎ ৮ চন্দ্রগত্যো[১] চৈত্র কর্ম্মদিনে ১৫ ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মা-
নুসংসিনঃ[২] শ্লোকাঃ ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ
(১৫শ পংক্তি) সগরাদিভিঃ
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্য-
(১৬শ পংক্তি) কর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥
গামেকাং স্বর্ণ[৩]-মেকঞ্চ[৪] ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং
হরন্ নরকমায়াতি।[৫] যাবদাহূতি[৬]-সংপ্লবং ॥
(১৭শ পংক্তি) ষষ্টীং[৭]-বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ
আক্ষেপ্তাচানুমন্তা[৮] চ তান্যেব নরকে বসেৎ ॥
স্বদত্তাং প-
(১৮শ পংক্তি) রদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং
স-বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥
আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বন্ময়ন্তি[৯] পিতাম-
(১৯শ পংক্তি) হাঃ।
ভূমিদোঽস্মদ্‌কুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিস্যতি[১০] ॥
সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্
ভূয়োভূয়[১১] প্রার্থয়েত্যে-
(২০শ ভক্তি) স[১২] রামঃ
সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতুর্নরাণাং
কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং
শ্রিয়মনু-

---

১ গত্যা। ২ ধর্ম্মানুসংশিনঃ। ৩ স্বর্ণ। ৪ মেকম্বা। ৫ (ছেদ হইবে না।) ৬ যাবদাহুত-। ৭ ষষ্টি-। ৮ নানুমন্তা। ৯ বর্ণয়ন্তি। ১০ ভবিষ্যতি। ১১ ভূয়ঃ। ১২ প্রার্থয়ত্যেষ।

(২১শ পংক্তি) চিন্ত্য মনুষ্য[১]-জীবিতং চ
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্যা
ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥
কৃতসকল-
(২২শ পংক্তি) নীতিজ্ঞো বৈর্য[২]-স্থৈর্য-মহোদধিঃ।
সান্ধিবিগ্রহিকঃ শ্রীমান্ ভীমদেবোঽত্র দূতকঃ ॥
রাজ্যে মদনপালস্য অষ্টমে
(২৩শ পংক্তি) পরিবচ্ছরে[৩]।
তাম্রপট্টমিমং শিল্পী তথাগতসরোঽখনৎ ॥

অনুবাদ।

বুদ্ধকে নমস্কার।

শ্রীমান্ লোকনাথ দশবল (বুদ্ধ) এবং অপর শ্রীমান্ গোপালদেব জয়যুক্ত হউন। যাঁহার হৃদয় কারুণ্যরত্নে প্রমুদিত ছিল, যিনি প্রিয়তমা মৈত্রীকে ধারণ করিয়াছিলেন, সম্যক্‌সম্বোধি-যুক্ত-বিদ্যারূপ-সরোবরের নির্ম্মল জলে যাঁহার অজ্ঞানরূপ পঙ্ক বিদূরিত হইয়াছিল, যিনি কামকৃত আক্রমণ নিবারণ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১।

সেই গোপালদেব হইতে শ্রীধর্ম্মপাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্মীর জন্ম-নিকেতন অর্থাৎ সমুদ্র স্বরূপ, কেন না তিনি সমকর,* পক্ষচ্ছেদভয়ে অর্থাৎ সপক্ষধ্বংসভয়ে উপস্থিত ভূভৃৎগণের† একমাত্র আশ্রয়, মর্য্যাদা ‡ রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত। তিনি পৃথিবীকে বহন করিতে সমর্থ, ও শৌর্য্যের আলয়স্বরূপ ছিলেন এবং দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসবাস অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ সদৃশ তাঁহার বসতি ছিল। ২।

তাঁহার বাক্‌পাল নামে এক অনুজ ভ্রাতা ছিলেন। এই শ্রীমান্ বাক্‌পাল সত্যব্রতধারী রামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণের ন্যায় মহিমান্বিত, গুণাবলীতে ভ্রাতার তুল্য, নয়বিক্রমশালী, ভ্রাতার আদেশ-পালনে তৎপর। তিনি শত্রুসেনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া পৃথিবীকে একাতপত্রা করিয়াছিলেন। ৩।

---

১ মনুষ্য। ২ ধৈর্য্য। ৩ পরিবৎসরে।

* সমকর অর্থাৎ সমুদ্র পক্ষে মকরের সহিত বর্ত্তমান এবং রাজপক্ষে যিনি অপক্ষপাতে করগ্রহণ করেন।

† এখানে 'ভূভৃৎ' শব্দের একপক্ষে রাজা ও অপর পক্ষে পর্ব্বত অর্থ বুঝাইতেছে।

‡ এখানে 'মর্য্যাদা' শব্দে রাজপক্ষে সম্ভ্রম এবং সমুদ্র পক্ষে সীমা বুঝাইতেছে।

তাঁহা[১] হইতে জয়শীল জয়পাল জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র দ্বারা যেরূপ জগৎ পবিত্র হয়, তদ্রূপ এই জয়পাল-চরিত্রে জগৎ পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। ইনি ধর্ম্মদেষ্টাদিগকে শাসন করিয়াছিলেন। ইনি যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া দেবপাল নামে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অশেষ ভুবনরাজ্যসুখ ভোগ করাইয়াছিলেন। ৪।

তাঁহার অজাতশত্রুর ন্যায় বি[illegible]গ্রহপাল নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শত্রুবনিতা-দিগের প্রসাধন (অঙ্গরাগ) নির্ম্ম[illegible]ল অসিরূপ জলধারাদ্বারা বিলোপ করিয়াছিলেন। ৫।

(এই বিগ্রহপালের) শ্রীমা[illegible]ন্ ও প্রভুত্বশালী নারায়ণ নামে তনয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্ষিতিপরিপালনের নিমিত্ত দিক্[illegible]পালগণের অংশদ্বারা বিভক্ত গুণ সকল দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় চ[illegible]রিত্রদ্বারা ন্যায়ানুসারে প্রাপ্ত ধর্ম্মাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভূপতিগণের শিরোমণির কান্তি[illegible]

তাঁহার পুত্র হইয়াছিলেন [illegible]দ্বারা যাঁহার পাদপীঠোপল আলিঙ্গিত হইত। ৬।

গভীর গর্ভযুক্ত জলাশয় ও কু[illegible] রাজা শ্রীরাজ্যপাল। যিনি সমুদ্রের মূলদেশের ন্যায় অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৭। [illegible]পর্ব্বতের সমকক্ষ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট দেবালয় সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া

সেই পূর্ব্বরাজ হইতে [illegible]

ভাগ্যদেবী তেজোনিধি পু[illegible]তুঙ্গ (অত্যুন্নত) অতএব অত্যুন্নতমস্তক-রাষ্ট্রকূটবংশের তনয়া ইনি বহুকাল ধরিয়া [illegible] প্রসব করিয়াছিলেন, (এই পুত্রের নাম) শ্রীমান্ গোপালদেব। [illegible]পৃথিবীর একমাত্র পতি ছিলেন,—পৃথিবীর অঙ্গ যে চারি মহাসমুদ্র উহাও নানা উজ্জ্বল রত্নে খচিত ছিল। ৮।

যেমন সূর্য্য হইতে চন্দ্র, সেইরূপ তাঁহা হইতে বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার অতিশয় প্রিয়, নির্ম্মল চরিত্র, কলাময় ও কোটি কোটি বসু[২]-দানকারী। চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া তিনি জগতের তাপ বিদলিত করিতেন। ৯।

তাঁহা হইতে অবনিপাল শ্রীমহীপালদেব জন্মগ্রহণ করেন। যিনি পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশপূর্ব্বক নিজ বাহুবলে শত্রুদিগের মস্তকদেশে পদার্পণ করিয়া অনধিকৃত ও বিলুপ্ত রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। ১০।

উদয়গিরি হইতে সূর্য্যের ন্যায় মহীপালদেবের মহনীয় পুণ্যবলে নয়পাল জন্মগ্রহণ করেন, রমণীদিগের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজগণের মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক যিনি আশা* সকল বিস্তার করিয়াছিলেন। যিনি বহুগুণশালী, স্নিগ্ধ প্রকৃতি [illegible]আধার। ১১।

তাঁহা হইতে লোকদিগের পুণ্যহেতু [illegible] যিনি সজ্জনদিগের একমাত্র লক্ষ্যস্থল ছিলেন। সর্ব্বদা [illegible]গ্রামস্থলে

(১) যত্তদের নিত্য সম্বন্ধ

(২) বসু শব্দ

দর্শিত হইত, অধিক যুদ্ধকারী শত্রুকুলের যিনি কালস্বরূপ, চারিবর্ণের আশ্রয়, যাঁহার যশোরাশিতে দিঙ্মণ্ডল ধবলিত হইয়াছিল। ১২।

চন্দ্রশেখর-শিবের ন্যায় বিগ্রহপাল হইতে শ্রীমান্ দ্বিতীয় মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন। যিনি মলয়জ-শীতল শুভ্র যশোরাশিদ্বারা জগৎকে আনন্দিত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৩।

তাঁহার অনুজ শ্রীশূরপাল, ইনি ইন্দ্রতুল্য মহিমাশালী, প্রতাপশ্রীর আধার, অদ্বিতীয়, সাহসই যাঁহার সারথি এবং গুণস্বরূপ। তিনি স্বাভাবিক বিক্রমসমূহ ধারণ করিয়া নিজ অস্ত্র-সমূহের প্রাগল্‌ভ্য দ্বারা শত্রুদিগের মনে বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করেন নাই কি ?। ১৪। (?)

ইঁহার সহোদর রাজা শ্রীরামপাল, যিনি দিব্য প্রজাদিগের অতিশয় ক্ষোভে আহৃত অতএব পিতা জগৎপরিপালনে নিরত বিব্রতচিত্ত বাসবের বৃত্তি অর্থাৎ বেষ্টনীস্বরূপ। তাঁহার রাজগণকে স্থায়িভাবে চমৎকৃত থাকিলেও যিনি শৈশবকালেই বিস্ফূর্জ্জমান তেজঃদ্বারা শত্রুর করিয়াছিলেন। ১৫।

তাঁহা হইতে কুমারপাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের আয়তভুজবীর্য্যদ্বারা বলবান্ শত্রুদিগের যশঃসাগর পান করিয়াছিলেন এবং তিনি নরেন্দ্রবধূগণের কপোলে কর্পূরের পত্র ও মকরীর চিত্রণ-বিষয়ে বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ১৬।

তাঁহা হইতে নরপতি গোপাল জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যর্থিগণের রমণীসমূহের শিরস্থিত সিন্দূরলোপক্রমরূপ ক্রীড়া দ্বারা যাঁহার হস্ত পাটল হইয়াছিল, পৃথিবীপালন দ্বারা যাঁহার খ্যাত মহিমারূপ কর্পূরধূলি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং যিনি শৈশবে সেই স্বীয় কীর্ত্তিসমূহরূপ ধূলিদ্বারা ক্রীড়িত হইয়াছিলেন। (অর্থাৎ শৈশবকালেই রাজ্যপালন করিয়া অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন)। ১৭।

তাহার পরে মদনদেবীর গর্ভে রামপালের ঔরসে মদনপাল জন্মগ্রহণ করেন, তিনি জ্যোৎস্নাধবল কীর্ত্তিপূরদ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া সপ্তসাগরমেখলা পৃথিবীকে পালন করিয়াছিলেন। ১৮।

যেখানে ভাগীরথীপথে প্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক দ্বারা সেতুবন্ধ প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, শৈলমালা বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, নিরতিশয় মেঘবর্ণাশ্রিত হস্তীর আস্তরণে বাসরলক্ষ্মীকে (দিন-শোভাকে) তমসাচ্ছন্ন করায় যেন বর্ষাসময় চিরবিরাজমান বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে উত্তরাঞ্চলবাসী রাজগণের প্রদত্ত অসংখ্য অশ্বারোহী সেনার অশ্ব সকলের তীব্র খুরাঘাতে উৎখাত ধূলিরাশি দ্বারা [illegible]ল, যেখানে পরমেশ্বরপূজার্থ সমুপস্থিত অসংখ্য জম্বু দ্বী[illegible] হইতেছিল, সেই রামাবতীনগরের নিকটবর্ত্তী [illegible]সাগত মহারাজাধিরাজ [illegible]—শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির

রাম এইরূপে সকল ভাবী পার্থিবেন্দ্রদিগের নিকট ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতেছেন। নরগণের ইহাই সামান্য ধর্ম্ম-সেতুস্বরূপ এবং ক্রমানুসারে কালে কালে পালনীয়। মানব-জীবন পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ চঞ্চল এই চিন্তা করিয়া ও এই উদাহরণ বুঝিয়া পুরুষগণ পরকীর্ত্তি বিলোপ করিবেন না।

যিনি সকল নীতিতে অভিজ্ঞ, ধৈর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে মহাসমুদ্র সদৃশ (সেই) সান্ধিবিগ্রহিক শ্রীমান্ ভীমদেব এই শাসনে দূতক। মদনপালের রাজত্বের অষ্টম পরিবৎসরে তথাগতসর নামক শিল্পী কর্ত্তৃক এই তাম্রপট্ট উৎকীর্ণ হইল।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

* মূল তাম্রশাসনের কোন কোন স্থান ঠিক বুঝিতে না পারায় অনুবাদের স্থানে স্থানে মূল শব্দের অবিকল রক্ষিত হইল।

বিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, মহাসামন্ত, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতীহার, দৌঃসাধসাধনিক, মহাকুমারামাত্য, রাজস্থানীয়, উপরিক, চৌরোদ্ধরণিক, দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক, শৌনিক, ক্ষেত্রপতি, প্রান্তপাল, কোট্টপাল, অঙ্গরক্ষক, এবং এই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহারা নিযুক্ত বা বিনিযুক্ত; হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও নৌবলে নিযুক্ত, কিশোর অশ্ব-গো-মহিষী-অজ-মেষাদির অধ্যক্ষ, দ্রুতপ্রেষণিক, গমাগমিক, অতিত্বরমাণ, বিষয়পতি, গ্রামপতি, নৌজীবি, শৌল্কিক, গৌল্মিক, গৌড়-মালব-চোড়-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-হইতে আগত চাট, ভট্ট ও অপরাপর সেবকাদি এবং অন্যুক্ত অপরাপর সকল রাজপুরুষদিগকে, রাজপাদোজীবি প্রজাদিগকে, মহত্তমোত্তম কুটুম্বি-প্রমুখ ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল পর্য্যন্ত (সকলকেই) যথাযোগ্য সম্মান করিতেছেন, জানাইতেছেন ও আদেশ করিতেছেন, আপনারা সকলে বিদিত হউন! যথা উপরিলিখিত গ্রাম, স্বসীমান্তর্গত তৃণ, প্রুতি ও গোচারণভূমি পর্য্যন্ত; তল, উদ্দেশ, আম্র, মধুক, জলস্থল, গর্ত্ত, উষর, সাট, বিটপ, দরি, অপসার, চৌরোদ্ধরণিক, (প্রত্যেকসহ) সকলপ্রকার উৎপীড়নপরিহৃত, চাট (ঠিকা) ও ভট্ট (নিয়মিত সৈন্য)-প্রবেশের অযোগ্য, অপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে অনধিকারী, ভাগ ভোগ, কর ও হিরণ্যাদি রাজস্ব সমেত, রক্তত্রয়রাজসম্ভোগবর্জ্জিত, 'ভূমিছিদ্র'-ন্যায়ানুসারে যত দিন চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবীতে বিদ্যমান ততদিনের নিমিত্ত এবং মাতা, পিতা ও আপনার পুণ্য ও যশোবিবর্দ্ধনার্থ চম্পাহিট্টীগ্রামবাসী বৎসস্বামীর প্রপৌত্র, প্রজাপতিস্বামীর পৌত্র ও শৌনকস্বামীর পুত্র সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়ী, কৌৎসগোত্র শাণ্ডিল্য অসিত ও দেবলপ্রবরযুক্ত পণ্ডিত শ্রীভূষণ (উপাধিধারী) বটেশ্বরস্বামিশর্ম্মাকে পট্টমহিষী চিত্রমতিকা কর্ত্তৃক বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত-পাঠের উদ্যাপনের দক্ষিণাস্বরূপ ভগবান্ বুদ্ধদেবের নাম স্মরণ করিয়া শাসনদ্বারা (উক্ত গ্রাম) আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। অতএব আপনারা সকলেই (এই দান) অনুমোদন করিবেন এবং ভূমির দানফলপ্রাপ্তির গৌরবে ও অপহরণ করিলে নরকপাতের ভয়ে ভাবী নৃপতিবর্গও এই দান অনুমোদন করিবেন। প্রতিবাসী কৃষকগণও (এই) রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদা পালন করিবে এবং যথাকালে উৎপন্ন (শস্যাদির) ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্যাদি রাজস্ব (এই শাসনগৃহীতার) নিকট উপস্থিত করিবে। সম্বৎ ৮, শুক্লপক্ষে চৈত্র কর্ম্মদিনে ১৫।

এ সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্লোকগুলি এইরূপ আছে—

সগরাদি বহু রাজাই ভূমিদান করিয়াছেন। যাহার যাহার যেমন ভূমিদান, তাহার তাহার তেমনি ফল। যে ভূমি গ্রহণ করে ও যে ভূমিদান করে, এই উভয় পুণ্যকর্ম্মাই নিয়ত স্বর্গগামী হয়। একটী গোই হউক, একটী স্বর্ণই হউক বা অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমাণ ভূমিই হউক, হরণ করিলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকভোগ হয়। ভূমিদানকারী ষাটহাজার বর্ষ স্বর্গে অবস্থান করে এবং তাহার গ্রহণকারী ও নিবারণকারী ততদিন নরকে বাস করে। স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই হউক যে ভূমি হরণ করে, সে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃপুরুষের সহিত পচিয়া থাকে। পিতৃগণ আহ্লাদসহ প্রকাশ করেন ও পিতামহগণ বর্ণনা করেন যে, আমার বংশে ভূমিদানকারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই ভূমিদ আমাদের পরিত্রাতা হইবে।

৬ষ্ঠ ভাগ] [৩য় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

অলঙ্কার-শাস্ত্র।

ভাষা ভাবপ্রকাশের দ্বার। মানবজাতি একমাত্র ভাষার সাহায্যে হৃদয়গত নিখিল চিন্তা অভিব্যক্ত করিয়া সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভূমণ্ডল যেমন অসংখ্য মানবজাতির আবাস, তেমন অসংখ্য ভাষার লীলাভূমি। যে জাতির ভাষা যত সুশ্রী ও বিভবশালিনী, সে জাতি তত পরিমাণে সভ্য ও জ্ঞানী বলিয়া ধরাতলে পরিচিত এই যে ভাষার বিভব ও সৌন্দর্য্য, যাহা মানবজাতির গৌরবের কারণ, উহার মূল অলঙ্কার ভাষায় যদি অলঙ্কার না থাকিত তাহা হইলে ভাষা এতদূর মর্য্যাদান্বিত হইত না। অতএ ভাষার সৌন্দর্য্যসাধক অলঙ্কার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলাই এই প্রবন্ধ অবতারণার উদ্দেশ্য বিষয়টি এতই ব্যাপক ও গুরুতর যে, এ বিষয়ে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির হস্তক্ষেপ ধৃষ্টত মাত্র। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে আমার সানুনয় বিজ্ঞাপন, তাঁহারা যেন মনে না করেন আমি অলঙ্কার-শাস্ত্র সংক্রান্ত উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বস্তুত

সূর্য্যের অভিপ্রায় জানিয়াই যেন তাঁহার পথে সম্যক্‌রূপে পরিভ্রমণ করেন এবং কখনও দিক্‌সমূহের হিংসা করেন না। *

যদৃচ্ছাক্রমে একটীমাত্র ঋক্ উদ্ধৃত হইল, ইহাও দেখুন কেমন সুন্দর অলঙ্কারদ্বারা সুসজ্জিত। বেদের পর মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক বিরচিত রামায়ণ ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-সঙ্কলিত মহাভারত কিপ্রকার মনোহর অলঙ্কারদ্বারা সুশোভিত পদ্যগদ্যের আকর, তাহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নহে। আবার আমরা যখন মহাকবি কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, মাঘভট্ট, ভট্টি প্রভৃতির কাব্যনাটকাদি পাঠ করি, তখন বিবিধ বৈচিত্র্যশালিনী অলঙ্কার-সমষ্টির অতুল্যসম্পদ্ বিলোকন করিয়া মুগ্ধ হই। কোন্ সময় হইতে সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন মূর্ত্তিবিশিষ্ট অলঙ্কারসমূহের নামকরণ ও উহার সূত্রনিচয় বিরচিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা অসাধ্য। ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল অলঙ্কার গ্রন্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে "ভরতসূত্র"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই ভরতসূত্র নাট্য-শাস্ত্রের আবিষ্কারক ভরতমুনির প্রণীত কি অপর কোন ভরত কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ভারতবর্ষে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত নাই। পাশ্চাত্য মনীষিগণ অনুসন্ধানদ্বারা অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

এডিন্‌বরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক জে ঈগ্‌গেলিং মহোদয় বলেন ;—সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ বর্ত্তমান। সংস্কৃত কাব্যে নানাবিধ সূক্ষ্মতম বিভাগ, বিষয়, ভাব, রস, ভঙ্গী প্রভৃতির বর্ণনা লক্ষিত হয়। ভারতবাসিগণের মস্তিষ্কের শক্তি ঐ সকল সূক্ষ্মতম ভেদনির্দ্দেশে তৎপর এবং ঐ সকল ভেদ ভারতীয় মস্তিষ্কের স্বাভা-[illegible] ও অনুকূল শক্তির ফল। অধ্যাপক হোরেস্ উইলসন্ "থিয়েটার্ অব্ দি হিন্দুজ্" নামক [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ঐ গ্রন্থে নাটকাভিনয়ের বিবিধ

কাব্যালঙ্কারবৃত্তিনামক উহার এক খানি ভাষ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক ক্যাপেলার্ এই গ্রন্থের একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এই গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা তদপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারে। কাশ্মীরীয় রুদ্রট যে কাব্যালঙ্কার নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহা নিশ্চয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। যেহেতু নমি নামক পণ্ডিত ১০৬৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে লিখিয়াছেন, তাঁহার টীকায় প্রাচীনতর ভাষ্য ও টীকার মত অনুসৃত হইয়াছে।

"দশরূপক" গ্রন্থ-প্রণেতা ধনঞ্জয় দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের শেষ শ্লোকে লিখিত আছে, তিনি মুঞ্জের সভায় অধিষ্ঠানকালে ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মুঞ্জ বোধ হয় প্রসিদ্ধ ধাররাজ ভোজের পিতৃব্য। দণ্ডিক দশরূপকের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। দণ্ডিক ও ধনিক উভয়েরই পিতার নাম বিষ্ণু। ধনিক রাজশেখরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব তিনি দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালে জন্ম গ্রহণ করেন।

"সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা অতিশয় মনোরম ও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। অনেকে বলেন (একাদশ শতাব্দীতে) ভোজরাজ কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ বিরচিত হয়। আমাদের বোধ হয় ভোজরাজের সভাসদ্ কোন উপকৃত পণ্ডিত ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়া ভোজরাজের নামে প্রচার করিয়াছিলেন।

"কাব্যপ্রকাশ" দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা বোধ হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিরচিত হয়। ইহার প্রণেতা কাশ্মীরীয় পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ মম্মটভট্ট। ইনি নৈষধচরিত-প্রণেতা শ্রীহর্ষের মাতুল।

"সাহিত্য দর্পণ" ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে বাস করিতেন।

এতদ্ভিন্ন অস্মদ্দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহোদয় বিগত ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যপ্রকাশের একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। উহার ভূমিকায় তিনি অলঙ্কারগ্রন্থনিচয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার আলোচিত বিষয়ের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, "তিনি যে সকল অলঙ্কার গ্রন্থ দেখিয়াছেন তন্মধ্যে শৌদ্ধোদনিসূত্র, বাভটালঙ্কার, বামনসূত্রবৃত্তি, দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শ, ভোজদেবকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, মহিমভট্টকৃত ব্যক্তিবিবেক, অভিনবগুপ্তকৃত আলোচন গ্রন্থ, কাব্যপ্রকাশের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। আর পীযূষবর্ষকৃত চন্দ্রালোক, অপ্যদীক্ষিতকৃত চিত্রমীমাংসা এবং কুবলয়ানন্দ, বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ, গোবিন্দ ঠক্কুরকৃত কাব্যপ্রদীপ, জগন্নাথকৃত রসগঙ্গাধর, কেশবমিশ্রকৃত [illegible] অলঙ্কাররহস্য, এই কয়খানি গ্রন্থ কাব্যপ্রকাশরচনার পরবর্ত্তী

[illegible]ময় জ্ঞানবিজ্ঞানের মহিমায় সভ্যতার সমুন্নত শিখরে অধিষ্ঠিত, তখন গ্রীস

এবং রোমজনপদও নানাবিদ্যার সমুজ্জ্বল আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। অতএব পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র গ্রীস ও রোমজনপদে কি প্রকারে অলঙ্কার বিদ্যার সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিল, এস্থলে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অসাময়িক নহে। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থাবলী বিদ্যমান আছে সে সমুদয়ের আলোচনা সাধ্যাতীত। অতএব একটিমাত্র উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ সারমর্ম্ম এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

গ্ল্যাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্-ভাষার অধ্যাপক ডাঃ আর্ সি জেব্ব্ মহোদয় বলেন ;—ডায়োজিনিস্ লেয়ার্টিয়াস্ আরিষ্টোটলকৃত একখানি অলঙ্কার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন * খৃঃ পূর্ব্ব ৪৭২ অব্দে এম্‌পিডক্‌লিস্ অলঙ্কারবিদ্যার প্রথম আবিষ্কার করেন। এগ্রিগেণ্টম্ নগরে রাজার অত্যাচার দূরীকরণের নিমিত্ত তিনি উপমা রূপক প্রভৃতি নানাবিধ বাগ্‌ভঙ্গীর অবতারণা করিয়া রাজকীয় অত্যাচার নিবারণ ও অলঙ্কারবিদ্যার প্রথম সূচনা করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৬৬ অব্দে সাইরেকিউস্ নগরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোরেক্‌স কর্ত্তৃক অলঙ্কারনামক একটি পৃথক্ বিদ্যার প্রথম ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪৬৬ অব্দে সাইরেকিউসের অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা থ্র্যাসিবিউলাস্ রাজ্যচ্যুত হন এবং প্রজাতন্ত্র-প্রণালী সংস্থাপিত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রজাগণ স্বীয় ভূমিবিত্তের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত নানাবিধযুক্তি ও অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যদ্বারা নিজের দাওয়া প্রকাশ করে। স্বীয় স্বীয় অধিকার প্রমাণ করিবার জন্য অনেককেই অলঙ্কার বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সরল অধিবাসিবর্গ ধর্ম্মাধিকরণে আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত অলঙ্কার বিদ্যা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রজারা যদি সকলেই এক প্রকার কথায় বলিত যে "মহাশয়! পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রাজা থ্র্যাসিবিউলাস্ আমার ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন," তাহা হইলে বিচারকেরা পুনঃ পুনঃ এক প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে মনোযোগ করিতেন না এবং প্রজারাও সুবিচার প্রাপ্ত হইত না। এই হেতু বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার বাগ্‌ভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মনোগতভাব অতি নৈপুণ্যের সহিত প্রকাশ করিত। কোরাক্‌স বাক্যসমূহকে সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বাক্যকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম বাক্যভেদ, দ্বিতীয় সম্ভাবনা। নিম্নে সম্ভাবনার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন দুর্ব্বল ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইলে সে ধর্ম্মাধিকরণে গিয়া বলিত যে "মহাশয়! ইহা কি সম্ভব হয় যে আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তি উহাকে আহত করিতে পারে।" এইরূপ বাক্যরচনাই প্রাচীন গ্রীক্‌ভাষায় প্রধান অলঙ্কারপূর্ণবাক্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এই শ্রেণীর বাগস্ত্রপ্রয়োগেই প্রতিপক্ষগণ পরাভূত হইত। কোরাক্‌সের শিষ্য টিয়িশাস্ অলঙ্কারবিদ্যার সমধিক উন্নতিসাধন করেন। আরিষ্টোটল্ কোরা[illegible]

* অনেকে বলেন পূর্ব্বোক্ত অলঙ্কার গ্রন্থ আরিষ্টোটল কৃত নহে, তাঁহার কিছু [illegible] বিরচিত।

অনেক দোষ আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে "সামান্য সম্ভাবনা ও বিশেষ সম্ভাবনা, সম্ভাবনার এই দুই প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ না করায় কোরাক্‌সের গ্রন্থ অলঙ্কারগ্রন্থ না হইয়া দোষগ্রন্থ হইয়াছে। যদি সম্ভাবনার ভেদ নির্দ্দেশ না করা যায় তাহা হইলে তোমার গ্রন্থ হইতেই অনেক অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবনা হইবে।"

খৃঃ পূর্ব্ব ৪২৭ অব্দে লিয়ন্টিনিনগরের সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জিয়াস্ অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যদ্বারা আথেন্সবাসী লোকদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যে বিষমালঙ্কারের ভাগই সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত। কোথায়ও কোন কথা বলিবার আবশ্যক হইলে জর্জ্জিয়াস্ কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যরচনা করিতে আরম্ভ করিতেন এবং উহা বারংবার আবৃত্তি করিয়া হৃদ্গত করিয়া রাখিতেন। প্রকাশ্য সভায় পূর্ব্বাভ্যস্ত কয়েকটি কথা বলিয়াই তিনি স্বীয় বাগ্মিতার পরিচয় প্রদান করিতেন। নূতন বিষয়ের অবতারণা হইলে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। কথা অলঙ্কারবিহীন হইবে এই ভয়ে তিনি উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইতেন না।

খৃঃ পূঃ ৪২১ অব্দে আথেন্স নগরের এণ্টিফন অলঙ্কারবিদ্যার নিয়ম অনুসরণপূর্ব্বক ঐ নিয়মের নানা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া যে অলঙ্কার গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিদ্যমান আছে। তাঁহার প্রথম গ্রন্থের নাম "টেট্রালজি" অথবা চতুঃস্তবক। ইহার এক এক স্তবকে চারিটি করিয়া বাক্য আছে। ঐ বাক্যগুলি নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির ধর্ম্মাধিকরণে আত্মসমর্থনের নিমিত্ত উক্তি। এণ্টিফনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বহুলোক ধর্ম্মাধিকরণে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেন। যে সরল ব্যক্তি এণ্টিফনের উদ্ভাবিত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে বাগস্ত্র প্রয়োগে অসমর্থ হইতেন, তিনি আনন্দ সহকারে অলঙ্কার-বিদ্যানিপুণ কোন ব্যক্তিকে স্বীয়পক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত করিতেন। যে যুগে এণ্টিফন চতুঃস্তবক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই সময় হইতে ইহা একটি বিদ্যামাত্রে বদ্ধ এবং লোকব্যবহারের নিমিত্ত অতি উন্নত কৃতবিদ্যগণের সমাজে আবদ্ধ না থাকিয়া সাধারণ জনগণ ও বিচারালয়ের ব্যবহারে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। প্রতি স্তবকে চারিটি বাক্য কি প্রণালীতে বিন্যস্ত হইত তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম। বাদী নিজের অভিযোগ বর্ণন করেন।

২য়। প্রতিবাদী আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাক্‌প্রয়োগ করেন।

৩য়। বাদী উত্তর প্রদান করেন।

৪র্থ। প্রতিবাদী প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

প্রত্যেক অভিযোগের স্থূল স্থূল কথাগুলি বাদী প্রতিবাদীর উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রকাশিত থাকিত। আলঙ্কারিক ব্যবহারাজীবগণ বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যসমূহের সূক্ষ্মতম মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া অতিতেজস্বিতার সহিত স্বীয়পক্ষ সমর্থন করিতেন। ইহাদ্বারা প্রাচীন গ্রীসের যুক্তিপূর্ণ বাক্যপ্রয়োগের একটি মানচিত্র প্রদর্শিত হইল।

আমরা আরও দেখিতে পাই কোরাক্স ও টিশিয়াসের সম্ভাবনা নামক অলঙ্কারাধ্যায় হইতে কিরূপে যথার্থ অলঙ্কারবিদ্যার সৃষ্টি হইতে থাকে। এণ্টিফনের অলঙ্কার গ্রন্থ বিরচিত হইবার পর হইতে আথেন্সনগরীর গদ্য সাহিত্যের রীতি-পরিবর্ত্তন ও গুরুত্ব এবং আড়ম্বর-বৃদ্ধি হয় আর বিষম বাক্য প্রয়োগের মনোহর বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইতে থাকে। লেখকগণের চিন্তা-শক্তি ও সাহস পূর্ণ হয়। বাক্যের আকৃতি জটিল হইলেও উহা ওজস্বিতাপূর্ণ এবং হৃদয়-স্পর্শী হইতে থাকে।

কথিত আছে আইসোক্রেটিস্ একখানি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অলঙ্কারের নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে বিদ্যার সাহায্যে লোককে বিষয় বিশেষে প্ররোচিত করা যায় তাহাকে অলঙ্কারবিজ্ঞান বলে। তিনি খৃঃ পূঃ ৩৯০ অব্দ হইতে ৩৪০ অব্দ পর্য্যন্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। আইসোক্রেটিস্ যে আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন তন্মধ্যে টাইমোথিনিস্, লিয়োডেমস্, লাইকরগস্, হাইপিরীডিস্ প্রভৃতি রাজনৈতিক, পেন্‌সিপ্‌পস্, আইসিয়াস্ প্রভৃতি দার্শনিক, ইফোরস্, থিয়োপম্পাস্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ প্রধান।

খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দ হইতে ৩২২ অব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসর মধ্যে আরিষ্টোটল্ অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, "আইসোক্রেটিসই সর্ব্বপ্রধান আলঙ্কারিক ছিলেন।" সাহিত্যরূপে বিচার করিতে হইলে আরিষ্টোটলের গ্রন্থ জগতে অতি নীরস বলিয়া প্রতীত হইবে। বৈজ্ঞানিক ভাবে বিচার করিলে উহা অত্যন্ত মনোহর ও চমৎকারজনক বোধ হয়। আরিষ্টোটলের অলঙ্কারগ্রন্থ তর্কবিদ্যা অপেক্ষা ব্যাকরণ-বিদ্যার সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট। একমাত্র যুক্তি কত প্রকার বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় আরিষ্টোটল্ তাহা সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ প্রকার বিভিন্ন বাক্যসমূহের পরস্পর তুলনা করিয়া তিনি কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন। ঐ নিয়মসমূহ সংগৃহীত করিয়া আরিষ্টোটল্ স্বীয় অলঙ্কারসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারবিদ্যার যেরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বিস্ময়কর ও সর্ব্বথা অনুপযুক্ত। আলঙ্কারিকগণ দয়া, ক্রোধ, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি চিত্তবিকার উৎপাদন করিয়া ব্যক্তি-বিশেষকে বিষয়বিশেষে কিরূপে প্ররোচিত করিতে হয় তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, এইরূপ চিত্তবিকৃতি উৎপাদন করিলে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের যৌক্তিক প্রমাণ প্রদর্শিত হয় না।" তাঁহার মতে কতকগুলি তর্কপূর্ণ বাক্যের সৃষ্টি করিয়া সেই তর্কজালে বিচারক ও প্রতিপক্ষকে জড়িত করিয়া বাধ্য করিতে পারাই অলঙ্কারবিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বিচারকের চিত্তবৃত্তিকে আকৃষ্ট করিয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি অপেক্ষা তর্কপূর্ণবাক্যে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় অনুকূলে আনয়ন করিতে পারিলেই অলঙ্কার বিদ্যার যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল মনে করিতে হইবে।

আরিষ্টোটলের মতে অলঙ্কার-শাস্ত্র অতিপ্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, "অন্যায় ও অসত্য হইতে ন্যায় ও সত্যকে রক্ষা করিতে হইলে অনেক স্থলে অলঙ্কারবিদ্যার প্রয়োজন। সত্য ও ন্যায় অসত্য ও অন্যায় হইতে স্বভাবতঃ বলবত্তর, কিন্তু উপযুক্ত বিচারের অভাবে অনেক সময় সত্য ও ন্যায়কে পরাভূত হইতে হয়। ইহার প্রতীকার হওয়া উচিত। অলঙ্কারবিদ্যার প্রয়োগে ইহার যথেষ্ট প্রতীকার হইতে পারে।" আরিষ্টোটল বলেন, "লোককে প্ররোচিত করিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই সকল উপায়ের উদ্ভাবনী শক্তিই অলঙ্কার। যে উপায় বা তর্ক উদ্ভাবিত হইল উহা ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহা দেখিও না। উদ্দেশ্য নীতিসঙ্গত কি নীতিবিরুদ্ধ তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন কি? আলঙ্কারিক যদি লোককে প্ররোচিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার কৃতার্থতা হইল।"

আরিষ্টোটল্ যুদ্ধ, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক বহুপ্রকার অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনে প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। তাঁহার মতে মনোরম শব্দের যোজনা এবং যে শব্দ যে অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই শব্দকে সেই অর্থে ব্যবহৃত করাই আলঙ্কারিক-দিগের কর্ত্তব্য। আলঙ্কারিকগণ যে সকল বাক্য ব্যবহার করিবেন তাহার অর্থ যেন কোন প্রকারেই অস্পষ্ট না হয়। ভাষা অত্যন্ত গ্রাম্য অথবা অতিশয় উন্নত হওয়া বিধেয় নহে, উহা সর্ব্বথা বিষয়োপযোগী হওয়া উচিত। ঈউরিপিডিস্ দৈনিক জীবনের ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া যে কাব্য রচনা করেন তাহা পাঠ করিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিল। আরিষ্টোটল বলেন, গদ্য সাহিত্যকে বিভূষিত ও চিত্তাকর্ষক করিবার যাঁহার অভিলাষ, তিনি যেন সুবিবেচনার সহিত রূপক ব্যবহার করেন। এই রূপক ব্যবহার কিরূপে করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করা তত সহজ নহে; তবে ঐ সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ ও সঙ্কেত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে বিশেষণ-যোজনার তারতম্যের উপরেই রূপকের উৎকর্ষ নির্ভর করে। এখানে বিশেষণ-যোজনা সম্বন্ধে একটি গল্প উল্লিখিত হইতেছে। যেমন এ দেশে ঘোড়-দৌড় হয়, এইরূপ পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশে অশ্বতরীর দৌড় হইত। একদা কোন ব্যক্তি উহাতে জয়লাভ করিয়া মহাকবি সাইমোনিডিজের নিকট গমন করিয়া বলে "মহাশয়! আপনাকে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক প্রদান করিতেছি, আপনি এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি কবিতা রচনা করুন।" সাইমোনিডিজ্ উহাতে অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "তিনি অর্দ্ধগর্দ্দভী সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিবার জন্য লেখনীকে নিয়োজিত করিতে পারেন না।" যখন ঐ ব্যক্তি পারিশ্রমিকের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে চাহিল তখন সাইমোনিডিজ্ নিম্নলিখিত ভাবে একটি সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন;—হে বায়ুর ন্যায় বেগশালী অশ্ব কন্যাগণ ইত্যাদি।

আরিষ্টোটাল্ রীতিদোষ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"অহৃদ্যসমাসযুক্ত শব্দ, অপ্রচলিত শব্দ

এবং বিশেষণ যোজনার ত্রুটী প্রভৃতি হইতে সাহিত্যের রীতিদোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।" তিনি রূপক ও উপমার ভেদ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—ব্যাখ্যাবিশিষ্ট রূপকই উপমা। যদি কেহ মহাবীর একিলিজের বর্ণনা করিতে গিয়া বলে যে, "সিংহ যেমন বেগে আক্রমণ করে তিনিও তদ্রূপ যোদ্ধৃবর্গকে আক্রমণ করিয়াছিলেন" তাহা হইলে এই বাক্যটি উপমার দৃষ্টান্ত হইবে। কিন্তু এরূপ ভাবে বাক্য প্রয়োগ না করিয়া যদি কেহ বলে "সেই সিংহ সেই যোদ্ধৃগণকে বেগে আক্রমণ করিয়াছিল", তাহা হইলে এই বাক্যটি রূপকের দৃষ্টান্ত হইবে। বৃদ্ধ বয়স না বলিয়া জীবনের সন্ধ্যা এই রূপ বাক্য ব্যবহার করিলে রূপক হইবে। শ্রোতৃবর্গের চিত্তাবস্থা, বক্তার স্বভাব, বিষয়ের সঙ্গতি এই সমুদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিলে ঔচিত্য অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত হয়। রূপক, বৈষম্য ও বৈশদ্য এই তিনের অবলম্বন পূর্ব্বক বর্ণিত বিষয় শ্রোতৃবর্গের নেত্রপথে আনয়ন করাই প্রতিভান অলঙ্কার।

আলঙ্কারিক আইসোক্রেটিস্ বাক্যকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম পূর্ব্বাভাস, দ্বিতীয় বিবৃতি, তৃতীয় প্রমাণ, চতুর্থ বাগ্মিতা।

আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে অগষ্টসের রাজত্ব পর্য্যন্ত কয়েক শতাব্দী মধ্যে অলঙ্কার বিদ্যার ভাগ্য গ্রীসদেশের নূতন নূতন অবস্থান্তরের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। এই সময় গ্রীক্‌গণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া এসিয়া-মহাদেশের নানা স্থানে অবস্থিতি করেন। গ্রীক্‌গণের মধ্যে অলঙ্কার বিদ্যার যে সকল নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা এসিয়া-মহাদেশে আগমন করায় বহু জাতির সংসর্গে নানাপ্রকারে রূপান্তরিত ও দূষিত হয়। এসিয়া-মহাদেশে অলঙ্কারের যে সকল নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হইল, তাহার অনুকরণ করিয়া খৃঃ পূঃ ১৯০ অব্দে হোর্‌টেন্‌সিয়াস্ প্রভৃতি বক্তৃগণ রোমপ্রদেশে অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন।

খৃঃ পূঃ ১১০ অব্দে ইয়োলিস্ দ্বীপে হারমেগোরস্ নামক কোন পণ্ডিত অলঙ্কার-বিদ্যার সমুন্নতি সাধন করেন। তিনি আরিষ্টোটলের প্রবর্ত্তিত অলঙ্কার সূত্রসমূহ এবং আরিষ্টোটলের পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকগণের নিয়মাবলী এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এক নূতন আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। আইসোক্রেটিস্ আথেন্স নগরে অলঙ্কার বিদ্যার যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, রোমনগরের অলঙ্কারবিদ্যাও হার্‌মেগোরস্‌কর্ত্তৃক তদ্রূপ উন্নতির পথে আনীত হইয়াছিল। তিনি এসিয়া মহাদেশে প্রবর্ত্তিত অলঙ্কারসূত্র-সমূহের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। মহামতি শিশিরো রোমনগরের অলঙ্কারবিদ্যার উন্নতির জন্য বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হন। ৯০ খৃষ্টাব্দে কুইন্‌টিলিয়ান্ "অরেটিয়া" নামক যে সুবৃহৎ অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন, ছাত্রগণের অলঙ্কারবিদ্যার অধ্যয়নের দ্বারাই হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের শক্তিসমূহের সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়া উচিত।

১৭০ খৃষ্টাব্দে হারমোজিনিস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অলঙ্কারবিষয়ে কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং অলঙ্কারবিদ্যার একটি ইতিহাস লেখেন। ২৬০ খৃষ্টাব্দে লঞ্জাইনস্ অলঙ্কার সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ৩১৫ খৃষ্টাব্দে এপ্থোনিয়াস্ "একসাসাইজেস্" নামক যে অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক আলঙ্কারিকের গ্রন্থকে অতিক্রম করিয়াছিল। যীশুখৃষ্টের তিরোভাবের পর ৪০০ বৎসর মধ্যে আথেন্স, স্মার্ণা, রোডস্, টার্সস্, এণ্টিয়ক্, আলেকজেন্দ্রিয়া (অলিসন্দর), ম্যাসেলিয়া এবং অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অলঙ্কারবিদ্যার সম্যক্ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয় এবং আলঙ্কারিকগণই পরমবিদ্বান্ ও সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হন। এস্থলে উল্লেখ করা উচিত ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমসম্রাট্ ভেস্পেসিয়ান্ অলঙ্কার বিদ্যার অনুশীলনের নিমিত্ত প্রত্যক্ষভাবে প্রচুরপরিমাণে আর্থিক সাহায্য করেন। তদনন্তর ১১৭ হইতে ১৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে হাড্রিয়ান্, এণ্টোনাইন্ প্রভৃতি সম্রাট্গণের সময়ে অলঙ্কারবিদ্যার প্রচারের সাহায্য করাই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। মধ্যযুগে (রোমের ধ্বংসের পর ইংরেজ-প্রভৃতি জাতির উত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা ও অলঙ্কার-শাস্ত্রই ছাত্রগণের প্রথম চারি বৎসরের পাঠ্য ছিল। তৎপর তিন বৎসর ছাত্রগণ সঙ্গীত-বিদ্যা, অঙ্ক-শাস্ত্র, জ্যামিতি ও জ্যোতিঃ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বি, এ, এম্, এ, উপাধি লাভ করিতেন। উল্লিখিত সাতটিই উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ৫৪৯ খৃষ্টাব্দে লিয়োন্তান্ককস, ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে টমাস্ উইলসন্, ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে টঙ্কুইলিন্, ১৫৭ খৃষ্টাব্দে কোর্কেলস্ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ বহুসংখ্যক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। তদনন্তর লর্ড বেকন্ যে অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাই ১৮শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় কৃতবিদ্যসমাজে সমধিক গৌরব লাভ করে। তাহার পর ক্যাম্পবেলের "অলঙ্কারদর্শন", হোয়েট্লির "অলঙ্কারমঞ্জরী" বা "এলিমেন্স অফ্ রেটরিক্" প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হওয়ায় নব্য সমাজে অলঙ্কারবিদ্যার সমধিক আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়।

বিদেশীয় অলঙ্কার-বিদ্যার সৃষ্টি ও উন্নতির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ উক্ত হইল; এখন দেশীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের স্বরূপ ও অবয়বের বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব। কাব্যের লক্ষণ, বাক্যের স্বরূপ, রস, ভাব, ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য, দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতি প্রধানতঃ অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কিন্তু এই সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। অনেক স্থলেই তাঁহাদের পরস্পর ঐকমত্য দৃষ্ট হয় না, সে সমুদয়ের সূক্ষ্ম রূপ ভেদ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

শব্দই ভাষা-সৃষ্টির উপাদান। দার্শনিক ও আলঙ্কারিকগণ ভাষার সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার তর্ক ও জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, এখানে সে সমুদয়ের আলোচনা করা অসম্ভব। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী শব্দের প্রশংসা উপলক্ষে লিখিয়াছেন;—

"এই সংসারে পূর্ব্বঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকৃতিপ্রত্যয়ভেদে সংসাধিত সংস্কৃত উক্তি ও দেশ-

কাল প্রচলিত প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রী, কর্ণাটী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি ভাষার সাহায্যেই সর্ব্বতোভাবে লোকযাত্রা সম্পন্ন হইতেছে। যদি শব্দনামক মহাজ্যোতিঃ জগৎ ব্যাপিয়া দীপ্তি প্রদান না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় ভুবন গাঢ় মোহান্ধকারে আবৃত থাকিত। কেবল শব্দের সাহায্যেই প্রাচীন ভূপাল মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির কীর্ত্তি-কলাপ ভাষারূপ আদর্শে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাঁহাদের অবিদ্যমানেও ঐ সকল আমাদের নয়ন-পথে বিরাজ করিতেছে, কখনও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় না।" *

অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে শব্দের অর্থ তিন প্রকার যথা;—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ।

১ম। বাচ্যার্থ।—সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত অর্থকে বাচ্যার্থ বলে। যেমন বানর শব্দের অর্থ লোমলাঙ্গুল-বিশিষ্ট প্রাণী। বানর শব্দের ঐরূপ সাঙ্কেতিক অর্থ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল উহা নির্ণয় করা দুরূহ। নৈয়ায়িকগণ বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাই শব্দের সঙ্কেত অর্থাৎ কোন্ শব্দে কি পদার্থ বুঝাইবে ঈশ্বরই তাহা নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষের সহস্র চেষ্টায়ও বানর শব্দের অর্থ গো অথবা অন্য কিছু হইতে পারে না। অপর দার্শনিকগণ বলেন, যদৃচ্ছাই শব্দের শক্তি। অনেক মানব সমবেত হইয়া বানর শব্দের ঐরূপ অর্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া বানর শব্দের অর্থ লোমলাঙ্গুল-বিশিষ্ট প্রাণী হইয়াছে। মনুষ্যের ইচ্ছা অন্যরূপ হইলে বানর শব্দের অর্থ অন্যরূপ হইতে পারিত; অতএব যদৃচ্ছাই শব্দের শক্তি।

২য়। লক্ষ্যার্থ।—যদি শব্দের মুখ্যার্থ দ্বারা অর্থ প্রতীতির প্রতিবন্ধক ঘটে, প্রসিদ্ধি এবং প্রয়োজন বশতঃ মুখ্যার্থ যোগে অন্য অর্থের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" গঙ্গায় ঘোষ বাস করে। এস্থলে গঙ্গার স্রোতোবিশিষ্ট জলে ঘোষের বাস অসম্ভব বলিয়া গঙ্গাশব্দের স্রোতোবিশিষ্ট জলরূপ মুখ্যার্থের বাধা হইল, কিন্তু গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে ইত্যাদির প্রসিদ্ধি আছে এবং গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেহ পবিত্র হয় এই প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল বলিয়া গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীর করা হইল।

৩য়। ব্যঙ্গ্যার্থ।—অনেকার্থ-বিশিষ্ট শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ ব্যতীত সংযোগ, বিপ্রযোগ, সাহচর্য্য, বিরোধিতা, অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, সন্নিধি, সামর্থ্য, ঔচিত্য, দেশ, কাল, ব্যক্তি, স্বর ইত্যাদি বশতঃ যে অন্য অর্থের প্রতীতি হয় তাহার নাম ব্যঙ্গ্যার্থ। যেমন "সশঙ্খ-চক্রো হরিঃ" শঙ্খচক্রবিশিষ্ট হরি। এখানে শঙ্খ ও চক্রের সংযোগে হরি শব্দে ভেক,

---

* ইহ শিষ্টানুশিষ্টানাং শিষ্টানামপি সর্ব্বথা।
বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্ত্ততে॥
ইদমন্ধং জগৎ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ং।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥
আদিরাজযশোবিম্বমাদর্শং প্রাপ্য বাঙ্ময়ং।
তেষামসন্নিধানেঽপি ন স্বয়ং পশ্য নশ্যতি॥
(কাব্যাদর্শ, ১ম পরিচ্ছেদ)

রানর, অশ্ব প্রভৃতি না বুঝাইয়া বিষ্ণুকে বুঝাইল। "রামলক্ষ্মণৌ" রামলক্ষ্মণ বলিলে লক্ষ্মণের সাহচর্য্য প্রযুক্ত রাম শব্দে পরশুরাম না বুঝাইয়া দাশরথিকে বুঝাইল।

শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে পদ নিষ্পন্ন হয়। বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট পদসমূহই বাক্য। অনেকগুলি বাক্য লইয়া প্রবন্ধ বা কাব্য বিরচিত হইয়া থাকে। প্রাচীন আলঙ্কারিক ভোজরাজ লিখিয়াছেন;—

"নির্দ্দোষ, গুণবিশিষ্ট, অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত, রসযুক্ত কাব্য রচনা করিয়া কবি কীর্ত্তি এবং প্রীতি লাভ করেন।" *

অপর আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট কাব্যের ঐরূপ লক্ষণ স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"দোষহীন গুণযুক্ত শব্দ এবং অর্থ, অলঙ্কারযুক্তই হউক অথবা অলঙ্কারবিহীনই হউক উহাই কাব্য" †। মম্মটভট্টের মতে কাব্য তিন প্রকার, যথা ;—ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও অধমকাব্য।

১ম। ধ্বনিকাব্য।—যেখানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য দৃষ্ট হইবে তাহাকে ধ্বনিকাব্য বলে। যথা ;—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
কোন্ গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন। জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ। না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।

(ভারতচন্দ্র—অন্নদামঙ্গল)

এখানে বাচ্যার্থ কুলীনকন্যার স্বামিরূপ অর্থ অপে[illegible]রূপ ব্যঙ্গ্যার্থের অধিক চমৎকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে সুতরাং ইহা ধ্বনি বা উত্তম[illegible]

২য়। গুণীভূতব্যঙ্গ্য।—যেখানে বাচ্যার্থ ও [illegible] প্রকাশ করে, অথবা বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা সমধিক [illegible] ব্যঙ্গ্য কিংবা মধ্যম কাব্য বলে। যথা ;—

এতেক কহিয়া রমা মুরলীর সহ,
রক্ষঃ-কুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী ; করে শোভিল কঙ্কণ ;

* নির্দোষং গুণবৎ কাব্যম[illegible]

এখানে বাচ্যার্থ লক্ষ্মী ও ব্যঙ্গ্যার্থ রক্ষঃকুলবালা এই উভয়েরই তুল্যরূপ চমৎকারিত্ব প্রকাশিত হওয়ায় গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হইয়াছে।

৩য়। অধম কাব্য :—যেখানে কেবল শব্দবিন্যাসের ছটা, অর্থের কোনই চমৎকারিত্ব নাই, তাহাকে অধম কাব্য বলা যায়। যথা ;—

ক্রহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহনিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশল-বলে শকুন্ত দুর্জ্জয়—
পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল ?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে
বাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।

অর্ক্ষস্নায়ুহের তলে বিক্ষত গমনে—
অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলঙ্কলাঞ্ছিত,
(সু-আশুগইরম্মদ গমে সন্‌সনে)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ সম
নড়িছে পশ্চাৎ ভাগে।

(ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য)

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের ঐরূপ লক্ষণ অঙ্গীকার করেন না। তিনি বলেন :—

"রসাত্মক বাক্যই কাব্য *।"

রস না থাকিলে বাক্যের কাব্যত্ব অঙ্গীকার করা যায় না।

"দোষ সকল কাব্যের অপকৃষ্টতা সম্পাদন করে †।"

যেমন কীট-বিদ্ধ মণির মণিত্ব বিদূরিত হয় না, তদ্রূপ শ্রুতিদুষ্টি প্রভৃতি দোষও কাব্যের কাব্যত্ব নষ্ট করিতে পারে না, তবে উহার উপাদেয়ত্বের তারতম্য সংঘটিত করিয়া থাকে।

"গুণ, অলঙ্কার, রীতি এই সমুদয় কাব্যের উৎকর্ষ সাধনের উপায় ‡।"

যেমন শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য মানবহৃদয়কে বিভূষিত করে ; হার, বলয় প্রভৃতি দেহকে অলঙ্কৃত [illegible] ওজঃ, মাধুর্য্য, প্রসাদ প্রভৃতি গুণনিচয়, বৈদর্ভী, আবন্তী পাঞ্চালী [illegible] প্রাস যমক উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার সকল

[illegible] ক্য নিচয় কাব্যই নহে। তিনি আরও বলেন, [illegible] নানারসের আস্বাদন করাইয়া নীতিমূলক [illegible]। অতএব দেখা উচিত রস পদার্থটা

[illegible] দর্পণ ১ম পরিচ্ছেদ)

"বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী এই তিনের সম্বন্ধ বশতঃ রতি, উৎসাহ, শোক প্রভৃতির অভিব্যক্তির নাম রস *।"

যেমন সর্প বিদ্যমান না থাকিলেও রজ্জু দেখিয়া সর্পজ্ঞানে দর্শকের মনে ভয়ের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কোন দৃশ্য কাব্যের অভিনয়দর্শন অথবা শ্রব্যকাব্যের পাঠ কালে যথার্থ নায়ক নায়িকা উপস্থিত না থাকিলেও নাট্যনৈপুণ্যবশতঃ অভিনেতৃগণকেই আপাততঃ নায়ক নায়িকা বলিয়া বোধ হয় এবং ঐ অভিনেতৃগণে রতি, উৎসাহ, শোক প্রভৃতি বিদ্যমান আছে মনে করিয়া দর্শকের অন্তঃকরণে একটি চমৎকার উৎপন্ন হয়, উহাই রস। ধর্ম্মদত্ত নামক একজন আলঙ্কারিক বলেন;—

† "চমৎকারিত্বই সকল রসের সার, উহা সমুদয় রসেই অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব চমৎকারিত্বই সকল রসের কারণ; সুতরাং চমৎকারিত্ব ভিন্ন রস অন্য কিছু নহে।" তিনি নারায়ণ নামক অপর একজন আলঙ্কারিকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, কৃতী নারায়ণের মতেও চমৎকারিত্বই রস। ধর্ম্মদত্ত আরও বলিয়াছেন, কাব্যের রস উপভোগ করিবার অধিকারী সকলে নহে।

‡ "যাঁহারা বাসনাদ্বারা তন্ময়চিত্ত তাঁহাদেরই রসের আস্বাদন ঘটে; বাসনাশূন্য অন্যমনস্ক সভ্যগণ কাষ্ঠখণ্ড কিংবা পাষাণস্তূপের ন্যায় রঙ্গালয়ে বিরাজ করেন। তাঁহারা ঈষন্মাত্রও রস অনুভব করিতে সমর্থ হন না।" কাব্যপ্রকাশকারের মতে রস আট প্রকার যথা;—

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত।

তিনি আরও একটি রস স্বীকার করিয়াছেন উহার নাম শান্ত। এতদ্ভিন্ন সাহিত্যদর্পণে বৎসল নামে অপর একটি অতিরিক্ত রস স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব সমুদয়ে রসের সংখ্যা দশ।

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা ও বিস্ময় এই কয়টি যথাক্রমে শৃঙ্গারাদি রসের স্থায়ী ভাব। শান্তরসের স্থায়ী ভাব বৈরাগ্য, আর বৎসল রসের স্থায়ী ভাব স্নেহ।

যাহারা রতি, হাস, শোক প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের উদ্বোধক উহাদিগকে বিভাব বলা যায়। ঐ বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। যাহাকে অবলম্বন করিয়া রসের অভিব্যক্তি হয় উহাই আলম্বন বিভাব; যেমন নায়ক নায়িকা। আর রসকে যাহারা

---

* বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ।
(কাব্যপ্রকাশ)

† রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারহেতুত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতোরসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্।
(সাহিত্যদর্পণ)

‡ [illegible]বাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ।
[illegible] রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ।
(সাহিত্যদর্পণ)

উদ্দীপিত করে উহাদিগকে উদ্দীপন বিভাব বলিতে পারা যায়; যথা শরৎকালের পূর্ণ-শশধর, মধুমাসের যামিনী, কোকিলের মধুরালাপ, ভ্রমরঝঙ্কার, শূন্যগৃহ ইত্যাদি।

স্ব স্ব কারণে সমুদ্দীপ্ত নায়ক নায়িকাদিগের অবস্থা-বিশেষকে অনুভাব বলে। যেমন ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, অশ্রুবিসর্জ্জন প্রভৃতি।

নায়ক নায়িকার চিত্তে স্থায়ী ভাব বিরাজ করিলেও অপর কতকগুলি ভাব কখন উৎপন্ন হয় কখন বা বিলয় প্রাপ্ত হয়; উহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলে। উহার অপর নাম সঞ্চারী ভাব। যেমন বৈরাগ্য, দীনতা, আবেগ, শ্রান্তি, গর্ব্ব, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, জাগরণ, স্বপ্ন প্রভৃতি।

১ম। আদিরস। এই রসের স্থায়ী ভাব রতি অথবা অনুরাগ। উহা দুইভাগে বিভক্ত যথা;—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

পরস্পর অনুরক্ত নায়ক নায়িকার দর্শন কিংবা গুণ-শ্রবণ হেতু যে বিশেষ অবস্থা হয় উহাই সম্ভোগ আদিরস বা পূর্ব্বরাগ।

এখানে নায়ক নায়িকার পরস্পর দর্শনহেতু আনুরক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব এখানে উহাই পূর্ব্বরাগ। কাব্যপ্রকাশ মতে বিপ্রলম্ভ আদিরস—অভিলাষ, বিরহ, ঈর্ষ্যা, প্রবাস, শাপ প্রভৃতি কারণ নিবন্ধন পাঁচ প্রকার *। যথা;—

অভিলাষ হেতু;—

হে সুন্দরি এ বয়সে শুনেছি অনেক
কামিনীর কণ্ঠস্বর পীযূষ লহরী,
শ্রবণ কুহর ভরে পিয়াসা জুড়ায়;
দেখেছি নিমেষশূন্য নয়নে অনেক
রমণীর অপরূপ রূপের মাধুরী;
কিন্তু আহা নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল এমন
একধারে সর্ব্বগুণ চক্ষে দেখি নাই;
রূপে গুণে সকলেরি কলঙ্কের লেশ
আছে কিছু; তুমি প্রিয়ে স্বর্গের প্রতিমা।
প্রাণেশ্বরি। প্রজাপতি গঠিলা তোমায়
ব্রহ্মাণ্ডের রূপ গুণ একত্র করিয়া।
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নলিনীবসন্ত)

বিরহ হেতু;—

কাদম্বরী শুনিবা মাত্র নিমীলিত নেত্র ও সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। অনেকক্ষণের পর নয়ন উন্মীলন করিয়া মদলেখাকে কহিলেন, মদলেখে। চন্দ্রাপীড় যে কর্ম্ম করিয়াছেন, আর কেহ কি এরূপ করিতে পারে। এই মাত্র বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তদবধি কাহারও সহিত কোন কথা কহেন নাই।

(তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী।)

ঈর্ষ্যা হেতু;—

মাধব। না কহ আদর বাণী
না কর প্রেমের নাম।
জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম।

* অপরন্তু অভিলাষবিরহের্ষ্যাপ্রবাসশাপহেতুক ইতি পঞ্চবিধঃ।
(কাব্যপ্রকাশ)

কপট। কাহ তুঁহু ঝুট বোলসি
পীরিত করসি তু মোয়?
ভালে ভালে হম্ অলপে চিহ্নমু
ন পতিয়াব রে তোয়।
তুঁহু ন জানসি প্রেমক ধারা
কঠিন হৃদয় মধুভাষী—
পরশি দেহ মম সাঁচি বোল অব
নহ তুঁহু রূপ-পিয়াসী?
যাও শ্যাম তব মিলবে শত শত
হমসে রূপসী নারী।
তুচ্ছ বালি হম্ কাহ টুটাওসি
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হমারি?
(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কৈশোরক)

প্রবাস হেতু;—

কাটালাম এতকাল সন্তাপে সন্তাপে,
সে নাম দেখিবা মাত্র তবু চিত্ত কাঁপে।
কাঁপিতে কাঁপিতে নাথ খুলি এ লিখন,
প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রু বিসর্জ্জন।
....
যত পার হেন লিপি লিখ তবে নাথ,
করিব তোমার সঙ্গে শোক-অশ্রুপাত।
মিশাইব দীর্ঘশ্বাস তোমার নিশ্বাসে,
কাঁদিব তোমার সঙ্গে চিত্তের উল্লাসে;
ঘুচাইতে এ যন্ত্রণা সাধ্য নাই কার,
তাই নিবেদন করি লিখ যত পার।
অনাথা দুঃখীর দুঃখ করিতে সান্ত্বনা,
হয়েছে লিপির সৃষ্টি বিধির বাসনা।
বুঝি কোন নির্ব্বাসিত পুরুষ প্রেমিক,
অথবা রমণী কোন প্রেমের পথিক,
ঘুচাতে বিচ্ছেদ-জ্বালা আরাধনা করে
শিখেছিল এ কৌশল বিধাতার বরে।
প্রাণ ভোরে অন্তরের কথা প্রকাশিতে
এমন উপায় আর নাই এ মহীতে।
নাসা, কণ্ঠ, চক্ষু কিম্বা ওষ্ঠে যাহা নয়,
লিপির অক্ষরে ব্যক্ত হয় সমুদয়।
খুলে দেয় একেবারে প্রাণের কপাট,
ধারেনা লজ্জার ধার থাকে না খটখট।
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মদনপারিজাত)

শাপ হেতু;

* ধাতুরাগে শিলাতলে করিয়া যতন
মান ভাঙ্গিবার ছলে তোমার চরণতলে
আপনায় নিপতিত করিব যেমন।
অমনি অশ্রুর ভরে করি নেত্র দর্ দর্
একেবারে দৃষ্টিপথ আচ্ছাদিয়া রয়।
এ রূপেও সমাগম তোমার সহিত মম
কুটিল দৈবের হৃদে সহ্য নাহি হয়॥ ৪৪॥
(মেঘদূত)

যথাক্রমে আদিরসের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, এখন উক্ত-রসের বিভাবাদি বর্ণন করা যাউক।

ফলতঃ মুনিকুমারের রূপ যতবার দেখি ততবারই অভিনব বোধ হয়। এইরূপ তাঁহার রমণীয় রূপের পক্ষপাতিনী হইয়া ক্রমে ক্রমে কুসুমশরের শর সন্ধানের পথবর্ত্তিনী হইলাম; কি মুনিকুমারের রূপসম্পত্তি, কি যৌবনকাল, কি বসন্তকাল, কি সেই প্রদেশ, কি অনুরাগ, জানি না কে আমাকে উন্মাদিনী করিল।
(তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী)

* [illegible]রাগৈঃ শিলায়াং আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
[illegible] ক্রুরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥
(কালিদাস—মেঘদূত)

এখানে নায়ক মুনিকুমারকে দেখিয়া নায়িকা মহাশ্বেতার অনুরাগ অথবা রতির উৎপত্তি হইয়াছে অতএব এ স্থলে মুনিকুমার পুণ্ডরীক আলম্বন বিভাব।

উদ্দীপন বিভাব যথা ;—

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ ;
আতর-গোলাপ-গন্ধে হইয়া বিহ্বল,
বহিতেছে ধীরে গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ।
শোভে পুষ্পাধারে স্তম্ভে, কামিনীকুন্তলে,
কোমল কামিনীকণ্ঠে কুসুমের হার ;
দেখেছ কেমন ওই সুন্দরীর গলে
শোভিয়াছে মালা, আহা দেখ একবার !
দীপমালা, পুষ্পমালা, রূপের কিরণ
করিয়াছে যামিনীর উজ্জ্বল বরণ।
মিলাইয়া সপ্তসুর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে, বিমোহিত করিয়া শ্রবণ ;
মিলাইয়া সেই সুরে শতেক নবীনা,
গাইতেছে, সপ্তস্বর ব্যাপিছে গগন।
... ...
সুকোমল মকমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে ; কামে পুনঃ জীবন বিতরি
খেলিছে বিজলী প্রায় কটাক্ষ চঞ্চল
থেকে থেকে দীপাবলী হতেছে উজ্জ্বল।
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এ স্থলে দীপমালা, পুষ্পমালা, পুষ্পাধার, নৈশ সমীরণ, কামিনীর সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রভৃতি প্রণয়ী ও প্রণয়িনীদিগের রতিকে উদ্দীপিত করিতেছে ; অতএব ঐ সমুদয় আদিরসের উদ্দীপন বিভাব রূপে বর্ণিত হইল। স্থায়ীভাবের কার্য্যকে অনুভাব বলা যায়। যথা ;—

অথবা অঙ্গনা অঙ্গ স্নিগ্ধ পরশনে
কাঁপিছে অনঙ্গ-বাণে অবশ হইয়া।
আকর্ণ টানিয়া তবে কটাক্ষের বাণ
এক সঙ্গে যত ধনী করলো সন্ধান।
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে নায়ক নায়িকার হৃদয়ে রতি উৎপন্ন হওয়ায় শরীরে কম্প এবং কটাক্ষপাত প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবগুলি প্রকাশিত হইতেছে ; অতএব এস্থলে ঐ সমুদয় আদিরসের অনুভাব।

ওই পুনঃ সুমধুর কোমল নিক্কণে,
কমল দলের মধ্যে ভ্রমরী গুঞ্জরে।
এই বোধ হয় নব প্রণয় সঞ্চারে
হইল বামার আহা। সলজ্জ বদন ;
এই হাসিরাশি দেখ অধর ভাণ্ডারে,—
প্রণয় কুসুম হ'লো বিকচ এখন।
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে নায়িকার অন্তঃকরণে রতি উৎপন্ন হইতে হইতে পরক্ষণে হাস্যের সঞ্চার হইল ; সুতরাং এস্থলে নায়িকার হাস্যই আদিরসের সঞ্চারীভাব হইয়াছে।

২য় বীররস। বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ, প্রতিদ্বন্দ্বী আলম্বন বিভাব ও প্রতিপক্ষের চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। সহায় অন্বেষণ প্রভৃতি অনুভাব এবং ধৈর্য্য, গর্ব্ব, বিতর্ক, স্মৃতি, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সঞ্চারীভাব। বীররস দয়া, ধর্ম্ম, দান ও যুদ্ধ ভেদে চারি প্রকার। এই রস উৎকৃষ্ট পুরুষে বর্ণনীয় যথা ;—

রুদ্রপীড় ক্রোধে দহে,
বীরের উচিত ধর্ম্ম
বাসবনন্দনে কহে,
তুই কি জানিবি বল সমরের প্রথা

সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ,
সমূহ অমরবর্গ,
এখন সে অতি তুচ্ছ অমরের দাস ;
ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভু-পত্নী-পাশ।
কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ ;
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে প'ড়ে হারায়ে সম্বিৎ॥
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বৃত্রসংহার)

এখানে নায়ক রুদ্রপীড়ের বাক্যে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব ইহা বীররস।

অথবা ক্ষুধার্ত্ত-ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন,
দলি গুল্ম লতাবন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।
তেমতি নবাব সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি
একস্রোতে অস্ত্র ধরি
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম।
অকস্মাৎ একবারে শতেক কামান,
করিল অনল বৃষ্টি,
ভীষণ সংহার দৃষ্টি,
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হ'ল তিরোধান।
অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয় মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ
আসিল তুরঙ্গোপরে রক্ষিতে সেনায়।
সম্মুখে সম্মুখে বলি সরোষে গর্জ্জিয়া ;
করে অসি তীক্ষ্ণধার ;
ত্রিটিশের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিতপ্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে বিপক্ষ নবাব সৈন্য আলম্বন বিভাব এবং কামান দ্বারা অগ্নিবৃষ্টি উদ্দীপন বিভাব ও ক্লাইবের উৎসাহবাক্য এবং অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি অনুভাব।

ফিরে যাব ? কোথা যাব ? স্বদেশে আমার ?
বৎসরের পথ বল যাইব কেমনে ?
ওই ভাগীরথী নদী না হইতে পার,
আক্রমিবে কালসম দুরন্ত যবনে ;
জনে জনে নিজ হস্তে বধিবে জীবনে,
অথবা করিবে বন্দী রাজকারাগারে ;
কাঁদি যদি দীনভাবে পড়িয়া চরণে
জীবন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে কাহারে।
কি কাজ পলায়ে তবে শৃগালের প্রায়,
যুঝিব শুইব রণে অনন্ত শয়ায়।
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে নায়ক ক্লাইবের ধৈর্য্য, বিতর্ক প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব।

৩য়। করুণ রস। প্রিয় ব্যক্তি বিনাশ ও অনিষ্ট সংঘটন হেতু করুণরসের উৎপত্তি হয়। শোক এই রসের স্থায়ী ভাব। শোচ্য আলম্বন বিভাব। শোচ্যব্যক্তির দাহাদি অবস্থা উদ্দীপন বিভাব। দৈবনিন্দা, ভূপতন, ক্রন্দন প্রভৃতি অনুভাব। বৈরাগ্য, মোহ, গ্লানি, স্মৃতি, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা ;—

উত্তরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহ স্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন আভরণ, বিতরিলা সবে।

প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুর ভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা ;—লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা-স্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি। মায়েরে মোর হায়রে বহিল
সহসা নয়নজল। নীরবিলা সতী ;
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ)

এস্থলে প্রমীলার প্রিয়পতি মেঘনাদের বিনাশে করুণরসের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রমীলার শোক করুণ রসের স্থায়ী ভাব। মৃত মেঘনাদ আলম্বন বিভাব এবং তাঁহার দাহাদি অবস্থা উদ্দীপন বিভাব। প্রমীলার মরণের সঙ্কল্প, বিষাদ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

৪র্থ। হাস্যরস। বিকৃত আকার, বিকৃত বেশ এবং বিকৃত চেষ্টা জন্য হাস্যরসের উৎপত্তি হয়। ইহার স্থায়ী ভাব হাস। বিকৃত আকার, বিকৃত বেশ এবং বিকৃত চেষ্টা দেখিয়া লোকে যে হাস্য করে, উহাই আলম্বন বিভাব। আর তাহাদের কার্য্য উদ্দীপন বিভাব। চক্ষুঃসঙ্কোচ, দন্ত-বিকাশ প্রভৃতি অনুভাব। নিদ্রা, আলস্য, অবহিত্থা (ভাকামী) প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা ;—

তখন হোল মহাতর্ক
পণ্ডিতেরা পক্ক,
দিলেন নানান্ মত সবে নানান্ শাস্ত্র দেখে,
আওড়ালেন বহু শ্লোক বেদ পুরাণ থেকে ;
বিদ্যারত্ন খুঁজিলেন ব্যাস ; তর্করত্ন তিনি
খুঁজেন বোপদেব ; খুঁজেন গোস্বামী পাণিনি ;
শিরোমণি অলঙ্কার ; আর ন্যায়রত্ন
খুঁজেন ন্যায়শাস্ত্র খানি করে অতি যত্ন ;
স্মৃতিরত্ন খোঁজেন পুরাণ ; শ্রুতি বৃহস্পতি ;
জ্যোতিষশাস্ত্র খুজেন ব্রজনাথ সরস্বতী ;
—লাগিলেন ক্রমেই সে সভার প্রতি সভা,
প্রকাশ করিতে স্বীয় স্বীয় যা মন্তব্য।
সে যজ্ঞে সে কর্ম্মে
সে তর্কে সে হর্ম্মে.
পণ্ডিতেরা মৎস্যবৎ হয়ে গেলেন ঘর্ম্মে
ক্রমেই সে তর্ক হয়ে উঠলো চরম,
সেই সবার মেজাজ হলো গরম।

ক্রমেই সবাই পরস্পরের অজ্ঞতা সম্বন্ধে
কল্লেন ব্যক্ত তথা,
বহু উদার কথা ;
ক্রমে সবার টিকি ঘোর আন্দোলিত স্কন্ধে ;
... ...
পরিধেয় পশ্চাতের বা সম্মুখের অংশ,
(কাছাকোঁচা) অনেকেরই হইল ত ভ্রংশ ;
পরস্পরের কেশে,
ধোরে অবশেষে,
করে দিলেন পরস্পরের চুলেরও নির্ব্বংশ ;
(—যদিও তাঁহাদের কেশ করিবারে ছিন্ন,
ছিলনা বড় বেশী কিছু এক এক টিকি ভিন্ন,
তবু সে প্রসঙ্গ
হয়ে গেল ভঙ্গ,
বেড়ে গেল অনেকেরই টাকের চাকচিক্য,
মস্তকে বাড়িল আরো চুলের দুর্ভিক্ষ।)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়—ভাটপাড়ার সভা।

এখানে পণ্ডিতগণের বিকৃত আকার, বিকৃত বেশ ও বিকৃত চেষ্টায় হাস্যরসের উৎপত্তি হইয়াছে। দর্শকগণ আলম্বন বিভাব। টিকিসঞ্চালন, পরিধেয় বসনের সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগের ভ্রংশ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। দন্তবিকাশ, চক্ষুঃসঙ্কোচ আদি ব্যভিচারী ভাব।

৫ম। রৌদ্ররস। রৌদ্ররসের স্থায়ী ভাব ক্রোধ। শত্রু আলম্বন বিভাব এবং শত্রুর উদ্যোগ, মুষ্টিপ্রহার প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। ভ্রূভঙ্গ, ওষ্ঠনির্দ্দংশন, বাহু-স্ফোটন, তর্জ্জন প্রভৃতি অনুভাব। মোহ, অমর্ষা আদি ব্যভিচারী ভাব।

ত্যজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ আতঙ্কে। ... ...
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে ... ...
নয়ন। হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি রিপু,
ইন্দ্রজিৎ খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে রাক্ষস-কুলভরসা, পরুষবচনে
শোণিতার্দ্র। থর থরি কাঁপিলা বসুধা ; কহিলা লক্ষ্মণশূরে ;—বীরকুলগ্লানি,
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু। ভৈরব আরাবে সুমিত্রানন্দন আমি, না ডরি শমনে।
সহসা পূরিল বিশ্ব। ত্রিদিবে পাতালে, কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
মর্ত্ত্যে অমরাবতী জীব প্রমাদ গণিলা পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে।
(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ)

এখানে লক্ষ্মণ আলম্বন বিভাব। তাঁহার অসি নিষ্কোষিত করা উদ্দীপন বিভাব। মেঘনাদের তর্জ্জন গর্জ্জন অনুভাব ; আর তাঁহার রণক্ষেত্রে পতন, পরুষ বাক্য প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

৬ষ্ঠ। অদ্ভুতরস। অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দর্শনে অথবা অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্যশ্রবণে অদ্ভুতরস হয়। বিস্ময় এই রসের স্থায়ী ভাব। অলোকসামান্য বস্তু আলম্বন বিভাব এবং সেই বস্তুর গুণাদির মহিমা উদ্দীপন বিভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ স্বরে কথন, সম্ভ্রম, নেত্র-বিকাশ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব। বিতর্ক-আদি ব্যভিচারী ভাব। যথা ;—

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজলি, আকাশের গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী,
(দেখেছে শূন্যেতে পণ্ডিতমণ্ডলী) অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি ;
জগৎব্রহ্মাণ্ড করিবে গ্রাস। অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শূন্যময়,
একি ভয়ঙ্কর—বিশ্ব চরাচর, সমুদ্র, পবন, প্রাণী সমুচ্চয়,—
সোম, শুক্র, বুধ, মহী, শনৈশ্চর,— এমন পৃথিবী হবে বিনাশ।
বিদ্যুৎ অনলে হবে বিনাশ। (শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রলয়)

সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক অদ্ভুত বিদ্যুদাকৃতি জ্যোতি নির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিতেছে, এই অশ্রুতপূর্ব্ব সংবাদ শ্রবণে অদ্ভুতরসের প্রকাশ হইয়াছে। সেই অলোক-সামান্য জ্যোতির রেখাই আলম্বন বিভাব এবং তাহার জগৎবিধ্বংসী গুণের মহিমাই এখানে উদ্দীপন বিভাব। ঐ বিষয়ের জন্য সম্ভ্রম, কথন প্রভৃতি অনুভাব ; আর উহা লইয়া বিতর্ক আদি ব্যভিচারী ভাব।

৭ম। ভয়ানক রস।—ভয়ানক রসের স্থায়ী ভাব ভয়। স্ত্রীলোক অথবা নীচপ্রকৃতি পুরুষে এই রস বর্ণনীয়। যাহা হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়, উহাই আলম্বন বিভাব। ঘোরতর চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। বিবর্ণতা, গদ্গদস্বরে কথন, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ, কম্প, চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ, ঘৃণা, আবেগ, সম্মোহ, সন্ত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, সম্ভ্রম, মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা ;—

ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
সম্বরেণ বস্ত্র সীতা পলাবার আশে॥
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত॥
ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা॥
(কৃত্তিবাস—রামায়ণ)

এখানে ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সীতার মনে ভয়ের উদ্রেক হওয়াতে ভয়ানক রস হইয়াছে। সীতার ভয় ইহার স্থায়ী ভাব। রাবণের ঘোরতর চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। সীতার পলায়নের চেষ্টা, সন্ত্রাস, সম্ভ্রম প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

৮ম। বীভৎস রস।—বীভৎস রসের স্থায়ী ভাব ঘৃণা। দুর্গন্ধ মাংস মেদ প্রভৃতি আলম্বন বিভাব। ঐ সকল বস্তুতে কৃমিপাতাদি উদ্দীপন বিভাব। নিষ্ঠীবন ত্যাগ প্রভৃতি অনুভাব। মোহ, আবেগ, ব্যাধি, মরণ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

অজীর্ণ ভোজনদ্রব্য উগারি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য। ... ...
... ...
তার পাশে দুষ্ট কাম বিগলিত দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
... ...
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগারে,
কাশি কাশি দিবানিশি হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া। বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি ;
মুখ মলদ্বারে বহে লোহের লহরী।
(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদ বধ)

এখানে অজীর্ণ ভোজনদ্রব্যাদির বর্ণনায় বীভৎস রস হইয়াছে। উদ্গার, বিগলিত দেহ, শোণিত প্রবাহ প্রভৃতি আলম্বন বিভাব। উদ্গার করিয়া পুনরায় ভক্ষণ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব।

৯ম। শান্তরস। শান্তরসের স্থায়ী ভাব শম। ইহা উত্তমপ্রকৃতি ব্যক্তিতে বর্ণনীয়। অনিত্যতাহেতুক সংসারে অসারতাজ্ঞান এবং পরমাত্মস্বরূপ ইহার আলম্বন বিভাব। পুণ্যাশ্রম, তীর্থক্ষেত্র, রম্যকানন, মহাপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। রোমাঞ্চ আদি কার্য্য অনুভাব। বৈরাগ্য, হর্ষ, স্মরণ, সুমতি, জীবে দয়া প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা ;—

দেখ হে ভাবিয়া পাবে ভবপরিচয়,
অসার সংসার মাঝে কেউ কারু নয় ;
কোথায় তোমার এবে সেই পুত্রবর ?
অন্তর হইতে যে না হইত অন্তর।
সন্তোষদায়িনী তব রমণী কোথায় ?
নয়নে নয়নে সদা রাখিতে যাহায়।
দেখিলে জানিলে এবে সে জনার গুণ,
বিমুখে ও মুখে জ্বেলে দিয়াছে আগুন।

একত্রে যে মিত্রগণ থাকিত তোমার,
পবিত্র প্রণয়-রস-পানে অনিবার।
আর কি ভাবিবে তারা তোমায় মনেতে?
কদিন হয়েছ ছাড়া তাদের সনেতে?
যেই বিধি করিয়াছে এ বিধি সৃজন,
অতএব লও সদা তাঁহার শরণ।
(শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাবশতক)

এখানে শান্তরস হইয়াছে। শম উহার স্থায়ী ভাব। অনিত্যতাহেতু সংসারের নশ্বরতা-জ্ঞান আলম্বন বিভাব। শব-দর্শন উদ্দীপন বিভাব। রোমাঞ্চ আদি অনুভাব। বৈরাগ্য, স্মৃতি, সুমতি প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশে যে নয়টি রসের বিষয় উক্ত হইয়াছে, উহা ব্যতীত সাহিত্য-দর্পণকার বৎসল নামক আর একটি অতিরিক্ত রস স্বীকার করিয়াছেন।

১০ম। বৎসল রস।—সন্তানাদির প্রতি পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের যে স্বভাবসিদ্ধ বাৎসল্য তাহাকেই বৎসল রস বলে। স্নেহ ইহার স্থায়ী ভাব। পুত্রাদি আলম্বন বিভাব। উহাদের চেষ্টা, বিদ্যা, শৌর্য্য প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। আলিঙ্গন, অঙ্গস্পর্শ, মস্তকচুম্বন, দর্শন, পুলক, আনন্দ, বাষ্প প্রভৃতি অনুভাব এবং ঐ পুত্রাদির অনিষ্টাশঙ্কা, হর্ষ, গর্ব্ব আদি ব্যভিচারী ভাব। যথা;—

মহিষী। কে তোমার বোঝে
মা আমার। কথা শুনে জানিনা কেন যে
চক্ষে আসে জল। যে দিন আসিলি কোলে
বাক্যহীন মূঢ় শিশু, ক্রন্দনকল্লোলে
মায়েরে ব্যাকুল করি, কে জানিত তবে
সেই ক্ষুদ্র মুগ্ধ মুখে এত কথা কবে,
দুই দিন পড়ে থাকি তোর মুখ চেয়ে।
(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মালিনী)

এখানে রাজমহিষী রাজকন্যা মালিনীর জননী। তাঁহার স্বীয় কন্যার প্রতি বাৎসল্য এখানে বৎসল রসের স্থায়ী ভাব। কন্যা মালিনী আলম্বন বিভাব এবং তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও জ্ঞানবৈরাগ্যের কথা উদ্দীপন বিভাব, বাষ্পবারিত্যাগ প্রভৃতি অনুভাব।

উপরিভাগে রসের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, উহা ব্যতীত ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশবলতা প্রভৃতিও অন্তঃকরণে রসের উদ্রেক করে বলিয়া ইহারাও রস নামে অভিহিত।

ভাব।

যে স্থলে সঞ্চারী ভাব স্থায়ী ভাব অপেক্ষা প্রধানরূপে বর্ণিত হয়, কিংবা দেবতা, গুরু জন, রাজা প্রভৃতির প্রতি যেখানে সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশিত হয়, অথবা যেখানে স্থায়ী ভাবেরই উদ্বোধ হয়, বিভাবাদি সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না, এরূপ স্থলকে ভাব বলে। যথা;—

কোথায় ভাসিয়া গেল; হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন।
... ...
আবার সে শুদ্ধ, ভেদি সঙ্গীত তরঙ্গ
গেল নবাবের কাণে বজ্রনাদ করি;
ঘুরিল মস্তক, ভয়ে কাঁপিতেছে অঙ্গ,
শিরস্ত্রাণ প'ড়ে ভূমে দিল গড়াগড়ি।
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এ স্থলে নবাব আমোদে প্রমত্ত ছিলেন; হঠাৎ কামানের শব্দে তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল; অতএব এখানে আদিরসের স্থায়ী ভাব রতির মধ্যে উহার বিরোধী ভয়ানক রস তদপেক্ষা প্রধানরূপে বর্ণিত হওয়ায় ভাব হইয়াছে।

ডাক বীণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক রে আনন্দভরে জড় জীব দেহ মন যা হইতে প্রকটন
নারদ ভুলে না যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে। অনুক্ষণ সেই রূপ হৃদি মাঝে জাগা রে।
সকলের মূলাধার সকল মঙ্গল সার, পাই যেন পুনরায় পূজিতে সে রাঙ্গা পায়
নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে॥ জগৎ মধুর করি তারা নাম শুনা রে॥

(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দশমহাবিদ্যা)

এখানে দেবতা বিষয়ে নারদের অত্যন্ত অনুরাগ (রতি) প্রকটিত হইয়াছে অতএব ইহাও ভাবের অন্যতম উদাহরণ।

শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে। পাদুকায় অভিষেক করিয়া যথায়।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে॥ চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়॥

কৃত্তিবাস—রামায়ণ।

এখানে ভরতের গুরুজন জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং ইহাও ভাবশব্দবাচ্য।

শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়। ... ...
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায়॥ ... ...
চল সবে দেখি গিয়া রামের চরণ। বহু পুণ্যে পাই প্রভু তোমা হেন রাজা।
যুড়াইব নয়ন সুতৃপ্ত হবে মন॥ জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজা॥
মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইল দস্তাল। (কৃত্তিবাস—রামায়ণ)
বানর ছত্রিশ কোটি বিক্রমে বিশাল॥

এই স্থলে রাজা রামের প্রতি জনসাধারণের অতিশয় রতি (অনুরাগ) বর্ণিত হওয়ায় ভাব হইয়াছে।

এক ভুজবল্লী শোভে পতিকণ্ঠতলে, থেকে থেকে তিতি বালা নয়নের জলে,
অঞ্চল করে মুছে নাথ-বদন-মণ্ডল; প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল।

(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে বিভাবাদি কিছু সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না, কেবল স্থায়ী ভাবেরই কার্য্য প্রকটিত হইতেছে অতএব ইহাও ভাব

রসাভাস ও ভাবাভাস।

অনুচিত বিষয়ে রসের বর্ণনা করিলে রসাভাস হয় এবং ভাবের বর্ণনা করিলে ভাবাভাস হয়। অনুচিত বিষয় যথা;—

(১) উপনায়কে, গুরুপত্নীতে, বহুনায়কে এবং প্রতিনায়কে রতির বর্ণনা।

(২) অধম পাত্র তির্য্যক্‌জাতি প্রভৃতিতে আদি রসের বর্ণনা।

(৩) গুরুজনকে লক্ষ্য করিয়া রৌদ্ররসের বর্ণনা।
(৪) হীন ব্যক্তিতে শান্তরসের বর্ণনা।
(৫) গুরু প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া হাস্যরসের বর্ণনা।
(৬) ব্রহ্মবধ ও নিরপরাধ ব্যক্তির বধে উৎসাহ।
(৭) অধম পাত্রে বীররসের বর্ণনা।
(৮) নীচ ব্যক্তিতে বীররসের বর্ণনা।

ভাবশান্তি।

যেখানে পূর্ব্বোদিত ভাবের নিবৃত্তি হয় তাহাকে ভাবশান্তি বলে।

ভাবোদয়।

যে স্থলে এক ভাবের পর অন্য ভাবের উদয় হয় উহাকে ভাবোদয় বলে।

ভাবসন্ধি।

যেখানে দুই ভাবের পরস্পর মিলন হয় তাহাকে ভাবসন্ধি বলে।

ভাবশবলতা।

বহু ভাবের একত্র মিলনকে ভাবশবলতা বলা যায়।

রসের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল এখন কাব্যের রীতি বর্ণিত হইতেছে।

রীতি।

কাব্যে পদনিচয়ের সংস্থানপ্রণালীই রীতি নামে অভিহিত। ইহা অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। যে সময়ে দণ্ডী কাব্যাদর্শ নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করেন, তখন কাব্য রচনার দুইটি রীতিই প্রধানরূপে প্রচলিত ছিল। যথা;—বৈদর্ভী ও গৌড়ী। * কিন্তু বামন পাঞ্চালী নামক আর একটী রীতি স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে রীতি তিনটি। ভোজরাজ তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণে আবন্তী, লাটী, মাগধী নামে আরও অতিরিক্ত তিনটি রীতির বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে রীতির সংখ্যা ছয়। † কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট রীতিবিষয়ে বামনের মত অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে রীতি চারি

---

* অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্।
তত্র বৈদর্ভগৌড়ীয়ৌ বর্ণ্যেতে প্রস্ফুটান্তরৌ॥
(দণ্ডী—কাব্যাদর্শ)
তত্রাসমাসা নিঃশেষশ্লেষাদিগুণগুম্ফিতা।
বিপঞ্চীস্বরসৌভাগ্যা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে।
(ভোজরাজ—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

† বিদর্ভ বর্ত্তমান নাগপুরপ্রদেশ।

প্রকার যথা ;—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটিকা। আমরা এস্থলে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের মত অনুসরণ করিয়া যথাক্রমে ছয় প্রকার রীতিরই উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

১। বৈদর্ভী রীতি।

যে রচনায় সমাসবিহীন, শ্লেষগ্রথিত, মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট পদের প্রয়োগ থাকে তাহার নাম বৈদর্ভী রীতি। বোধ হয় বিদর্ভ প্রদেশে এইরূপ লেখন-ভঙ্গী সমধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, সুতরাং ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। (১)

২। পাঞ্চালী রীতি।

যে রচনায় সমাসযুক্ত এবং ওজঃ ও কান্তিগুণ বিবর্জ্জিত মধুর সুকোমল পদের প্রয়োগ থাকে, উহাই পাঞ্চালী রীতি নামে অভিহিত (২)। পঞ্চাল দেশে (৩) এইরূপ রচনা পদ্ধতি সমধিক পরিমাণে প্রচলিত থাকায় উহা পাঞ্চালী রীতি নামে বিশ্রুত হইয়াছে।

৩। গৌড়ী রীতি।

যে রচনায় অধিক পরিমাণে সমাসযুক্ত ওজঃ ও কান্তিগুণযুক্ত পদের প্রয়োগ থাকে তাহাই গৌড়ী রীতি নামে অভিহিত (৪)। গৌড়দেশে (৫) এই প্রকার রচনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল তজ্জন্য ইহা গৌড়ী রীতি নামে অভিহিত।

৪। আবন্তী রীতি।

পাঞ্চালী ও বৈদর্ভী রীতির মিশ্রণকে আবন্তী রীতি বলা যায়। এই রীতিতে যে সকল গদ্য পদ্য লিখিত হয় উহাতে দুই কিংবা তিন পদে সমাসযুক্ত পদের ব্যবহার থাকে (৬)। অবন্তী প্রদেশে (৭) এইরূপ রচনা-ভঙ্গী প্রচলিত ছিল বলিয়া এইরূপ রচনা-পদ্ধতি আবন্তী রীতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

---

(১) যে কবির জন্মভূমি যে দেশে, তিনি যে সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়া কাব্য লিখিতেন তাহা নহে। এক দেশের কবি স্বেচ্ছাক্রমে অন্য দেশের রীতিরও অনুসরণ করিতেন। মহাকবি কালিদাসের লীলাক্ষেত্র অবন্তী ; কিন্তু তিনি বিদর্ভ দেশের রীতি অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

(২) সমস্ত পঞ্চপদামোজঃকান্তিবিবর্জ্জিতাম্।
মধুরাং সুকুমারাঞ্চ পাঞ্চালীং কবয়ো বিদুঃ॥
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

(৩) পঞ্চালদেশ—বর্ত্তমান কান্যকুব্জ।

(৪) সমস্তাতুাল্পটপদামোজঃকান্তিগুণান্বিতাম্।
গৌড়ীয়েতি বিজানন্তি রীতিং রীতিবিচক্ষণাঃ॥
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

(৫) গৌড়দেশ—বঙ্গদেশ। মতান্তরে অযোধ্যা কান্যকুব্জ প্রভৃতি প্রদেশকে বুঝায়।

(৬) অন্তরালে তু পাঞ্চালীবৈদর্ভ্যোর্যাবতিষ্ঠতে।
সাবন্তিকা সমস্তৈঃ স্যাদ্দ্বিত্রৈশ্চিচতুরৈঃ পদৈঃ॥
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

(৭) অবন্তীপ্রদেশ—মালব অর্থাৎ মধ্যভারতবর্ষ ; উহার রাজধানী উজ্জয়িনী।

৫। লাটী রীতি।

পূর্ব্বোক্ত সমুদয় রীতি যাহাতে আংশিকরূপে বিরাজমান, তাহাকে লাটী রীতি বলা যায় *। পূর্ব্বকালে লাটদেশে † এইরূপ রীতিতে লেখা হইত বলিয়া ইহা লাটী রীতি নামে কথিত হইয়া থাকে।

৬। মাগধী রীতি।

যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত রীতি সকল ব্যতীত কোন নূতনতর রীতি অবলম্বিত হয়, তাহাকে মাগধী রীতি বলে। পূর্ব্বে মগধ প্রদেশে ঐরূপ রচনাভঙ্গী প্রচলিত ছিল, সুতরাং উহা মাগধী রীতি নামে অভিহিত হইয়াছে।

প্রকৃত ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ে কোন বঙ্গীয় লেখকই কোন নির্দ্দিষ্ট রীতির অনুসরণ করেন না, তাঁহাদের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক অবাধে লেখনী পরিচালনা করিয়া থাকেন। [illegible] সময়ে ঐরূপ প্রথা প্রায় ছিল না; তাঁহারা প্রথম হইতেই [illegible] তৃপ্তি লাভ করিতে পারি[illegible] নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া চিরকাল অভ্যস্ত পদবী[illegible] বাণভট্ট, ভবভূতি [illegible] আমরা কালিদাস,

কাব্যের দোষ।

[illegible] পদ্য গদ্যের

যাহারা কাব্যের অপকৃষ্টতা সম্পাদন করে, তাহারা দোষ নামে [illegible] প্রণেতা দণ্ডীর মতে কাব্যের দোষ দশটী §; তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ দোষটি দ্বাদশ [illegible] সরস্বতীকণ্ঠাভরণ গ্রন্থকর্ত্তা ভোজরাজ প্রথমেই কাব্যের দোষের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। তিনি পদগত বাক্যগত এবং বাক্যার্থগত ষোড়শ ¶ প্রকার দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকারের মতে দোষের সংখ্যা অশীতি প্রকারেরও অধিক। শেষোক্ত আলঙ্কারিক কালিদাস হইতে তাঁহার সমসাময়িক কবিগণ পর্য্যন্ত সকলেরই দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ সকল দোষবর্জ্জিত কাব্য যে সর্ব্বোত্তম তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; তবে কবিরা কাব্য নির্ম্মাণকালে রস ও ভাবে এতদূর বিভোর হইয়া পড়েন যে, সকলের পক্ষে ঐ সকল দোষের সংস্পর্শ হইতে বিমুক্ত থাকা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সংস্কৃতভাষার আদর্শ ও উপকরণ

---

* সমস্তরীতিব্যামিশ্রা লাটী বা রীতিরিষ্যতে। (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

† লাটদেশ—গুর্জ্জর বা গুজরাট প্রদেশ।

‡ দোষাস্তদ্ব্যাপকর্ষকাঃ। (সাহিত্য-দর্পণ)

§ ইতি দোষা দশৈবৈতে বর্জ্যাঃ কাব্যেষু সূরিভিঃ। (কাব্যাদর্শ—৩য় পরিচ্ছেদ)

¶ দোষাঃ পদানাং বাক্যানাং বাক্যার্থানাঞ্চ ষোড়শ।
হেয়াঃ কাব্যে কবীন্দ্রৈর্যে তানেবাদৌ প্রচক্ষ্মহে। (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

লইয়া বঙ্গভাষা নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব আমরা সংস্কৃতভাষার দোষ গুণ রীতি অলঙ্কার প্রভৃতি সমুদয়ই বঙ্গভাষায় প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যে সকল দোষের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি দোষ বঙ্গভাষায় থাকা একান্ত গর্হিত। কতক গুলি থাকিলেও তত অধিক হানি হয় না।

যে সকল দোষ থাকিলে বঙ্গভাষার কাব্যগুলিও নিতান্ত হেয় ও অপ্রীতিকর হয়, আমরা প্রধানতঃ সেই সকল দোষের মধ্যে কয়েকটি দোষের উল্লেখ করিতেছি।

১। দুঃশ্রবত্ব। কঠোর বর্ণের প্রয়োগ নিবন্ধন যাহা শুনিতে অতিশয় ক্লেশ বোধ হয়, উহাকে দুঃশ্রবত্ব দোষ বলে। চলিত বাঙ্গালাভাষায় উহার নাম শ্রুতিকটুতা দোষ। যথা ;—

(ক) সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে। (গ) বাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
(খ) বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ প্রক্ষেড়নথ[illegible] (ঘ) লক্ষ রক্ষঃ শিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া।

উদ্ধৃত স্থল সমূহে কঠো[illegible] শ্রবত্ব বা শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটিয়াছে।

২। অশ্লীলতা [illegible] ও অমঙ্গলের জনক বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে [illegible]লমণি। ক্ষুদ্র ও কমলপাতে বৃথা যত্ন বৃথা চেষ্টা ওরে অ[illegible] [illegible]ল রাখিতে গিয়ে,

[illegible]জনক অশ্লীলতা দোষের উদাহরণ। এইরূপ ঘৃণা ও অমঙ্গল জনক [illegible]ষের উদাহরণও বিস্তর আছে, বাহুল্য প্রযুক্ত এখানে উহা উদ্ধৃত হইল না।

৩। চ্যুতসংস্কৃতি। ব্যাকরণ-দুষ্ট পদপ্রয়োগে চ্যুতসংস্কারতা বা চ্যুতসংস্কৃতি দোষ হয়।

ক। ঐশ্বর্য্যশালিনী পুরব প্রদেশ।
খ। আমোদে পূর্ণিত হ'ত সঙ্গীত হিল্লোল।
গ। অভাগিনী বঙ্গ প্রতি বলিতে না পারি।
ঘ। পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী স্বাধীন নরক বাস।
ঙ। দোষী বিধি, দোষী মন্দভাগিনী ভারত।

৪। অপ্রযুক্ততা। যে শব্দ অভিধানে পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কবিরা প্রায় ব্যবহার করেন নাই, উক্ত শব্দের প্রয়োগে অপ্রযুক্ততা দোষ হয়। যথা ;—

ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥

উষর্বুধ (অগ্নি), নাক (স্বর্গ), নির্জ্জর (দেবতা), এই তিনটি অভিধানে আছে; কিন্তু বাঙ্গালা কবিতায় প্রায় প্রযুক্ত দেখা যায় না। অতএব এস্থলে ঐ কয়টি শব্দের প্রয়োগ নিবন্ধন অপ্রযুক্ততা দোষ হইয়াছে।

৫। অসমর্থতা। যে শব্দে যে অর্থ বুঝায় না, সেই শব্দ সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা দোষ হয়

আমার বাক্যেতে দেহ রাধার নন্দন।
বিরাট-তনয় বুঝি কর বিতরণ॥

এখানে রাধার নন্দন অর্থে কর্ণবীর, শ্রবণেন্দ্রিয় নহে; এবং বিরাটতনয় অর্থে মৎস্যরাজের পুত্র, কিন্তু কথার উত্তর নহে; অতএব এস্থলে অসমর্থতা দোষ হইয়াছে।

৬। ক্লিষ্টতা। দীর্ঘ সমাস অথবা দুরান্বয় প্রযুক্ত অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটিলে ক্লিষ্টতা দোষ হয়।

ক্ষীরোদতনয়াপতিবাহনের ডরে।

ক্ষীরোদ—ক্ষীর সমুদ্র, তাহার তনয়া—লক্ষ্মী, তাঁহার পতি—বিষ্ণু, তাঁহার বাহন—গরুড়। এস্থলে দীর্ঘ সমাস প্রযুক্ত ক্লিষ্টতা দোষ হইয়াছে।

৭। নিরর্থকতা। যে পদের কোন সার্থকত[illegible] পদের প্রয়োগে নিরর্থকতা দোষ হয়। যথা;—

সকলেই সমভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ।

এখানে সদা সর্ব্বক্ষণ এই পদের এ[illegible]

৮। পুনরুক্ততা। ভিন্ন ভি[illegible] পুনরুক্ততা দোষ হয়। যথা;—

সে শোভা তাহারি, রূপের [illegible]

এস্থলে এক শোভার বিষয় উল্লেখ [illegible] করায় পুনরুক্ততা দোষ ঘটিয়াছে।

৯। নিহতার্থতা। নানাঅর্থবিশিষ্ট শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ [illegible] নিহতার্থতা দোষ হয়।

তোমার গোরসে গো পাইব করতলে।

এখানে প্রথম গো শব্দের অর্থ বাক্য; দ্বিতীয় গো শব্দের অর্থ স্বর্গ। গো শব্দের এই দুইটি অর্থই বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং এখানে নিহতার্থতা দোষ ঘটিয়াছে।

১০। সন্দিগ্ধতা। যে স্থলে কোন পদের অর্থ এইরূপ কি অন্যরূপ বলিয়া সন্দেহ জন্মে, তাহার নাম সন্দিগ্ধতা।

কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে। [illegible] ভুরুভঙ্গে ভুলে।

[illegible] হেতুক যে

নির্ম্মিত কামধনুঃ যে বক্রতা, তাহাতে কোন ফল নাই। এইস্থলে এতদুভয়ের কোন্ অর্থ প্রকৃত এরূপ সন্দেহ হওয়ায় সন্দিগ্ধতা দোষ ঘটিয়াছে।

১১। খ্যাতিবিরুদ্ধতা। প্রাচীন কবিদিগের সময় হইতে কতকগুলি বিষয় খ্যাত আছে, ঐ সকল বিখ্যাত বিষয়ের বর্ণনাকে খ্যাতিবিরুদ্ধতা দোষ বলা যায়। কবি-সময় খ্যাত বিষয় যথা—আকাশ ও পাপে মালিন্য, যশঃ হাস্য এবং কীর্ত্তিতে শুভ্রতা, ক্রোধ ও রাগে রক্তবর্ণতা, নদী এবং সাগরে পদ্ম ও নীলপদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়া, সমুদয় জলাশয়েই মরাল প্রভৃতি পক্ষি-সমূহের বিচরণ, চকোর ও চকোরীর জ্যোৎস্নাপান, বর্ষাকালে হংসগণের মানস সরোবরে প্রস্থান, যথাক্রমে যুবতীগণের পদাঘাতে ও মুখমদ্যের অভিষেকে অশোক এবং বকুল কুসুমের বিকাশ, বিরহতাপে যুবকগণের অঙ্গের হার ফুটিয়া যাওয়া, কন্দর্পের ভ্রমরপংক্তিরূপ বাণ ও পুষ্পময় ধনুর্ব্বাণ, যুবতীর কটাক্ষে যুবকগণের হৃদয় ভেদ হওয়া, দিবসে পদ্ম ও রজনীতে কুমুদ পুষ্প বিকসিত হওয়া, শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্না, মেঘ গর্জ্জনে ময়ূরের নৃত্য, অশোকে ফল পুষ্পের [illegible] বসন্তকালে জাতী কুসুমের অনুৎপত্তি, চন্দনবৃক্ষে ফলপুষ্পের অস-[illegible] বিষয় সৎকবিদিগের প্রবন্ধে চিরকাল বর্ণিত হইয়া আসিতেছে।

[illegible] নলিনী নিচয়ে বিকাশে সরসী জলে।

[illegible] লিনীর বিকাশ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত;

[illegible] দোষ সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা

[illegible] বিষয় খ্যাত আছে, কেহ উহার অন্যথা [illegible] তাহাদের আর নিজ নিজ উদ্ভাবিত পদবীতে [illegible] বিচরণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। [illegible] পদার্থটিই যখন নূতন নূতন চিন্তার ফল, তখন ঐরূপ [illegible] পথে কণ্টক নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখা উচিত নহে। আমরা এখানে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে

শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্না বর্ণনাই প্রাচীন কবিদিগের সময় হইতে খ্যাত আছে; কিন্তু কোন কবি অথবা ঔপন্যাসিক কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চন্দ্রো কিংবা জ্যোৎস্না বর্ণন করেন তাহা হইলে তাঁহার সেই বর্ণনা কি খ্যাতিবিরুদ্ধতা দোষে নিন্দিত হইবে! এইরূপ আরও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১২। অনৌচিত্য। দেশ, কাল পাত্র, রস, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির বিরুদ্ধ বর্ণনাকে অনৌচিত্য দোষ বলে। যথা:—

পড়িয়াছে বীর[illegible] অটোৎকচ যুবে কর্ণ, কা[illegible]

এখানে বীরবাহুর পতন ত্রেতাযুগের ঘটনা, আর কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ-বধ দ্বাপর যুগের ব্যাপার; অতএব পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার উপমা বর্ণিত হওয়ায় কালবিরুদ্ধ অনৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে।

১৩। গ্রাম্যতা। অপভাষার ব্যবহার কিংবা ইতরজনোচিত ভাব বিন্যাসে গ্রাম্যতা দোষ হয়। যথা;—

চাঁদে দেখি সোহাগে শালুক ফুটে জলে। আধু আশে মার্জ্জার যেমন মুখ মেলে।

এখানে প্রথমার্দ্ধে উত্তম ভাব প্রকাশিত হইলেও অপভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। [illegible]র্দ্ধে সাধু ভাষায় ইতর জনোচিত ভাব বিন্যস্ত হইয়াছে।

[illegible]মরা যে কয়টি দোষের বিষয় উল্লেখ করিলাম ইহা ব্যতীত ছন্দোভঙ্গ, দুরান্বয় [illegible]অনেক গুরুতর দোষ আছে।

[illegible]ধক বলিয়া দেহীর গুণ নামে [illegible]রসের উৎকর্ষ সম্পাদন করে, সুতরাং ইহারা কাব্যের [illegible]ক। * গুণ প্রধানতঃ তিন প্রকার; মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ।

[illegible] যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণ মাত্র চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাকে মাধুর্য্য গুণ বলে। আদিরস, করুণরস ও শান্তরসে এই গুণের আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ট ঠ ড ঢ ব্যতীত স্বীয় স্বীয় বর্গের অন্ত্য বর্ণের অন্ত্য বর্ণের সহিত অগ্রভাগে সংযুক্ত স্পর্শবর্ণ ও লঘুভাবাপন্ন অল্পপ্রাণ বর্ণ এবং সমাসবিহীন অথবা অল্পসমাসযুক্ত রচনাই এই গুণের ব্যঞ্জক। যথা;—

কালিন্দীর কাল জলে কমলের শ্রেণী। নগন জঘনে কাম মগন আপনি।
কেহ ভাসে কেহ ডুবে, যেন চন্দ্র পুবে পুবে, যমুনার মত বয়ে, কে না যায় জল হয়ে,
নীল সিন্ধু ভেদি আহা উঠিছে এখনি। দেখিলে সে মোহময় নয়নে চাহনি।
সে লাবণ্যমুক্ত বক্ষে কে পারে সহিতে চক্ষে, (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস—কস্তুরী)

বিমল শরৎ-শশী, সেই চারু চন্দ্রাননে
অতি নিরমল নিশি, বিষাদ আঁধার গো।
জোছনার রূপরাশি পা দুটি ছড়ায়ে বসি,
দেখেছিনু তার গো। আঁচল প'ড়েছে খসি,
বিকসিত ফুলবনে, শিথিল কুন্তল-রাশি
সুবাসিত সমীরণে, লুটিছে ভূতল গো।

---

* যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ।
উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ॥ (কাব্যপ্রকাশ—৮ম উল্লাস)

চাহিয়া চাঁদের দিকে
কি দেখিছে অনিমিখে ?
অধর উঠিছে কেঁপে,
নয়ন সজল গো।
(শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—অশ্রুকণা)

২। ওজঃ। যে গুণ থাকিলে কাব্যের শ্রবণ বা পাঠমাত্র হৃদয় বিস্তৃত অর্থাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহার নাম ওজোগুণ। বীর, বীভৎস এবং রৌদ্ররসে ইহার আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এই গুণবিশিষ্ট রচনায় রেফ ট ঠ ড ঢ শ ষ প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহাতে সমাস বাহুল্য থাকা ও ঘটনা ঔদ্ধত্যশালিনী হওয়া আবশ্যক। যথা ;—

গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে ; লঙ্কাপুরে শুনলো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী সম এ
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বে
ভীমা লম্বোদরা বা
খর্ব্ব আকৃতি বামা নৃমুণ্ডমালি
জটাবিভূষণা পিঙ্গলব
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী।
খড়্গ কর্ত্তরী করে কপাল উৎপল ধরে

যাইব তাঁহার পাশে পশিব নগরে
বিকট কণ্টক কটি, জিনি ভুজবলে
রঘু শ্রেষ্ঠ।
(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মে
জ্ঞা
বিরাজে
(শ্রীহেমচন্দ্র

৩। প্রসাদ। যে রচনার পাঠ বা শ্রবণমাত্র অর্থ বোধ হয় এবং অ যে প্রকার শুষ্ক কাষ্ঠে অতি শীঘ্র প্রবেশ করে তদ্রূপ যে রচনার মর্ম্ম অতি সহজে সমস্ত হৃদয় অধিকার করে, তাহাকে প্রসাদ গুণ বলে। শ্রবণমাত্র যাহার অর্থবোধ হয় তদ্রূপ শব্দ এই গুণের ব্যঞ্জক।

আয়লো, সরলে, প্রাণের প্রতিমা,
আয়লো হৃদয়ে রাখি,
কত দিন হতে রয়েছি আশায়,
বলিব কি বল সখি ?
একাকী নির্জ্জনে এক তরুর ছায়ায়,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন,
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়,
ভাবিতেছি জীবনের ভাবনা প্রথম,

আয় আয় ভাই তেমনি করিয়ে,
গানালো মধুর গান,
কি মোহিনী গুণ আছে ঐ গানে
পাই যেন নব প্রাণ।
(শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।)

একই মানব সব একই শরীর,
একই শোণিত মাংস ইন্দ্রিয় সকল ;
জন্ম মৃত্যু একরূপ তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ?
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—রৈবতক)

অলঙ্কার।

সম্প্রতি এই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় অলঙ্কার সংক্রান্ত দুই চারি কথা বলিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। মহাকবি কালিদাসের জন্মগ্রহণের পরই কাব্যাদর্শরচয়িতা

২। রূপক। উপমেয়ে উপমানের আরোপ করার নাম রূপকালঙ্কার। রূপকে উপমানের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। যথা ;—

"নয়ন কেবল নীল উৎপল মুখ শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্তপাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল॥"

সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার ছায়ারূপী দেহের ছায়ারূপী অঙ্কস্থিত শতদলপদ্মসদৃশ এক শিশুর দেহে অর্পিত হইয়াছে। (শ্রীচন্দ্রনাথ বসু—ত্রিধারা)

এখানে নয়ন, মুখ, দন্তপংক্তি, অধর, দেহ, শিশু প্রভৃতি উপমেয়ে নীলোৎপল, শতদল, কুন্দ, নবীনপল্লব, ছায়া, শতদল প্রভৃতি উপমান আরোপিত হওয়ায় রূপকালঙ্কার হইয়াছে।

৩। উৎপ্রেক্ষা। উৎকট সাদৃশ্য হেতু উপমানকে উপমেয় বলিয়া সম্ভাবনা করার নাম উৎপ্রেক্ষালঙ্কার। উৎপ্রেক্ষা প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত ;—বাচ্যা এবং প্রতীয়মানা। যে স্থলে যেন, বুঝি, বোধ হইল, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থাকিবে, সেস্থলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বুঝিতে হইবে। অন্যত্র প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

ক। বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

দিবা অবসানে যবে মরালের গণ ; মনে হয় যেন কত দিব্যাঙ্গনাগণ
সারি সারি হয়ে যায় উড়ি তব কোলে। গলায় মুক্তামালা ফেলিছে ভূতলে॥
(শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পদ্যপাঠ)

দুরন্ত শিশুর মত খেলা অবসানে,
ঘুমায়ে পড়েছে যেন বিশাল তটিনী। (শ্রীসরোজকুমার দেবী—নদীতীরে)

যেন আমি পদ্মদলে অবিরল বদ্ধ হইয়াছি, নিরতিশয় দুগ্ধ স্রোতেই যেন আমি স্নান করিলাম, আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষুদ্বারা মালতী যেন আমাকে নিরবশেষরূপে গ্রাস করিলেন, ঘন অমৃতবৃষ্টিধারাই যেন আমি বেগে অভিষিক্ত হইলাম। (শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—ভবভূতি)

খ। প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

"সুন্দর হেন সময়
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিল ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ উদয়। (ভারতচন্দ্র রায়)

৪। অতিশয়োক্তি। উপমেয়ের একবার উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে উহাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা যায়। যথা;—

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ আগারে— কে করে গণনা তার—
মালতী কেতকী জাতী অশোক কিংশুক আর,
বাঁধুলি কামিনী পাঁতি, কত শত ফুলকুল ফোটে নিশিতুষারে—
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে। সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ মাঝারে।
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কামিনীকুসুম)

এখানে উপমেয় বঙ্গীয় কামিনীর উল্লেখ না করিয়া উপমানভূত নানাজাতীয় কুসুমকে বঙ্গললনারূপে নির্দ্দেশ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

বড় আশা ছিল মনে বসি তব পদতলে, ধনী হতে ধনী তুমি যাহার অভাবে মম
শিখি সেই দিব্য মন্ত্র যাহার মোহন বলে। প্রভাহীন রূপরাশি আঁখি দুটি অন্ধসম॥
(শ্রীমতী কামিনী সেন——আলো ও ছায়া)

এখানেও প্রস্তুত বিষয় বিদ্যা, তাহার একবারে উল্লেখ না করিয়া তাহার উপমান স্বরূপ কোন দিব্যমন্ত্রকে বিদ্যারূপে বর্ণনা করায় এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

৫। ব্যতিরেক। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনকে ব্যতিরেক অলঙ্কার বলা যায়।

উপমেয়ের উৎকর্ষ। যথা;—কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

উপমেয়ের উৎকর্ষ। যথা;—দিনে দিনে শশধর, দেখা যায় তনুতর, পুন তার হয় উপচয়।
নয়ের নশ্বর তনু, হইলে ক্রমশ তনু, আর ত নূতন নাহি হয়॥

৬। নিদর্শনা। দৃশ্য-হেতু যদি কাহারও উপরে যদি কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিংবা অসম্ভব কার্য্য কল্পনা করা যায় তাহা হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা;—

নিশার স্বপন-সম তোর এ বারতা, বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজ বলে কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী (মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ)

এখানে ফুলদল দিয়া শাল্মলী তরুর ছেদন রূপ অবাস্তবিক ধর্ম্মের কল্পনা করায় নিদর্শনা অলঙ্কার হইয়াছে।

৭। দৃষ্টান্ত। বর্ণনীয় বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ ভিন্ন বাক্যে তৎসদৃশ বিষয়ান্তরের বর্ণনকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলে। যথা;—

জানিনা স্নেহেতে ভরা কেন যে অন্তর; অবাক্ হইয়া হেরি মুখ-শশধর।
ভালবেসে সুখ পাই- নলিনী বিহ্বল প্রাণে
এত ভালবাসি তাই, চেয়ে থাকে নভোপানে,
চাহিনাক প্রতিদান চাহি না আদর। কত দূর দূরান্তরে রহে দিনকর।
চাহিনা পরশ তার (শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী—ভালবাসা)
শুধু চাই অনিবার

এখানে বর্ণনীয় বিষয় বিহ্বল অন্তঃকরণে প্রণয়ীকে দেখা; সেইটি নলিনী যে তাহার প্রণয়ী নভোমণ্ডলস্থ দিনকরের প্রতি বিহ্বলপ্রাণে চাহিয়া থাকে, এই বিষয়ান্তর বর্ণন দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

৮। বিভাবনা। যে স্থলে কবির প্রৌঢ়োক্তিনিবন্ধন হেতুব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তথায় বিভাবনা অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা;—

ভূষণ ব্যতীত শোভে তনু সুকোমল।
ভয় নাহি তবু আঁখি সতত চঞ্চল॥

৯। অসঙ্গতি। কার্য্য ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন আধারে অবস্থিত হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়। যথা ;—

মহাত্মারে সমাদরে পূজয়ে সকলে,
কিন্তু লঘুচিত্ত জন গরবেতে ফুলে।

এখানে গর্ব্বের হেতু মহাত্মাতে অবস্থিত হইলেও গর্ব্বের কার্য্য লঘুচিত্ত ব্যক্তিতে বর্ণিত হওয়ায় অসঙ্গতি অলঙ্কার হইয়াছে।

১০। উল্লেখ। একমাত্র পদার্থের বিবিধ প্রকারে উল্লেখ করিলে উল্লেখ অলঙ্কার হয়। যথা ;—

বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

এস্থলে বিদ্যাকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী রূপে উল্লেখ করায় উল্লেখ অলঙ্কার হইয়াছে।

১১। স্মরণ। কোনও বস্তু দেখিয়া সাদৃশ্য হেতু পূর্ব্বদৃষ্ট সদৃশ পদার্থের স্মরণ হইলে স্মরণালঙ্কার হয়। যথা ;—

প্রফুল্ল নলিনে অলি খেলিতেছে হেরি,
বাছার চঞ্চল আঁখি সদা মনে করি।

১২। ব্যাজস্তুতি। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দা সূচিত হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। যথা ;—

সভাজন শুন জামাতার গুণ, মান অপমান সুস্থান কুস্থান,
বয়সে বাপের বড়। অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি জানে কর্ম্ম,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়। চন্দনে ভস্মজ্ঞেয়ান।

এখানে নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ পূর্ব্বক স্তব করা হইয়াছে।

১৩। বিষম। বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের সংযোগ হইলে বিষমালঙ্কার হয়। যথা ;—

রত্নাকর ভাবি পশিনু জলধিজলে,
কোথা রত্ন উদর পূরিল লোনা জলে।

১৪। আক্ষেপ। বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ চমৎকারিত্ব সম্পাদন-মানসে তদ্বিষয়ের নিষেধাভাস অথবা বিধিকে আক্ষেপালঙ্কার বলে। যথা ,—

তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমিই আমার চক্ষুর কৌমুদী ও অঙ্গে অমৃতলেপ স্বরূপ। এই প্রকার বহুবিধ চাটুবাক্য দ্বারা প্রীত করিয়া পরিশেষে সেই সরলহৃদয়া সীতাকেই————অথবা আমায় আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

(শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—ভবভূতি)

১৫। অপহ্নুতি। প্রস্তুত বিষয়ের প্রতিষেধ করিয়া তৎসদৃশ অপ্রস্তুত বিষয়ের স্থাপনকে অপহ্নুতি অলঙ্কার কহে।

এ নহে নভোমণ্ডল কিন্তু সরিৎপতি।
তারকাস্তবক নহে উহা ফেণপাঁতি॥

১৬। অর্থান্তরন্যাস। সাধারণ বস্তু দ্বারা বিশেষ ও বিশেষ বস্তু দ্বারা সামান্যের সমর্থন করাকে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলে। যথা ;—

সহসা কর না কার্য্য ধৈর্য্য বাঁধ হৃদে,
বিবেক বিরহে কষ্ট ঘটে পদে পদে।

এখানে সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন করা হইয়াছে।

দশে মিলে করিলে মহৎ কার্য্য হয়,
তৃণের সমূহ রজ্জু হোয়ে বাঁধে হয়।

এখানে বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন করা হইয়াছে।

১৭। বিরোধ। যে স্থলে পাঠমাত্র বিরোধের প্রতীতি হয়, কিন্তু পর্য্যবসানে উহার ভঞ্জন হয়, তাহার নাম বিরোধালঙ্কার। যথা ;—

অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি ;
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন সুমতি কুমতি।

পরমেশ্বরের পক্ষে সমুদয়ই সম্ভব ; সুতরাং এখানে পর্য্যবসানে বিরোধের ভঞ্জন হইয়াছে।

১৮। দীপক। যে স্থলে কতকগুলি প্রস্তুত ও কতকগুলি অপ্রস্তুত পদার্থের এক ধর্ম্ম অর্থাৎ এক গুণ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বর্ণিত হয়, অথবা অনেক ক্রিয়ার এক মাত্র কর্ত্তৃকারক থাকে, তথায় দীপক অলঙ্কার হয়। যথা ;—

জগজ্জিগীষু শিশুপাল অদ্যাপি পূর্ব্ব জন্মের বলাবলেপে অবলিপ্ত হইয়া জগতের যাবতীয় জীবকে উৎপীড়িত করিতেছে ; সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও পুরুষের অনুগামিনী হয়।

এখানে প্রস্তুত "নিশ্চলা প্রকৃতি" ও অপ্রস্তুত "সতী স্ত্রী" উভয়েরই এক অনুগমন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে।

ভাই তুমি এখানে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কিন্তু তোমার প্রণয়িনী তোমার সংবাদ পাইয়া দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উঠিতেছেন, পড়িতেছেন, তোমার শয়নগৃহের দিকে দৌড়িতেছেন, হাঁসিতেছেন, কাঁদিতেছেন ; অতএব আর তোমার বিদেশে থাকা উচিত নহে।

এখানে এক প্রণয়িনী কয়েকটি ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারক হওয়ায় দীপকালঙ্কার হইয়াছে।

১৯। অপ্রস্তুতপ্রশংসা। অবস্থার বৈসাদৃশ্য বা সৌসাদৃশ্য হেতু অথবা কার্য্য কারণভাবনিবন্ধন অপ্রস্তুত বস্তু দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি হইলে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হয়। যথা ;—

হৃদয়ে চাপিনু ধরি এ কাল মালায়, অমৃত গরল হয় বিধির ইচ্ছায়
না হরিল অভাগার এ পোড়া পরাণ ; বিষ পুন ভাগ্যগুণে অমৃত সমান।

(শ্রীনবীনচন্দ্র দাস—রঘুবংশ)

বিধির ইচ্ছা হইলে, তৃণাঙ্কুরেও ভীমগিরি ছিন্নভিন্ন হয় ; মশক পদাঘাতে রক্ষঃ বক্ষ বিদারিত হয় ; গণ্ডুষে বারিধি শুকাইয়া যায় ; ফুৎকারে সূর্য্যতাপ নিবিয়া যায়।

(শ্রীবিহারিলাল সরকার—ইংরাজের জয়)

এই উভয় স্থলেই অসম্ভবও কদাচিৎ সম্ভব হয় এই অর্থ প্রতীতি হইতেছে।

২০। বিশেষোক্তি। কারণসত্ত্বেও কার্য্যের অনুৎপত্তি হইলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা ;—

জ্ঞানে মৌনী দানে তিনি শ্লাঘা-বিরহিত, এরূপে বিরোধভাব ত্যজি পরস্পর
বৈরনির্য্যাতন-ক্ষম হয়ে ক্ষমাপর ;— গুণচয় রাজদেহে ছিল সম্মিলিত।

(শ্রীনবীনচন্দ্র দাস—রঘুবংশ)

২১। ভ্রান্তিমান্। অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য জানাইবার উদ্দেশে সদৃশ বস্তুতে সদৃশ বস্তুর কাল্পনিক অর্থাৎ কবিপ্রতিভা সমুত্থিত ভ্রমকে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার বলে। যথা ;—

দেখ সখে উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
জলে কুবলয়ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করয়ে যতন।

এই বর্ণিত ভ্রমটি কবিকল্পনাসম্ভূত, বাস্তবিক নহে।

২২। সন্দেহ। যদি প্রস্তুত বিষয়কে অপ্রস্তুত বলিয়া, সংশয় কবির প্রতিভা দ্বারা উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে সন্দেহালঙ্কার হইয়া থাকে। যথা ;—

দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমন এল এখানে।

২৩। প্রতিবস্তূপমা। পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্য প্রণিধান দ্বারা বোধগম্য ও সাধারণ ধর্ম্ম তাৎপর্য্যতঃ একরূপ হইলেও পৃথক্ আকারে বিন্যাস স্থলে প্রতিবস্তূপমালঙ্কার হয়। যথা ;—

ধন্য দময়ন্তি। ধন্য ধর গুণাবলি, আকর্ষে যে জলধির লহরী প্রবল
যার বলে হরিলে নলের মন অলি। তার চেয়ে চন্দ্রিকার কিবা শ্লাঘাবল।

এখানে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে দময়ন্তী ও চন্দ্রিকার সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ; আর নলের মন হরণ ও জলধির লহরী আকর্ষণ রূপ সাধারণ ধর্ম্ম বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, কেবল পৃথক্ শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; অতএব এখানে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

২৪। সমাসোক্তি। যদি সমান কার্য্য, সমানলিঙ্গ, সমান বিশেষণ দ্বারা প্রস্তুত অচেতন বস্তু তির্য্যগাদি প্রভৃতি বিষয়ে অপ্রস্তুত পদার্থ অর্থাৎ মনুষ্যোচিত (নায়ক

নায়িকাদির) ব্যবহারাদির সমারোপ করা যায়, তাহা হইলে উহা সমাসোক্তি অলঙ্কার নামে অভিহিত হয়। যথা ;—

নবজাত মলয় হিল্লোল,
জনমিয়া বসন্ত প্রভাতে।
খেলিতেছে আনন্দে বিভোল,
কুসুম বালিকাদের সাথে।
দোলনায় দিতেছে দোলারে,
নবজাতা শাখা কুমারীরে।
গোলাপেরে আদরে ভুলায়ে
চুমে তার রাঙা মুখ ধীরে।
হোথা লয়ে সাগর বালিকা,
খল খল করি হাসিতেছে।
অমনি সে বালক ছুটিয়া,
বালিকার কাছে চলে গেছে।

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার—কবিতা)

এই স্থলে প্রস্তুত বিষয় মলয় বায়ু, কুসুম, নবশাখা, গোলাপ, সাগর ; তাহাতে কার্য্য এবং বিশেষণ দ্বারা বালকবালিকাত্বের ব্যবহার আরোপ করায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

উদ্ধৃত কবিতার লেখক কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত, সুতরাং পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত অন্যান্য কবিদের ন্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণোক্ত লিঙ্গাদির নিয়ম পরিপালনে সম্মত নহেন। অতএব এখানে কুসুমে ও সাগরে বালিকাত্বের আরোপ করা সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতবিরুদ্ধ হইলেও ইংরেজী সাহিত্যের প্রথা অবলম্বনে বোধ হয় করিয়াছেন। অথবা "নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ।"

ক। মুরলীর রবে তরঙ্গিণী হিল্লোল উড়াইয়া কল্লোল সাগর পানে দৌড়ায়। সেও নব অনুরাগিণী। প্রবীণ মলয় ধীরে ধীরে অতিধীরে স্বর্ণলতার কোমল হাত খানি ধরিয়া ধীরে অতিধীরে একটি বার দুটি বার নাড়াইয়া দেয়।

খ। মুরলীর আকর্ষণে শ্যামা ধরণী কাঞ্চনকান্তি দিবাকরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, চাঁদকে দেখিলে কুমুদিনী একগাল হাসিয়া ফেলে।

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী—সুধা না গরল)

ক চিহ্নিত উদাহরণে কার্য্য লিঙ্গ ও বিশেষণ দ্বারা তরঙ্গিণীতে নায়িকাত্বের আরোপ করা হইয়াছে, আর মলয় পবনে নায়কত্বের এবং স্বর্ণলতায় নায়িকাত্বের আরোপ করা হইয়াছে। এখানে কার্য্য মলয় বায়ু কর্ত্তৃক স্বর্ণলতার করমর্দ্দন।

খ চিহ্নিত অংশে কার্য্য লিঙ্গ ও বিশেষণ দ্বারা ধরণীতে ও কুমুদিনীতে নায়িকাত্ব ও দিবাকরে ও চন্দ্রে নায়কত্বের আরোপ করা হইয়াছে। এই উভয় অংশই অতি মধুর। সংস্কৃত কবিদের অধিকার কালে মর্ত্ত্য ভূমিতে নলিনীই একমাত্র দিবাকরের প্রণয়িণী ছিলেন ; এই কবির ইঙ্গিতে ধরণী তাঁহার সপত্নী স্থান গ্রহণ করিলেন ; সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভাবেরও অসদ্ভাব ঘটিল না।

২৫। স্বভাবোক্তি। পদার্থবিশেষের প্রকৃত অবস্থার বর্ণন যদি চমৎকার জনক হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলে। যথা ;—

মুকুলিত আম্রবন ছায়া ঘন বাঁকা
গ্রাম পথ দিয়ে
জলকে সাঁঝের বেলা চলে বধূ, কাঁখে
কলসীটি নিয়ে ;
সহসা আড়াল থেকে,
কি কুহু উঠিল্ ডেকে ;
স্বপনে ফেলে সে যেন আপনা হারিয়ে।
(শ্রীবিনয়কুমারী ধর—কোকিল)

শোভিছে গগনে মেঘ রঞ্জিত বরণে ;
বিহগ ফিরিছে নীড়ে স্তব্ধ কলধ্বনি।
আর্দ্র বায়ু অলসেতে বহিছে সুধীরে,
শ্যাম সিক্ত বৃক্ষ হতে ঝরে বারিকণা
সপ্তমীর অর্দ্ধচাঁদ আকাশ উপরে,
একটি তারকা হায় হারায় আপনা।
(শ্রীসরোজকুমারী দেবী—নদীতীরে)

উদ্ধৃত অংশ সমূহে পদার্থের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা চমৎকারজনক হওয়ায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ায় আমরা এখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আমরা যে কয়টি অর্থালঙ্কারের উল্লেখ করিলাম, ইহা ব্যতীত বহুসংখ্যক অর্থালঙ্কার আছে। এই প্রবন্ধ যেরূপ হওয়া উচিত, সময়ের অভাবে নানা কার্য্যের ব্যস্ততায় তদনুরূপ করিতে পারিলাম না। অর্থালঙ্কার গুলির বিশ্লেষণ করিয়া পরস্পর ভেদ নির্দ্দেশ করা মোটেই হয় নাই। পাঠকবর্গ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

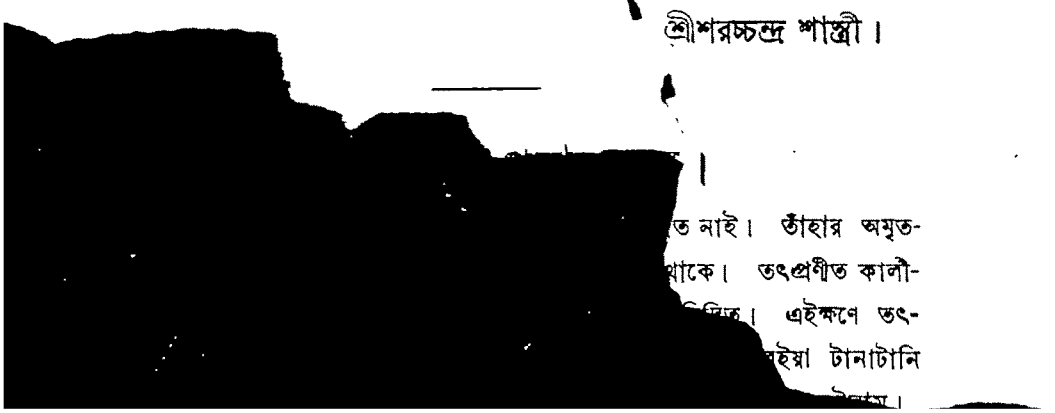

।

ত নাই। তাঁহার অমৃত-
থাকে। তৎপ্রণীত কালী-
লিত। এইক্ষণে তৎ-
ইয়া টানাটানি
।

ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল গুণবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণান্বিত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥

পাঠক, আপনারা সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের এই উক্তিটী বোধ হয় অবগত আছেন। কত কত মহাত্মা তাঁহার কত জীবনী বাহির করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই "কৃত্তিবাস" কে, "শুদ্ধমূল"ই বা কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই; এই মাত্র বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, "কৃত্তিবাস" রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ধন ও কুল উভয়ই ছিল। এতদ্ব্যতীত আর কেহ কিছু অধিক বলিতে পারেন নাই। প্রয়োজন বশতঃ আমরা এইস্থলে রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে বাধ্য হইলাম।

রামপ্রসাদ সেন যে মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করেন, বৈদ্যসম্প্রদায় মধ্যে সেই কুলের সম্মানের ইয়ত্তা নাই। একজন রাজোপাধিধারী মহাপুরুষ সেই কুলতরুর স্রষ্টা। তাঁহার নাম শ্রীহর্ষ সেন; সেই সময়ে চিকিৎসা ব্যবসায়ে তৎসদৃশ লোক অতি বিরল ছিল। নবাব ফকিরুদ্দীন শাহ এই সময়ে (১০৩৮—১৩৫০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃতবৎসা দোষনিবন্ধন সন্তান হইয়া তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইত। পরে চিকিৎসকপ্রবর শ্রীহর্ষ সেনের ঔষধপ্রভা[illegible] হইয়া অচিরে একটী পুত্ররত্ন লাভ করেন। এইজন্য নবাব ফ[illegible] শ্রীহর্ষকে * সেনভূম প্রদেশের জমিদারী ও রাজ[illegible]

রাজা শ্রীহর্ষ সেনের [illegible] পিতার মৃত্যুর পর বিমল [illegible] নির্দ্দেশ করেন। বিমল পি[illegible] বিমল সেনের পুত্র বিনা[illegible]

বঙ্গে কায়স্থথাপ্যা[illegible]
যো বিনায়কে[illegible]

কুলীনানাং প্রসঙ্গেঽপি তস্যৈবোচ্চারণং পুরঃ।
স চ গৌড়মহীপালাৎ পূর্ব্বং লেভে নিজৈর্গুণৈঃ।
গজং কনকছত্রঞ্চ ধনং বহুবিধং তথা॥
অসৌ ব্রাহ্মণবৈদ্যেভ্যো গজবাজিধনানি চ।
দদৌ বহূনি মালঞ্চে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ভিষক্কুলে॥
বিনায়কস্য সেনস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
রোষসেনস্তদীয়দ্যো ধন্বন্তরিরথাপরঃ॥
(বিনোদলাল সেনগুপ্ত প্রকাশিত চন্দ্রপ্রভা—২২ পৃঃ)

এই মহাপুরুষ বিনায়ক সেনের বংশে শতাধিক পণ্ডিত ও বিষয়ী লোক জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকুলকে সমধিক চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন; এখন রাঢ়ে ও বঙ্গে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন; তাঁহারা পরিচয়স্থলে আপনাদিগকে "বিনায়ক-ধন্বন্তরি" বলিয়া উল্লেখ করেন।

পূর্ব্বতন সময়ে এই মহাকুলে কবিরাজ হরিচরণ কণ্ঠাভরণ (১), মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক (২), গোবিন্দ সেন (৩), রবি সেন মহামণ্ডল (৪), মহেশ্বর সেন (সুবুদ্ধিখান) (৫), সদাশিব কবিরাজ (৬), এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন, মহারাজ রাজবল্লভ সেন, জপসার সাধক কবি লালা রামগতি *, কবি জয়নারায়ণ, কবি

---

(১) নাম্না শ্রীহরিচরণো মল্লিকোঽসৌ সুশীলভৃৎ।
জ্ঞাতব্যাকৃতিকাব্যঃ পিঙ্গলবেত্তা বিশেষতঃ॥
কৃত্বা কাব্যং দশগুণযুতং প্রোল্লসদ্ভূরিভাবম্
সানুপ্রাসং যমকরুচিরং সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চ।
সদ্ভক্তাসৌ বুধগণমনঃকৈরবাহ্লাদচন্দ্রঃ
শ্রীমান্ কণ্ঠাভরণপদবীং প্রাপ হুসেনখানাৎ॥
(চন্দ্রপ্রভা—২৪ পৃঃ)

(২) গৌরাঙ্গমল্লিকস্তামী অভবৎস্তনুজাস্ত্রয়ঃ।
অগ্রজো হরিমল্লীকো দাতা ভোক্তা মহাশয়ঃ॥
পরঃ প্রসাদমল্লীকঃ সদাচাররতঃ সদা।
পরো ভরতমল্লীকো দ্বিজ-বৈদ্যাঙ্ঘ্রিসেবকঃ॥
ভূরিশ্রেষ্ঠমহীপালসভাপণ্ডিতবিশ্রুতঃ।
বৈদ্যানামাজ্ঞয়া যোঽসৌ কুরুতে কুলপঞ্জিকাম্॥
চকার-চাপরান্ গ্রন্থান্ দ্রুতবোধাদিকান্ বহূন্।
(চন্দ্রপ্রভা—৩২ পৃঃ)

(৩) গোবিন্দসেনো দ্বিজমিষ্টভাষী
সরেফখানস্য চ কর্ম্মচারী।
(চন্দ্রপ্রভা—৪২ পৃঃ)

(৪) তোঘুসেনস্য তনয়ো রবিসেনস্তদগ্রজঃ।
মহামণ্ডল ইত্যেব খ্যাতো নৃপতিবল্লভঃ॥ (১০৫পৃঃ)

(৫) অথ ভৈরব সেনস্য চত্বারস্তনয়া অমী।
* * *
পরো মহেশ্বর সেনো বিশ্বাসঃ সুচিকিৎসকঃ।
সুবুদ্ধিখান ইতি যো বিখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে॥

বৈষ্ণব গ্রন্থোল্লিখিত নবাব হুসেন সাহ কি এই সুবুদ্ধিখানের নিকট চাকরি করিতেন? সুবুদ্ধি রায় গৌড় প্রদেশে সুবিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার ধন ও বিদ্যাখ্যাতি ছিল। সুবুদ্ধি ও হরিচরণ মল্লিক এক পুরুষ ব্যবধান। হুসেন এই হরিচরণ মল্লিককে কণ্ঠাভরণ উপাধি দিয়াছিলেন।

(৬) সম্বরারেঃ সুতো জাতঃ কবিরাজঃ সদাশিবঃ।
সদাশিবস্য পুত্রৌ দ্বাবগ্রজঃ পুরুষোত্তমঃ।
পুরুষোত্তমসেনো যো বিষ্ণুপারিষদোপমঃ।
স ঠাকুর ইতি খ্যাতো বিশ্ববিশ্রুতসদ্যশাঃ॥
(চন্দ্রপ্রভা—৭৪ পৃঃ)

কবিরাজ নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতার গুরু ছিলেন। এই বংশের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে।

* ভারত ১৩০৪ ভাদ্র ও আশ্বিন। মৎপ্রকাশিত শতপ্রবন্ধ।

রাজনারায়ণ, বিদুষী আনন্দময়ী * ও গঙ্গামণি, সোমরার রাজকল্প রামচন্দ্র সেন (৭) ও রামভদ্র রায় (৮) প্রভৃতি বিখ্যাত মহাত্মারা জন্মলাভ করিয়া গিয়াছেন।

বিনায়ক সেনের পুত্র রোষ সেন, তৎপুত্র নারায়ণ সেন, তৎপুত্র সাঙুসেন ও † তৎপুত্র সরণি সেন; এই সরণি সেনের পুত্র কৃত্তিবাস সেন। মহাত্মা ভরত মল্লিক এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

যঃ কৃত্তিবাসাঃ সরণেস্তনূজস্তস্যাত্মজাঃ পঞ্চ বভূবুরেতে।
মৌড়েশ্বরীয়স্য চ শূলপাণের্দাসস্য পুত্রীজঠরপ্রসূতাঃ॥
ত এব পূর্ব্বং ধলহণ্ডগোষ্ঠীং সমাশ্রিতাস্তত্র তদীয়বংশ্যাঃ।
স্থিতাশ্চিরং তে কুলশীলভাজস্তন্নামতোঽদ্যাপি মতাশ্চ সর্ব্বে॥
আদ্যঃ পশুপতির্জাতো দ্বিতীয়ো রঘুনন্দনঃ।
রত্নাকরস্তৃতীয়োঽভূন্মুরারিস্তু চতুর্থকঃ॥

(চন্দ্রপ্রভা—৫০ পৃঃ)

কৃত্তিবাস সেন ধলহণ্ড গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার বংশধরেরা ধলহণ্ডীয় নামে প্রসিদ্ধ হয়।

মল্লিক মহাশয় তদ্বিরচিত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে আপনার পৌত্র কৃষ্ণরামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সাঙুসেন হইতে দশম পুরুষে কৃষ্ণরাম যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন উক্ত সাঙুসেন হইতে একাদশ পুরুষে রামেশ্বর সেন বর্ত্তমান ছিলেন। ভরত মল্লিক রামেশ্বরের বিবাহ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে নাই। এখন দেখা যাউক রামেশ্বরের বিবাহ হইতে তৎপৌত্র রামপ্রসাদ সেন কত বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা নাম্নী বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ১৫৯৭ শকের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। ভরত মল্লিকের স্বহস্তলিখিত পুস্তকে উক্ত শক দেওয়া রহিয়াছে। উহা গ্রন্থসমাপ্তিকালের শক। কবি রামপ্রসাদ সেন ১৬৪৪ শকের

---

* ভারতী ১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ দ্বিতীয় সংখ্যা। মৎপ্রকাশিত প্রবন্ধ।

(৭) এইরূপ শুনা যায় যে, রামচন্দ্র দিল্লির বাদসাহ ও মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কৃষ্ণনগর হইতে গুপ্তিপাড়ার নিকট বাস করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান থাকায় নবাব ও কোম্পানী সরকারে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৭৯ খৃঃ অঃ গঙ্গাগোবিন্দের পদচ্যুতি ঘটিলে, রামচন্দ্র ফিলিপ্ ফ্রান্সিসের যত্নে তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ৪৭৯—৪৮০ পৃঃ)

(৮) রামভদ্র রায় হাবেলি সিমলাবাদ পরগণার জমিদার ছিলেন। ইনি ১৭৪৮ খৃঃ অঃ মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত একটী যুদ্ধে জয়লাভ করেন। (বিভারেজ্ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস—১২৪ পৃঃ)

† রোষসেনাদজায়ন্ত ষট্‌পুত্রাঃ স্বকুলোজ্জ্বলাঃ।
নারায়ণঃ পশুপতি র্দাঙুসেনস্তৃতীয়কঃ॥
যো নারায়ণসেনোঽসৌ নানাশাস্ত্রবিশারদঃ।
ধর্ম্মকর্ম্মরতো বাগ্মী বদান্যো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
নারায়ণাদ্‌জায়েতাং দ্বৌ পুত্রৌ বিশ্ববিশ্রুতৌ।
সাঙুসেনোঽথভরতো ব্রহ্মদত্তসুতাসুতৌ॥
সাঙুসেনস্তু চত্বারস্তনয়া বিনয়ান্বিতাঃ।
কুমারসেনঃ কাকুস্থঃ সরণিঃ শ্রীনিবাসকঃ॥

(চন্দ্রপ্রভা ৭২—২৩

(১৭২৩ খৃঃ অঃ) সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ৪৭ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ রামেশ্বরের বিবাহ হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রামেশ্বরের পুত্র রামদুলালের ও তৎপুত্র রামপ্রসাদের জন্ম হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত অনুমান হয় না। অনেক ভাগ্যবানের পক্ষে চল্লিশের পূর্ব্বেও পৌত্রমুখসন্দর্শন ঘটিয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক কৃত্তিবাস হইতে কত পুরুষে রামেশ্বর সেন জন্ম গ্রহণ করেন। ভরতমল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থ হইতে শ্লোকাবলি উদ্ধৃত করিয়া এতদ্বিষয়ের সম্যক্ বিবরণ প্রদান করিব। রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কিরূপ সর্ব্বগুণান্বিত লোক ছিলেন, তাহা শ্লোকাবলি পাঠের সহিত সহজেই অনুভূত হইবে। তৎসম্বন্ধে অধিক বাক্যবিন্যাস নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্ব শ্লোকে পাওয়া গিয়াছে কৃত্তিবাস সেনের পুত্র রত্নাকর সেন।

তস্য রত্নাকরস্যৈতে জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
আদ্যো নিত্যানন্দসেনঃ সর্ব্বানন্দস্ততঃ পরঃ॥
নিত্যানন্দস্য সেনস্য পুত্রোঽভূদ্‌বিনয়ান্বিতঃ।
পবিত্রঃ পরমঃ শান্তো নানাগুণসমন্বিতঃ॥
যো জগন্নাথসেনোঽসৌ জগন্নাথপরায়ণঃ।
জগন্নাথস্য সেনস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ॥
যদুনন্দনসেনোগ্র্যো বৃষধ্বজ ইতঃ পরঃ।
যদুনন্দনসেনস্য জজ্ঞাতে তনয়াবুভৌ॥
আদ্যো রঞ্জনসেনোঽভূৎ দ্বিতীয়ঃ পুরুষোত্তমঃ।
অথ রঞ্জনসেনস্য ষট্‌পুত্রা অভিজজ্ঞিরে॥
গোপীনাথো লোকনাথস্ততো রাজীবলোচনঃ।

* * *

পুত্রৌ রাজীবসেনস্য গোপালজয়কৃষ্ণকৌ॥
জয়কৃষ্ণস্য সেনস্য পুত্রৌ দ্বৌ রাঘবোঽগ্রজঃ।
রামেশ্বরঃ পরো দৈবাৎ গোস্বামিদাসসম্ভবৌ॥
তৎপক্ষে কন্যকা জাতা দত্তা দুর্দৈবদৈবতঃ।
জগদীশায় দাসায় কুমারহট্টবাসিনে॥
রাঘবো দৈবতো[illegible]হাৎ হুসেনপুরবাসিনঃ।
প্রথমং রামকৃষ্ণস্য [illegible]স্য কন্যকাম্॥
ততশ্চায়ুকুলে রামে[illegible]লোচিতম্।
রামেশ্বরোঽপি জগ[illegible]

দেখা গেল কৃত্তিবাসের পুত্র রত্নাকর, তৎপুত্র নিত্যান[illegible] যদুনন্দন, তৎপুত্র রঞ্জন, তৎপুত্র রাজীব, তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ, [illegible] কৃত্তিবাস হইতে নবম পুরুষে রামেশ্বর সেনের জন্ম হয় [illegible] কৃত শ্লোকাবলি হইতে কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করা[illegible] বংশাবলী ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ধৃত[illegible] অনেক মহাত্মা জন্মিলে তৎপর যে রামেশ্বরের জন্ম হয়, [illegible] করিয়া গিয়াছেন।

সেই বংশসমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সবলহৃদয়॥

দিলেও কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত। ধনীর পক্ষে টাকা গ্রহণ করা বড়ই লজ্জার কথা ছিল। বিশেষতঃ নীচ ঘরের সহিত আদান প্রদান ততোধিক অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। অবশ্য নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়াই রাঘবের ও তাহার ভগিনীদিগের আদান প্রদান নিম্ন ঘরে হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বর্ত্তমান থাকিতে কি তাঁহার মৃত্যুর পর এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করা যায় না। হীনাবস্থায় পতিত হইয়া, হয় জয়কৃষ্ণ কি তাঁহার পুত্রেরা, কুমারহট্টে কুটুম্বাশ্রয়ে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জগদীশ দাস সম্পন্ন লোক না হইলে কখনও উচ্চ ঘরে বিবাহ করিতে পারিতেন না। ধনীর পক্ষে কুটুম্ব পরিপোষণ করাও আস্বাভাবিক কার্য্য নয়। "শিশুকালে পিতা মৈল রাজ্য নিল চোরে" রামপ্রসাদ যে এইরূপ একটী কথার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, সাধারণতঃ উহা পাঠে বোধ হয় যেন রামপ্রসাদের পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দৈন্যের বিষয়ে তাঁহার প্রপিতামহ জয়কৃষ্ণের সময় হইতেই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্ট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই বলিয়া গিয়াছেন "ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম"।

এখন দেখা যাউক "পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল" কথা কেন [illegible] সহিত যোজনা করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে সিদ্ধ ও সাধ্য, এই দুইটি [illegible] আছে। ধন্বন্তরি, শক্তি, [illegible] এই চারিটি সিদ্ধ গোত্র; কিন্তু কর্ম্মের হীনতা প্রযুক্ত সিদ্ধবংশ হইতে [illegible] সাধ্যবিধ তাহারা মৌলিক বলিয়া পরিগণিত [illegible]হ কুলীন, কেহ মৌলিক, [illegible]ই সন্মৌলিক বাচ্য ছিল। [illegible] স্ববংশকে শুদ্ধমূল বলিয়া [illegible] পূর্ব্বপুরুষেরা ধনী ও কুলীন [illegible]ধ্য কুলকার্য্যপরায়ণতাও [illegible]রা যে সম্পন্ন [illegible]।

[illegible]ত

শূদ্র পণ্ডিত ও কাশীখণ্ড।

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে—বঙ্গদেশে যখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রবল প্রভাবের সময়—তখন এক প্রতিভাশালী কায়স্থসন্তান আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বঙ্গের একাংশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আসন অধিকার করিয়া 'শূদ্রপণ্ডিত' খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অদ্য আমরা সেই 'শূদ্র পণ্ডিত' ও তদীয় কীর্ত্তি 'স্কন্দউক্ত সুধাভাণ্ড' কাশীখণ্ডের পরিচয় পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আটীয়াপরগণার কেদারপুর গ্রামে এই শূদ্র পণ্ডিতের জন্ম হয়। ইহাঁর নাম কেবলকৃষ্ণ বসু। কেবলকৃষ্ণ স্বপ্রণীত কাশীখণ্ডের শেষভাগে গ্রন্থরচনার কাল নির্দ্দেশস্থলে লিখিয়াছেন—"অশ্বরাম জলনিধি চন্দ্রের উদয়।" ইহাতে জানা যায় তিনি ১৭৩৭ শকে অর্থাৎ ১২২২ সাল (বর্ত্তমান সময়ের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে) গ্রন্থ রচনা করেন। কেদার[illegible]রে এখন যে দুই একটী ৭০।৭২ বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই কে[illegible]ও বসুকে দেখেন নাই। কিন্তু কেবলকৃষ্ণ যে দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন এবং জীবনে[illegible]বস্থায় কাশীখণ্ডের রচনা করেন, একথা তাঁহারা বাল্যে পিতা ও পিতৃস্থানীয়দিগের মুখে শুনিয়াছেন। কেবলকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যখ্যাতি ও তৎসম্বন্ধীয় বিবিধ গল্প ইহাঁরা বিশেষ অবগত আছেন। ইহাতে বোধ হয় বৃদ্ধাবস্থায় কাশীখণ্ড রচনা করিয়া কেবলকৃষ্ণ অধিক দিন জীবিত ছিলেন[illegible]
৭০ বৎসর বয়সে কাশীখণ্ড[illegible]
(১১৫২ সাল) হইয়াছিল[illegible]
নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি প[illegible]
ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত ধরণীনাথ[illegible]
৪০ বৎসর।

কেবলকৃষ্ণ[illegible]
পুরের[illegible]
খ্যা[illegible]

বহুলোক তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লইতে আসিত। বাচস্পতি ব্যবস্থাপ্রার্থীদিগকে প্রিয়শিষ্য কেবলকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। কেবলকৃষ্ণ ব্যবস্থা দিয়া যাহা পাইতেন, সমস্তই গুরুকে দিতেন। এইরূপে ব্যবস্থা দেওয়ায় চতুর্দ্দিকে তাঁহার 'শূদ্র পণ্ডিত' খ্যাতি প্রচারিত হয়। কেবলের শাস্ত্রজ্ঞান এত গভীর ছিল যে, তৎকালে শূদ্রপণ্ডিতের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কিছু বলিতে সাহসী হন নাই।

কেবলকৃষ্ণ বসু শৈব ছিলেন। শিবমাহাত্ম্য প্রচার জন্য বৃদ্ধ বয়সে (অনুমান ৭০ বৎসরে) স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদিত করেন। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইতঃপূর্ব্বে সংস্কৃত পুরাণ বা কাব্য অবলম্বনে রচিত আমরা যত গ্রন্থ দেখিতেছি, প্রায় তৎসমুদয়ই গীত বা পাঁচালী। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত কাব্য বা পুরাণের যেরূপ বিশুদ্ধ পদ্য বা গদ্য অনুবাদ দেখা যায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বকবিগণ গান করিবার জন্যই গ্রন্থ রচনা করিতেন। কেবল পাঠ করিবার জন্য কেহ কিছু রচনা করেন নাই। কিন্তু কবি কেবলকৃষ্ণ বসু পাঠের জন্য পুরাণাবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার কাশীখণ্ড গীত নহে। বর্ত্তমান কালের ন্যায় পাঠোপযোগী সরল পদ্যগ্রন্থ।

কেবলকৃষ্ণ স্বয়ং বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তথাপি কেন নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থরচনা সঙ্গত বোধ করেন নাই। ঢাকা জেলার অন্তর্গত (বর্ত্তমানে ঢাকা, পূর্ব্বে রাজসাহী) রৌহা গ্রাম (১) নিবাসী প্রসিদ্ধ পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের

কান্যকুব্জাগত দশরথ বসু হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ

বিশ্বম্ভর বসু ১৪
|
প্রভাকর বসু ১৫
|
* রামানন্দ বসু ১৬
|
রতিনাথ বসু ১৭
|
লক্ষ্মীকান্ত বসু ১৮
|
রামবল্লভ বসু ১৯
|
বিজয়রাম বসু ২০
|
কেবলকৃষ্ণ বসু ২১

* মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খলসী গ্রামের ভূম্যধিকারী শ্রীবৎস রাজা ইঁহাকে চন্দ্রদ্বীপ হইতে আনিয়া বিষ্ণুপুরে স্থাপিত করেন। ইঁহার বংশীয় বিজয়রাম বসু (২০শ পুরুষ) কেদারপুরে বাস করেন।

(১) রৌহাগ্রাম সেকালে বিদ্যাবিষয়ে বড় বিখ্যাত ছিল। যখন ছাপাখানার নূতন পল্লীতে দেশ ছাইয়া নাই, তখন রৌহার জ্যোতিষিগণের পল্লীই এ দেশে একমাত্র ছিল। জ্যোতিষ বিষয়ে রৌহার প্রাধান্য

৩। স্কন্দপুরাণের কথা শুনিতে মধুর।
পয়ারে কেবল কহে ভাবি চন্দ্রচূড়।
৪। চতুর্দ্দশ বর্ণে রস সুছন্দ হইছে।
কাশীখণ্ড সুধাভাণ্ড কেবল কহিছে।

কবি গুরু, গণেশ, নারায়ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি বহু দেব দেবীর বন্দনা করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের পর্ব্ব হওয়ার উপাখ্যান হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। বন্দনার মধ্যে সরস্বতীর বন্দনাই বড় দীর্ঘ, দুই বারে উহা সমাপ্ত হইয়াছে। বন্দনার কোন কোন চরণ আটীয়া পরগণায় প্রচলিত শতানন্দী সত্যনারায়ণের পুঁথির বন্দনার সহিত অবিকল মিলে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা বন্দনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

গুরু-বন্দনা—

বন্দে কাশীং গুহং গঙ্গাং ভবানীং মণিকর্ণিকাম্।
বিশ্বেশং মাধবং ঢুণ্ঢিং দণ্ডপাণিঞ্চ ভৈরবম্॥
অগ্রে গুরু পাদপদ্ম বন্দো সাবহিতে।
তব সমতুল্য নাহি এ ভব ঘোরেতে॥
ত্রৈলোক্যদুর্লভ মোক্ষ নাহি তব পর।
হরিহর ব্রহ্মা আদি ভাবে নিরন্তর।

[illegible]র বন্দনা—

[illegible] দেব নারায়ণ জগতের সার।
[illegible] সরস্বতী দ্বয় বনিতা যাঁহার॥

[illegible]দনা—

[illegible]বাহনে বন্দো দেব পঞ্চানন॥
[illegible]বভূতি ভূষণ অঙ্গে অভয় বর করে।
বাঘাম্বর পরিধান হাড়মালা গলে॥

করুণাময়ী বন্দনা—১)

করুণাময়ীর পদে প্রণতি আমার।
কেদারপুরে অংশরূপেত প্রচার॥
ব্রহ্মচারী প্রতি অতি হইয়া সদয়।
বিরাজ করেন মা তাহান আলয়॥
হৃদয়ে তুমাকে বান্ধিয়াছে ব্রহ্মচারী।
ভুবনমোহন রূপ চতুর্ভুজধারী॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতি[illegible]
সদায়ে আনন্দ[illegible]
দীক্ষা হৈলে[illegible]
এ দেহ প[illegible]
গুরু মন্ত্র[illegible]
তারে গুর[illegible]

সুদর্শনচক্র[illegible]
বৈকুণ্ঠের ন[illegible]

ফণীরে বেষ্টি[illegible]
ললাটেত [illegible]
ভৈরবী পি[illegible]
করেতে ত্রিশূল[illegible]

কালোরূপে আলো করে বামে [illegible]
দক্ষিণে অভয় বর যমভয়নাশি॥
ত্রিনেত্রে উজ্জ্বলমুখ পূর্ণশশধর।
[illegible]সে জিনি কোটী দিবাকর॥
[illegible]হে মুণ্ডমালা গলে।

কুন্দ জিনি দন্ত কুম্ভ জিনি পয়োধর।
হৃদয়ে দুর্লভ পদ রাখে দিগম্বর॥
যত্ন করি হৃদে পদ রাখে ত্রিলোচন।
হেন পদ পাবে নরে করি কি সাধন॥
অপার মহিমা গুণ ভুবনে তোমার।
মূর্খে কি কহিতে পারে করিয়া বিচার॥

গ্রন্থারম্ভে বক্তা ব্যাস—শ্রোতা সূত। নিম্নলিখিতরূপে গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে :—

সত্যবতীসুত মহামুনি বেদব্যাস।
বেদাঙ্গ পুরাণ শাস্ত্র করিলা প্রকাশ॥
ব্যাসের নিকট সূত মুনি সর্ব্বক্ষণ।
নানাশাস্ত্র আলাপনে থাকয়ে দুজন॥
একদিন সূত জিজ্ঞাসয়ে ব্যাসস্থানে।
কি কারণে॥
বার।
অজ্ঞাত নাহিক কিছু ভুবনে তোমার॥
বর্দ্ধমান হৈয়া বিদ্যা খর্ব্ব কি কারণ।
বিবরিয়া কহ মুনি সে সব কথন॥
ব্যাস বুলে সূত শুন কহি যে তুমারে।
যেমতে হইল খর্ব্ব বিদ্যা দুরাচারে॥
বর্দ্ধমান হৈয়া খর্ব্ব হৈল যে কারণ।
বিস্তারিয়া কহি সূত করহ শ্রবণ॥ ইত্যাদি।

...স্থলে লিখিয়াছেন :—
...ঘে ব্যাধে মৎস্য বকে নাহি খায়।

...নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

...ন॥
...র্থিবীত।
...মোহিত॥
...পুলকিত।
...ষিত॥
...পলায়ন।
...কারণ॥
...ষার।
খুররেণু গঙ্গাতুল্য কহিলাম সার॥
শৃঙ্গ গৃহে সর্ব্ব তীর্থ মধ্যে গৌরীহরে।
বিরাজে থাকয়ে বিষ্ণু তাঁহান অন্তরে॥
গোময়ে নর্ম্মদা আর গোমূত্রে যমুনা।
সে স্থান পবিত্র যথা পড়ে বিন্দুকণা॥
দুগ্ধ গঙ্গাতুল্য হয় শুন দেবগণে।
গাভীর অধিক আর নাহিক ভুবনে॥
তাহার পুচ্ছের বাড়ি লাগে যার গায়
পাপ নহে থাকে সর্ব্বরোগ ত্যাগ পায়॥

...ধবার নিম্নলিখিত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

...নারী পতিসেবা করয়ে সতত।
তাহার শরীরে কিছু না হয় আপদ॥
পতি-আজ্ঞা পালন করিবে সর্ব্বক্ষণ।
আজ্ঞা লঙ্ঘনে হয় নরকে...
পতিকে খাওয়াবে অগ্রে করাবে শয়ন।
বাতাস করিবে অঙ্গে সতীর লক্ষণ॥
পতির ভোজন শেষ প্রসাদ পাইবে।
পতিপাদোদক নিত্য গ্রহণ করিবে॥

বিধবার ধর্ম্ম।—

কেশ রাখিবেক শিরে না যায় বন্ধন।
...চার মতে কিছু করিবে ভোজন॥
...দিনান্তরে কিঞ্চিত...

একদিন উপবাস পরেত পারণ।
তিন রাত্রি অনাহারি পশ্চাৎ ভক্ষণ॥
ক্রমে নবরাত্রি মাসেক অন্তরে।
হবিষ্যাদি ত্যাগ যে করিবে তদপরে॥
আত্মঘাতী হৈলে গতি নাহিক তাহার।
সেহিঁ হেতু ফলমূল কিঞ্চিত আহার॥

প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেকেই স্বস্ব গ্রন্থের শ্রবণ কীর্ত্তন ফল বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের মাহাত্ম্য বাড়াইয়া গিয়াছেন: কবি কেবলকৃষ্ণ বসুও গ্রন্থশেষে কাশীখণ্ড শ্রবণ ও পাঠের বহু ফল বর্ণনা করিয়াছেন :—

ব্যাস কহে শুন সূত কহি পুনর্ব্বার।
স্কন্দ উক্ত পুরাণ যে কাশীখণ্ড সার॥
কায়-মন-চিত্তে যেহি শ্রবণ করয়।
সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ ফল প্রাপ্তি হয়॥
চতুর্ব্বেদ পাঠ আর সর্ব্ব তপস্যাতে।
যে পুণ্য তাহাতে হয় সে পুণ্য ইহাতে॥
গয়াপিণ্ডদানে পিতৃলোক পুলকিত।
কাশীখণ্ড পাঠ করা তেঁহ আনন্দিত॥
কাশীখণ্ড শ্রবণ করিলে যেহি জন।
সমস্ত পুরাণ সেহি করিলে শ্রবণ॥
স্থিরবুদ্ধি হইয়া শুনিবে সর্ব্বজনে।
এক উপাখ্যান যদি কায়মনে শুনে॥
সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন সর্ব্বধর্ম্ম আর।
যে পুণ্য তাহাতে সেহি পুণ্য হয় তার॥
কাশীখণ্ড হৈলা মহা ধর্ম্মের জনক।
বিরূপ ভাবিবে যেহি ভুঞ্জিবে নরক॥
কাশীখণ্ড হৈলা চতুর্ব্বর্গফলদাতা।
সর্ব্ব অর্থ দেওয়াবেন নাহিক অন্যথা॥
মনাবিষ্ট হৈয়া যেহি করায়ে শ্রবণ।
সমস্ত পায়ুয়ে কিংবা অর্দ্ধেক কথন॥
নতুবা তাহার সাধ্য কিংবা একাধ্যায়।
কিংবা এক উপাখ্যান ইহা যে শুনায়॥
পায়ায় কোরি কিংবা শ্লোকার্দ্ধ দ্বারায়।
তাহাকে জানিবা ইষ্ট দেবতার প্রায়॥
যে স্থানেতে কাশীখণ্ড করয়ে পঠন।
সে স্থানেতে অমঙ্গল না হবে কখন॥
বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হন যার প্রতি।
কাশীখণ্ড শুনিতে তাহার হয় মতি॥ ইত্যাদি।

কিন্তু এত প্রলোভনেও তাঁহার গ্রন্থের অধিক প্রচার হয় নাই। একখানি মাত্র গ্রন্থ তাঁহার প্রতিবেশীর গৃহে কাষ্ঠফলকাবদ্ধ রহিয়া তদীয় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের শেষ চিহ্ন বহন করিতেছে। কেবলকৃষ্ণের গ্রন্থ রচনার পরই মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবের কাল উপস্থিত হওয়ার বোধ হয় এরূপ হইয়াছিল।

আমরা কাশীখণ্ডের যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, উহা ১২৪৭ সনের ২২শে ফাল্গুন লিখিত। লেখক কবির প্রতিবেশী শ্রীরাজেশ্বর রায়। পত্র সংখ্যা ২৫২।

কাশীখণ্ড ব্যতীত কেবলকৃষ্ণবসু রচিত সত্যনারায়ণের একখানি সংক্ষিপ্ত পাঁচালী আছে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।
কেদারপুর।

জ্যোতিষিক পরিভাষা।

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত, রঙ্গনাথকৃত গূঢ়ার্থপ্রকাশক নামক ভাষ্য এবং ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায় হইতে সঙ্কলিত)

Aldebaran (*α Tauri*)	রোহিণী (যোগতারা)
Altitude of Sun	উন্নতি
Altitude of Sun, sine of	মহাশঙ্কু, শঙ্কুজীবা
Do. do. when on meridian.	মধ্যশঙ্কু
Altitude of Sun, sine of, when on Prime Vertical	সমমণ্ডলশঙ্কু
Altitude of Sun, sine of, when on the vertical passing through N. E. and S. W. points or N. W. and S. E. points	কোণশঙ্কু
Angle between Ecliptic and small circle through a body parallel to Prime Vertical (or angle between Ecliptic and Prime Vertical)	বলন
Angle between small circles through a body parallel to Prime Vertical and Equator (or angle between Equator and Prime Vertical)	আক্ষবলন
Angle between Ecliptic and small circle through a body parallel to Equator (or angle between Ecliptic and Equator)	আয়নবলন
Annual parallax of a superior planet	শীঘ্রফল
Antares (*α Scorpionis*)	জ্যেষ্ঠা (যোগতারা)
Antipodal	সমসূত্রস্থ, কুদলান্তরস্থ

গৌড়াধিপ মদনপালের তা

(সম্মুখ ভাগ)

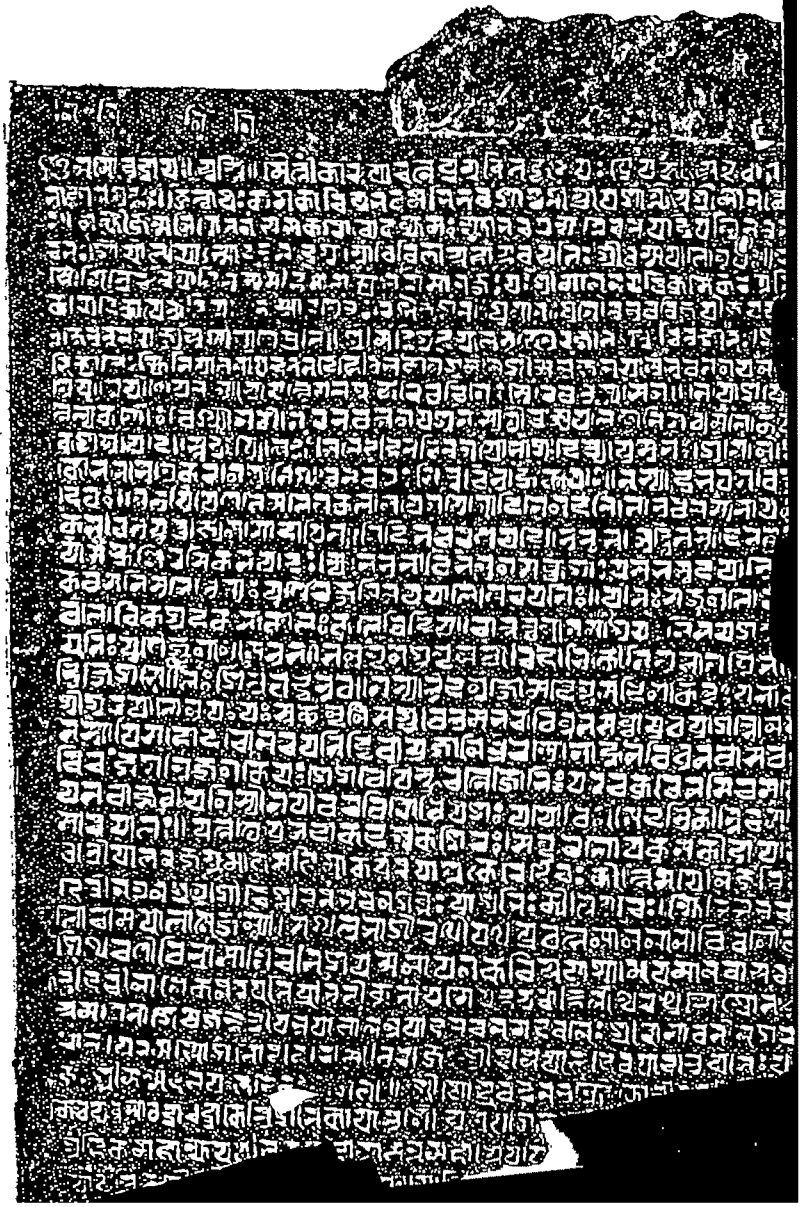

and oblique ascensions of a planet (i. e. portion of Equator intercepted between Declination Circle and secondary to Prime Vertical passing through the planet)	চর, চরদল
Difference between right and oblique ascensions, sine of	চরজ্যা
Direct motion	ঋজুগতি
Earth	ভূগোল
East and West line	প্রাচ্যপরা
Eclipse	গ্রহণ
„ , first contact in	প্রগ্রহ, গ্রাস,
„ , middle of	মধ্যগ্রহণ
„ , last contact in	মোক্ষ
„ , duration of	স্থিতি
Eclipsed body, total disappearance of	নিমীলন, বিমর্দ্দ
Eclipsed body, reappearance of	উন্মীলন
Ecliptic	অপমণ্ডল, ক্রান্তিবৃত্ত, ক্রান্তিমণ্ডল
Elongation of an infeior planet	শীঘ্রফল
Epicycle	পরিধি, বৃত্ত
Epoch	ভগণ, অহর্গণ
Equation of time due to obliquity of Ecliptic	উদয়ান্তর
Equation of time due to unequal motion in Ecliptic	ভুজান্তর
Equator, terrestrial	নিরক্ষ, ব্যক্ষ
Equator, celestial	বিষুবন্মণ্ডল, বিষুবদ্বৃত্ত
Equatorial (Instrument)	নাড়ীবলয়
Equation of centre	মন্দফল
Equation of centre, process for finding	মন্দকর্ম্ম

Equinoctial points	বিষুবৎ, বিষুব
Equivalent in *pranas* (period of 4 seconds) of the part of a Sign already traversed	ভুক্তাসবঃ
Equivalent in *pranas* of part of a Sign to be traversed	ভোগ্যাসবঃ
Equivalent of a Sign in right ascension	লগ্নাসবঃ, লঙ্কোদয়াঃ, লঙ্কোদয়াসবঃ
Equivalent of a Sign in oblique ascension (i e. portion of Equator intercepted between two secondaries to the Prime Vertical passing through extremities of the Sign)	উদয়াসবঃ, উদয়প্রাণাঃ
Gemini	মিথুন
α and β *Geminorum* (*Castor* and *Pollux*)	পুনর্বসু
Gnomon	নরযন্ত্র, শঙ্কু
Gnomon, shadow of	ছায়া, প্রভা, ভা
Gnomon shadow of, when the Sun is on the meridian at either equinox	বিষুবদ্‌ভা, পলভা
Heavenly body	জ্যোতিঃ
Heliacal rising of a body	উদয়
Heliacal setting of a body	অস্ত
Horizon	ক্ষিতিজ
Hour angle	নত
Hour-angle, sine of	নতজ্যা
Hyades	রোহিণী
Hydra (ε *Hydræ* is the যোগতারা)	অশ্লেষা
Instrument for taking the Sun's altitude and zenith distance	চক্রযন্ত্র
Intercalary month	অধিমাস
Interval of time by which the	দৃশ্যাংশ, অস্তাংশ, কালাংশ, কালভাগ

rising of a planet precedes or its setting follows that of the sun (or portion of Equator intercepted between the secondaries to the Prime Vertical, passing through the sun and planet)	
Intervals between the middle of an eclipse and the moments of of contact and separation	মধ্যস্থিত্যর্দ্ধ
Interval of time during which the sum of the longitudes of the sun and moon increases by 13°20′ (one lunar mansion)	যোগ
Jupiter	অমরেজ্য, গুরু, জীব, বৃহস্প
Jupiter's cycle of 60 years	বার্হস্পত্যমান
Latitude, terrestrial	অক্ষ
Latitude, celestial (portion of Declination Circle intercepted between a heavenly body and Ecliptic) *	বিক্ষেপ, ক্ষেপ, শর
Leo	সিংহ
β Leonis	উত্তরফল্গুনী (যোগতারা)
δ Leonis	পূর্ব্বফল্গুনী (যোগতারা)
Libra	তুলা
α, *β*, *γ* and *ν Librae* (*ν Librae* is the যোগতারা)	বিশাখা
Line joining rising and setting points	উদয়াস্তসূত্র
Longitude, terrestrial (reckoned from the meridian of Lanka)	দেশান্তর

* So used in the Suryya Siddhanta. The term শর is used in the Gola denote celestial latitude in the modern sense.

Longitude, correction to be applied to the place of a planet for	দেশান্তরফল
Longitude, polar (portion of Ecliptic intercepted between the first point of Aries and the declination circle)	ধ্রুব, ধ্রুবক
Lunar day, half of	করণ
Lune (figure bounded by two circular arcs)	তিমি, মৎস্য
Mars	অঙ্গারক, কুজ, ভূমিপুত্র, ভৌম
Mean solar time	সাবনমান
Mean anomaly, sine of	ভুজজ্যা
Mercury	বুধ, জ্ঞ, শশিজ, সৌম্য
Meridian	যাম্যোত্তর বৃত্ত, ঊর্দ্ধ যাম্যোত্তরবৃত্ত
Meridian, prime, terrestrial	মধ্যরেখা
Miles, about five	যোজন
Minute of arc	কলা, লিপ্তিকা, লিপ্তা
Minutes, twenty-four	ঘটিকা, নাড়ী, নাড়িকা
Moment of conjunction or opposition	পর্ব্বনাড্যঃ, পর্ব্ববিনাড্যঃ
Month, civil	সাবন মাস
Month, lunar (new moon to new moon)	মুখ্য চান্দ্র মাস
Month, lunar (full moon to full moon)	গৌণ চান্দ্র মাস
Month, sidereal	নাক্ষত্র মাস
Month, solar	সৌর মাস
Moon	ইন্দু, অনুক্ষাংশু, শীতাংশু, শীতদীধিতি হিমদীধিতি
Moon, full	পূর্ণিমা, পৌর্ণমাসী
Moon, new	অমাবাস্যা
Moon, cusps of	শৃঙ্গ

Motion, daily	কালগতি, ভুক্তি
Motion, retrograde	বক্রগতি
Node	পাত
Node, moon's ascending *	রাহু
Nonagesimal	ত্রিভোনলগ্ন
Nonagesimal, sine of altitude of	দৃগ্‌গতি, দৃগ্‌গতিজীব।
Nonagesimal, sine of zenith distance of	দৃক্‌ক্ষেপ
Obliquity of Ecliptic	পরমক্রান্তি, পরমাপক্রম
Orbit of a planet	কক্ষা
Orbit of a planet, furthest point from the earth in	শীঘ্রোচ্চ
Orbit, circumference of	পরিণাহ
α Orionis	আর্দ্রা
λ Orionis	মৃগশিরাঃ, মৃগশীর্ষ (যোগতারা)
Parallax in altitude or zenith distance	দৃগ্‌লম্বন
Parallax in latitude	অবনতি, নতি
Parallax in longitude	তরিজ, লম্বন
α Pegasi	পূর্ব্বভাদ্রপদা (যোগতারা)
γ Pegasi or *α Andromedæ*	উত্তরভাদ্রপদা (যোগতারা)
Pegasus, square of	পূর্ব্বভাদ্রপদা এবং উত্তরভাদ্রপদা
Pisces	মীন
Zeta Piscium	রেবতী (যোগতারা)
Planet	গ্রহ, খচর, খচারী
Pleiades (*Alcyone* is the যোগতারা)	কৃত্তিকা
Pole of earth	মেরু
Pole, elevation of celestial	অক্ষোন্নতি
Pole of the Ecliptic	কদম্ব
Pole Star	ধ্রুবতারা

* The word কেতু denoting the moon's descending node does not occur in the Suryya Siddhanta and the Goladhyaya.

Regulus (*a Leonis*)	মঘা (যোগতারা) *
Revolution	ভগণ
Sagittarius	ধনুঃ
δ *Sagittarii*	পূর্ব্বাষাঢ়া (যোগতারা)
σ *Sagittarii*	উত্তরাষাঢ়া (যোগতারা)
Sandclock	রেণুগর্ভ
Saturn	অর্কজ, আর্কি, শনৈশ্চর, মন্দ
Scorpio	অলি, বৃশ্চিক
δ *Scorpionis*	[illegible]যোগতারা)
λ *Scorpionis*	[illegible]রা)
Second of arc	[illegible]
Second, $\frac{1}{3600}$ of a	[illegible]
Second, $\frac{1}{60}$ of a	তৎ[illegible]
Second, $\frac{1}{2^4}$ of a	[illegible]
Seconds, two	
Seconds, four	
Seconds, twenty-four	
Sign of the Zodiac	
Sine	[illegible], মৌর্ব্বিকা
Sines, Table of	[illegible]পণ্ড
Sine of the arcual distance of ascending point from East point	[illegible]া
Sine of the arcual distance between the East point or West point and the point at which a planet rises or sets	অগ্রা
Sine of that arc of the diurnal circle of a body which is intercepted between the horizon and the Dec-	কুজ্যা, ক্ষিতিজ্যা

* The coustellation মঘা is what is familiarly known as the *Sickle*, a minor constellation in Leo.

lination Circle perpendicular to meridian	
Sine of the arc of the diurnal circle of a body intercepted between the horizon and the Prime Vertical	তদ্ধৃতি
Sine of the arc of the diurnal circle of a body intercepted between the horizon and the	ধৃতি
Sirius (*α Canis M*	মৃগব্যাধ, লুব্ধক
Solstice	অয়নান্ত
Solstice, summer	দক্ষিণায়ন
Solstice, winter	উত্তরায়ণ
Solsticial points	অয়ন
Sphere	গোল
Spica (*α Virginis*	চিত্রা
Staff (intrument fo the time of the day)	যষ্টি যন্ত্র
Sun	তগ্মাংশু, তীক্ষ্ণাংশু
β Tauri	ঋ
Taurus	, বৃষন্
Time taken by a ign of the zodiac in rising above the horizon	উদয়প্রাণাঃ, উদয়াসবঃ
Time when the S un and Moon have equal declinati on on the same side of the Equator	ব্যতীপাত
Time when the Sun and Moon have equal declinations on opposite sides of the Equator	বৈধৃতি, বৈধৃত
Ursa Major (Charles's Wain)	সপ্তর্ষি
Vega (*α Lyræ*)	অভিজিৎ (যোগতারা)
Venus	শুক্র, ভার্গব

Versed sine	উৎক্রমজ্যা
Versed sines, Table of	উৎক্রমজ্যার্দ্ধপিণ্ডক
Vertical circle	দৃগ্‌বৃত্ত
δ *Virginis*	আপঃ
θ *Virginis*	অপাংবৎস
Virgo	কন্যা
Year, civil	সাবন বর্ষ
Year, lunar	চান্দ্রবর্ষ
Year, sidereal	সৌরবর্ষ *
Zenith	খমধ্য, সম
Zenith-distance, meridian	নত, নতভাগ, নতাংশ
Zenith distance of a body in any other position	দৃক্

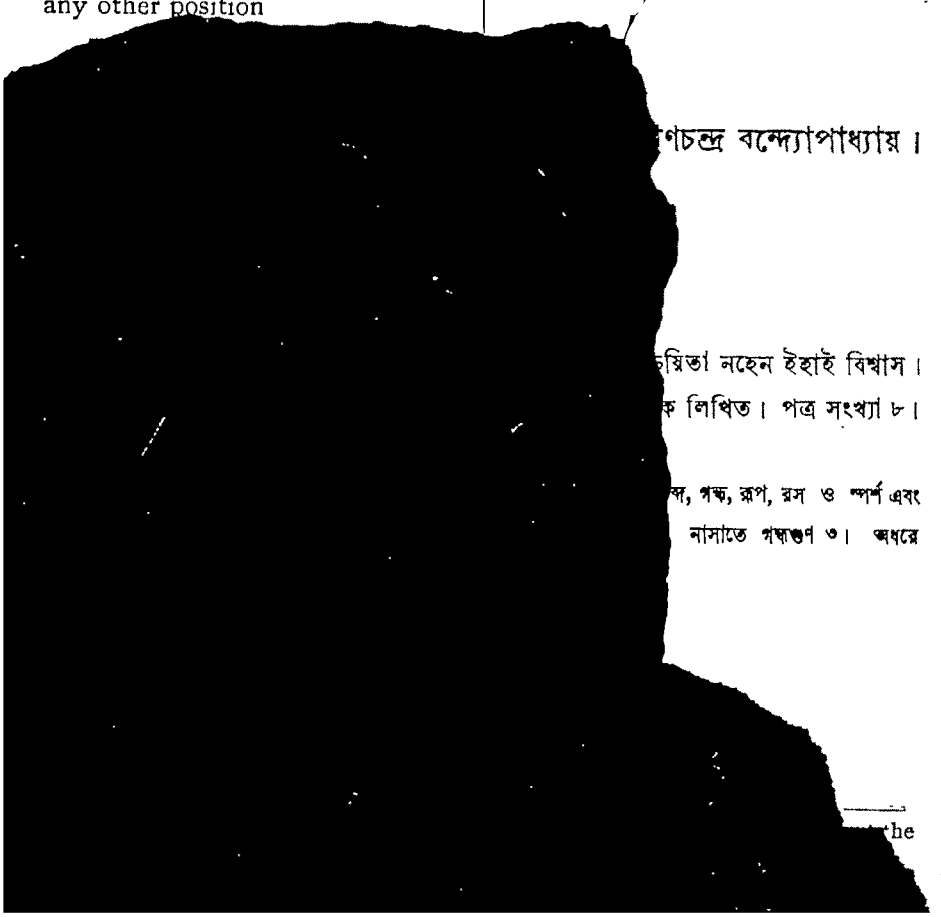

ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

য়িতা নহেন ইহাই বিশ্বাস।

ক লিখিত। পত্র সংখ্যা ৮।

ব্দ, গন্ধ, রূপ, রস ও স্পর্শ এবং

নাসাতে গন্ধগুণ ৩। অধরে

he

২। উপাসনা-সারসংগ্রহ—শ্যামানন্দ দাস।

বিষয়—ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ, শ্লোকসংখ্যা অনুমান ৫০০।

গ্রন্থ করিলা বহু রাগ বৈধী ভেদ।
বৈধী রাগানুগা আর বিধি নিষেধ।
রসের ভজন আর আশ্রয় নির্দ্দেশ।
বৃন্দাবনে কুঞ্জ নির্ণয় দেখাইব শেষ।
রতি নাম ভেদ আর আশ্রয় উদ্দীপন।
লীলা ভক্তি ভেদ আর আশ্চর্য্য কথন।

পরিচয়—ধারেন্দা নিবাসী দুখীকৃষ্ণ দাস—নামান্তর শ্যামানন্দ প্রভু—এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়াই বোধ হয়। গ্রন্থে এইরূপ পরিচয় আছে—

সেই শ্রীজীব গোসাঞি প্রভু যে আমার।
কত দিনে কৃপা করি করিবেন কিঙ্কর।
নাহি জানি ছন্দোবন্ধ না জানি শ্লোকার্থ।
গোসাঞির চরণপদ্ম এই ভরসা সার।

আরম্ভ—শ্রীচৈতন্যমনোভী[illegible]

শেষ—

[illegible]

৩। জগদীশচরি[illegible]

বিষয়—জগদীশ প[illegible]
ত্রিপদী ছন্দে লিখিত ; [illegible]

পরিচয়
জগদীশ
শ্রীকৃষ্ণ।
গ্র[illegible]

...নাদেশে গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ অনুমান ...কি ...ন দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকিবে।

আরম্ভ— জগজ্জনাজ্ঞানহরা করোতি কৃপা যদীয়া ভবসিন্ধুপারম্।
নমামি তস্যাঙ্ঘ্রি সরোজযুগ্মং গুরোর্ব্রজেশাত্মজরূপকস্য॥

শেষ— প্রভু ভাগবতানন্দ, ভবের আনন্দকন্দ,
ভবভয় করহ মোচন।
পড়ি ভব পারাবারে, ডাকিতেছি বারে বারে,
এইবার করহ রক্ষণ॥
গৌরাঙ্গের আজ্ঞামতে, অবতরি অবনীতে,
বহু পাপী করিলে উদ্ধার।
মো হেন অধম জনে, দেখা দিলে আসি স্বপনে,
পুনঃ কি দর্শন পাব আর॥
তাহাতে যে আজ্ঞা হৈল, সেই মত গ্রন্থ কৈল,
...ীন ও আনন্দ দাস।
...সদা গাই,
...হ, নদীয়া।

...হস্ত লিখিত;
...,
...র,
...,

শেষ— পদ্মপুরাণ আর বিশেষ ভাগবতে।
শ্লোকার্থ বিচারিয়া কহি ভাগবতে॥
ইতি ভজনমালিকা গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

ঠিকানা—শ্রীহরিপদ গোস্বামী—যশোড়া, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

৫। প্রহ্লাদচরিত্র—বিপ্র পরশুরাম।

হস্তলিখিত—লেখার কাল বাঙ্গালা ১১৫৯ সাল, ২০ শ্রাবণ। পরিচয় নাই।

আরম্ভ— ধুয়া—ওরে ভাই হরি বড় দয়াময় দেখি।
শুনহ ভকত সব কৃষ্ণের গুণান।
কৃষ্ণ বিনে মনে কিছু না ভাবিহ আন॥

শেষ— এত বলি নৃসিংহদেব হৈল অন্তর্দ্ধান।
গোপাল কৃপায় বিপ্র পরশুরাম গান॥

ঠিকানা—শ্রীহরিপদ গোস্বামী—যশোড়া, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

৬। বৈষ্ণববন্দনা—শ্রী[illegible]

বিষয়—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের [illegible]

পরিচয়— [illegible]

বাঙ্গালা ১০৮৮, শকাব্দ [illegible]

আরম্ভ—

শেষ—

আরম্ভ— শ্রীগোবিন্দব্রজানন্দম্ ইত্যাদি শ্লোক।
এই সব শ্লোকার্থ সংক্ষেপ করিয়া।
লিখি মাত্র আপনার মন বুঝাইয়া॥

শেষ— রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ।
গোবিন্দচরিত কহে যদুনন্দন দাস॥

ঠিকানা—শ্রীদোকড়ি চট্টরাজ—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারিআবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৮। ভক্তিউদ্দীপন—নরোত্তম দাস।

বিষয়—রাগানুগ ভজনক্রম। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত।

আরম্ভ— প্রথমে বন্দিব শ্রীশচীর নন্দন।
যাহার কৃপায় জীব পাইল প্রেমধন॥

শেষ— পূর্ব্বাপর বিচারিতে যদি হয় মন্দ।
তথাপিও এই গ্রন্থ বৈষ্ণব আনন্দ॥
লোকনাথ গোসাঞির পদধূলি আশ।
ভক্তি উদ্দীপন কহে নরোত্তম দাস॥

ঠিকানা—বিপিন দা মহান্ত—ঝামটপুর, পোঃ নলিয়াপুর, বর্দ্ধমান।

৯। মণিহরণ—গুণরাজ খান।

পরিচয়—কুলীনগ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণবিজয়কর্ত্তা। বাঙ্গালা পদ্য হস্তলিখিত। ইহাও ঐ গ্রন্থের এক অংশ মাত্র। ১২৪২ সালের ৯ই মাঘ মাণিকচন্দ্র রুদ্র কর্ত্তৃক লিখিত।

আরম্ভ— কৃষ্ণের চরিত্র লোক শুন একচিতে।
সত্যভামা বিবাহ করিলেন যে মতে॥

শেষ— অদ্ভুত অমৃত কথা শুনিলে
গুণরাজ খাঁ বলেন বন্দিয়া শ্রী
যেবা শুনে যেবা করে কৃষ্ণের
বিষম সঙ্কটে সেই পায়াপরি
অহিকে পরম সুখ অন্তে বি
বদন ভরিয়া ভাই সবে বল
মণিহরণের কথা হৈল
ঐকান্তিকে ভজ সর্ব্বে কৃ
ইতি ভাগবতে মহাপুরাণে ম

ঠিকানা—লালবিহারী দাস মহান্ত—ঝাম

১০। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর

পরিচয়—শ্রীচরিতামৃতলেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আরম্ভ— বন্দিব শ্রীগুরুপদ চিন্তামণিসার।
অভীষ্ট মিলয়ে মোরে চিন্তা মাত্র যার॥

শেষ— যে সুকৃতি পঢ়ে ইহা গাঢ় শ্রদ্ধা করি।
সেই হবে রাধাকৃষ্ণ কৃপাপাত্র ভারি॥

ঠিকানা—বিপিনদাস মহান্ত—ঝামটপুর, পোঃ নলিয়াপুর, বর্দ্ধমান।

১১। আগম—যুগলদাস।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতার বর্ণন। বক্তা মহাদেব, শ্রোতা পার্ব্বতী বাঙ্গালা পদ্য, ১১৬৪ সালে লিখিত।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীচৈতন্যপ্রেমরসসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু॥

শেষ— শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ।
এই তত্ত্ব বিচারিল যুগলের দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১২। স্মরণদর্পণ—রামচন্দ্র কবিরাজ।

বিষয়—বৃন্দাবনস্থ লীলাস্থান স্মরণ প্রভৃতি।

পরিচয়—প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নিবাস বুধরি, শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের প্রধান শিষ্য।

আরম্ভ— প্রথমে বন্দিব গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু
কৃষ্ণপ্রাপ্যে যেহ হন মূল।
অ[illegible]নাশ; দীপ্তি করে পরকাশ,
সেই চরণ রাতুল॥

শেষ— [illegible]রোষ, ক্ষমহ সকল দোষ,
[illegible]হি বালকের ভাবে।
[illegible]ভাই, স্মরণদর্পণ যেই,
[illegible]হিল রামচন্দ্র দাস॥

ঠিকানা—রসিকল[illegible]ণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৩। প্রার্থনা [illegible]কুর।

[illegible]। বাসস্থান কোগ্রাম। পদের সংখ্যা ১৩টী

[illegible]না বুঝিলাম সাধু মর্ম্ম,

শেষ— হাহা নিতাই ফাটে হিয়া, তোমা রত্ন হারাইয়া,
হয়ে আছি দুষ্কর্ম্মেতে ভোগী।
জন্মে জন্মে নাথ তুই, ছি ছি ছার জীব মুই,
ধিক লোচনদাস ভব-রোগী।

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৪। সাধনোপায়—মুকুন্দদাস।

বিষয়—বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশেষের সাধনতত্ত্ব।

পরিচয়—কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ হাড়াই পণ্ডিত তনয়।

শেষ— কৃষ্ণদাস কবিরাজ পদে যার আশ।
সাধন উপায় রচে সে মুকুন্দ দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৫। গোবিন্দবিলাস—যদুনন্দন দাস।

বিষয়—কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ, হস্ত লিখিত; ১৫৯৩ শকাব্দ! ভাদ্রস্য সপ্তদশ দিবসে সম্পূর্ণঃ।

ইহার আরম্ভ ও শেষ ৭ সংখ্যা দেখ।

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৬। রাগরত্নাবলী—মুকুন্দ গোস্বামী।

বিষয়—রাধাকৃষ্ণরস বর্ণন। ভাষাপদ্য।

পরিচয়—শ্রীকৃষ্ণদাস করিরাজের শিষ্য।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াম
নিত্যানন্দ প্রভু মোরে হই

শেষ— বীজ নব প্রোথিত গ্রন্থের
শ্রীমুকুন্দ গোসাঞি গ্র

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, ব

১৭। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি।—গ্রন্থ গ্রন্থ গ্রন্থ
প্রথম পত্র খানি পাওয়া যায় নাই। ত্রিশ দণ্ড

শেষ— হাহা নিতাই ফাটে হিয়া, তোমা রত্ন হারাইয়া,
হয়ে আছি দুষ্কর্ম্মেতে ভোগী।
জন্মে জন্মে নাথ তুই, ছি ছি ছার জীব মুই,
ধিক লোচনদাস ভব-রোগী।

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৪। সাধনোপায়—মুকুন্দদাস।

বিষয়—বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশেষের সাধনতত্ত্ব।

পরিচয়—কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ হাড়াই পণ্ডিত তনয়॥

শেষ— কৃষ্ণদাস কবিরাজ পদে যার আশ।
সাধন উপায় রচে সে মুকুন্দ দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৫। গোবিন্দবিলাস—যদুনন্দন দাস।

বিষয়—কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ, হস্ত লিখিত; ১৫৯৩ শকাব্দ ভাদ্রস্য সপ্তদশ দিবসে সম্পূর্ণঃ।

ইহার আরম্ভ ও শেষ ৭ সংখ্যা দেখ।

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৬। রাগরত্নাবলী—মুকুন্দ গোস্বামী।

বিষয়—রাধাকৃষ্ণরস বর্ণন। ভাষাপদ্য।

পরিচয়—শ্রীকৃষ্ণদাস করিবাজের শিষ্য।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াম
নিত্যানন্দ প্রভু মোরে হই

শেষ— বীজ নব প্রোথিত গ্রন্থের
শ্রীমুকুন্দ গোসাঞি গ্র

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, ব

১৭। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি।—গ্রন্থ গ্রহ গ্রন্থ।
প্রথম পত্র খানি পাওয়া যায় নাই। ত্রিশ দণ্ডে

শেষ— ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভ

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রী

১৮। দুর্ল্লভসার—লোচনদাস ঠাকুর।

বিষয়—দাস্য সখ্য মধুর প্রভৃতি ভাবের বর্ণনা। ভাষাপদ্য, হস্তলিখিত।

পরিচয়—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ লোচনদাস ঠাকুর।

আরম্ভ—চারিটী সংস্কৃত শ্লোক পরে—

এক নিবেদন মোর শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করয়ে গোরা গুণে মূক জন॥

শেষ— আমার বচনে তো করহ বিশ্বাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

১৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগণোদ্দেশদাপিকা—হৃদয়ানন্দ দাস।

বিষয়—কবিকর্ণপুরকৃত মূল সংস্কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ গ্রন্থ।

পরিচয়—গ্রন্থকার খণ্ডবাসী রঘুনন্দনবংশীয়।

আরম্ভ— [illegible]মাবলীগ্রহণতাণ্ডবভাগ্রসজ্ঞং
শ্রীমদ্গাধরতনুং কলিকল্মষঘ্নম্।
বন্দে প্রভুং ভুবনলোকসুখপ্রদঞ্চ
স্বীয়েন রূপসকলেন সুশীলকেন॥

শেষ— শ্রীগুরুচরণকল্প যুগে যার আশ।
গণোদ্দেশ কহয়ে হৃদয়ানন্দ দাস॥

ঠিকানা—পঞ্চানন কবিরাজ—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২০। কিরণদীপিক[illegible]হীন দাস।

এটী গ্রন্থকারের নাম [illegible]নতাসূচক বাক্য।

বিষয়—কবিকর্ণপুর[illegible]দ্দেশদীপিকার বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ।

আরম্ভ— [illegible]দ্ধস্ত ইত্যাদি শ্লোক।

শেষ— [illegible]করিয়া চিন্তন।
[illegible]হীন করিল বর্ণন॥

ঠিকা[illegible], বর্দ্ধমান।

২১। [illegible]

[illegible]রিয়া স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা পর্য্যন্ত অষ্টবিধ নায়িকার
[illegible]স্থানে উদাহরণ গুলি সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত

মধ্য— বড়াই পাঠাইয়া করি আনহ সত্বরে।
মানে মাধব এই দানীর উত্তরে॥

শেষ— বড়াই বলেন যশোদার বালা।
ছাওয়াল হয়্যা জান এত কলা॥
তোমা বই নাহি কহি তরে।
কত রূপ পার ধরিবারে॥
এই সব হাস্য পরিহাসে।
গোপীগণে কানু লৈয়া আইসে॥
নিজ ঘাটে লাগাইল নায়।
নৌকা হৈতে নাবি সবে নিজ ঘরে যায়॥
ইতি দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড সমাপ্ত।

ঠিকানা—লালবিহারী দাস—ঝামটপুর, পোঃ নলিয়াড়া, বর্দ্ধমান।

২৬। সরকার-ঠাকুর-শাখাবর্ণন—রা[illegible]দাস।

বিষয়—নরহরি সরকারের শিষ্যদিগের বিব[illegible]

পরিচয়—রসকল্পবল্লী গ্রন্থের বিবরণ দেখ। বাঙ্গালা প[illegible]দ্য, হস্তলিখিত।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
কল্পবৃক্ষ রূপে প্রেমশাখার বিস্তার॥

শেষ— শাখা উপশাখা যত ভুবন ভিতরে।
কাহার শকতি তাহা কহিবারে পারে॥
প্রাচীন সেবক মুখে করিয়া শ্রবণ।
অল্পমাত্র শাখাগণের করিল বর্ণন॥
রতিপতি চরণে করিয়া অভিলাষ।
সরকার ঠাকুরের শাখা কহে রামগোপাল দাস॥

ঠিকানা—উপেন্দ্রবিলাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৭। স্বরূপ বর্ণন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বিষয়—গৌরভক্তদিগের কৃষ্ণলীলার নাম ধাম বর্ণন।

দেবীপ্রসাদ শর্ম্মকর্ত্তৃক ১৭৩৬ শকাব্দার ২৪শে পৌষ লিখিত।

আরম্ভ— জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতৃগণ শুন হয়ে একমন।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈলা যে কারণ॥

শেষ— শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহা রাধাকৃষ্ণ লীলা।
সুখে গৌড়বাসী তাহা সব আস্বাদিলা॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপবর্ণনা কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

ঠিকানা—উপেন্দ্রবিলাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৮। ভক্তিরসালিকা—অকিঞ্চন দাস।

বিষয়—গৌরভক্তিপ্রচার। ভাষাপদ্য। ১১৮৩ সাল ১৬ই জ্যৈষ্ঠ কার্ত্তিকদাস কর্ত্তৃক লিখিত।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিত পাবন হেতু জয় মহাশয়॥

শেষ— শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তিরসালিকা কহে অকিঞ্চন দাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৯। শ্রীকৃষ্ণলীলা[illegible]রাম দাস।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণ[illegible]য়।

আরম্ভ— প্রথমে বন্দিব শ্রীগুরুর চরণ।
যাঁহা হৈতে হৈল মোর অজ্ঞান নাশন॥

শেষ— ব্রজেন্দ্রনন্দন পাদপদ্ম মোর আশ।
কৃষ্ণলীলামৃত কহে বলরাম দাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

৩০। শাখাবর্ণন—রসিক দাস।

বিষয়—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্যদিগের বিবরণ। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত।

পরিচয়—নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য গৌরাঙ্গ ঘোষাল; ইঁহার বাসস্থান ঘেটুগড়িয়া। গৌরাঙ্গ ঘোষালের পুত্র শ্রীরাম ঘোষাল; তাঁহার শিষ্য রসিক দাস এই গ্রন্থের প্রণেতা।

আরম্ভ— জয় জয় প্রেমদাতা ঠাকুর নরহরি।
বন্দো সেই পাদপদ্ম শিরে কর জোড়ি॥
ভূখণ্ডে শ্রীখণ্ড স্থান তাতে অবতরি।
শাখায় উপশাখায় যার ভুবন বিস্তারি॥

শেষ— অন্য তৃষ্ণা পরিহরি, এই যেন মনে করি,
রাধাকৃষ্ণ সেবা অনুক্রম।
ব্রজে বাস যোগ্য হঙ, এইমাত্র মুঞি চাঙ,
রসিক দাস করে নিবেদন॥

ঠিকানা—উপেন্দ্রবিলাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

৩১। সারসংগ্রহ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বিষয়—সাধারণের এই গ্রন্থ পাষণ্ডদলন নামে পরিচিত। পৌরাণিক প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণভক্ত ও ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন। ১১৮৫ সালের ৫ ভাদ্র স্বহস্তে লিখিত।

আরম্ভ— শ্রীকৃষ্ণ ভজনে ভাই সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী॥

শেষ— শ্রীরূপ রঘুনাথ দাস যার আশ।
সারসংগ্রহ কহে এই কৃষ্ণদাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

৩২। চৈতন্যচন্দ্রামৃত—গ্রন্থকারের নাম নাই।

বিষয়—প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতের ভাষা পদ্য; লেখক গোপীচরণ দাস।

আরম্ভ— গাওরে গৌরাঙ্গ গুণ মজাইয়া চিত।
বড় অপরূপ হয় গৌরাঙ্গচরিত॥

শেষ— শ্রীপ্রবোধানন্দ এই গৌরলীলা।
লিখিয়াছেন শ্লোকবন্দে মনোহরলীলা॥
তাঁহার চরণে আমি করিয়া প্রণাম।
প্রাকৃত যোটনে তবে কিছু কৈল গান॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৩৩। চমৎকারচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস।

বিষয়—ভজন-সাধন ও ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বিচার। ১২৪৫ সালে লিখিত।

আরম্ভ— শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

শেষ— শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকারচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৩৫। প্রেমামৃত—গুরুচরণ দাস।

বিষয়—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর লীলা বর্ণন। এই গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম আদিলীলা, ইহাতে আচার্য্য প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনগমনের পূর্ব্ব কালের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবন গমন হইতে গ্রন্থসহ যাজীগ্রাম আগমন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ মধ্যলীলা। শিষ্যকরণাদি ও গতিগোবিন্দের জন্ম পর্য্যন্ত তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ শেষ লীলা।

পরিচয়—গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে গ্রন্থকার এক স্থানে লিখিয়াছেন—

আর এক নিবেদন মোর শুন মহাশয়।
আমা হৈতে নহে ইহা জানিবা নিশ্চয়॥
আমার ঈশ্বরীর হয় গৌরপ্রিয়া নাম।
কৃপা করি তেঁহ মোরে দিলা আজ্ঞা দান॥
আমার প্রভুর লীলা গান কর তুমি।
গ্রন্থমতক্রমে কহ আজ্ঞা দিল আমি॥

এই গৌরপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পত্নী, শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুরের মাতা।

গ্রন্থারম্ভের শেষ অংশ—

নিত্যানন্দ দাসের [illegible] শিরে নিল।
যাঁহা মত লীলার অনুসার পাইল॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমামৃত গায় সুখে গুরুচরণ দাস॥

অন্যত্র— জাহ্নবার আজ্ঞা বলে, নিত্যানন্দ দাস কৈলে,
শেষ লীলার বিস্তার বর্ণন।
তাঁর সূত্রমত লয়ে, গুরুপদ স্পর্শ পাঞা,
গায় কিছু এ গুরুচরণ॥

শেষ— মো সম অধম আর নাহিক সংসারে।
গুরু আজ্ঞা দিলা প্রভুর লীলা গাইবারে॥
গুরু কৃষ্ণ ভক্ত তিন এক স্বরূপ হয়।
আজ্ঞা শিরে ধরি যেবা হইল উদয়॥
নিত্যানন্দ দাসের পদে শরণ লইল।
তাঁর কৃপায় সূত্র লীলার অনুসার পাইল॥
সেই মত গাই কেহ দোষ না লইবা।
ভৃত্যানুভৃত্য জ্ঞানে মোরে কৃপা যে করিবা॥
* * * * *
এই মত প্রভুর লীলা যেই স্ফূর্ত্তি হৈল।
শ্রীগুরুচরণ স্পর্শে তাহাই পাইল॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমামৃত গায় সুখে গুরুচরণ দাস॥

এই গ্রন্থের লিখিত নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাসগ্রন্থকার; ইনিই শ্রীনিবাস চরিত্রের আদি লেখক; ইহার পরেই গুরুচরণ এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা ৪৪০০, পত্র সংখ্যা ১৪৭।

ঠিকানা—শ্রীশশিভূষণ ঠাকুর—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৩৬। শ্রীগীতগোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যাম দাস।

পরিচয়—প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র এবং দিব্যসিংহের পুত্র। এই কবি শ্রীনিবাসপুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য ছিলেন।

মঙ্গলাচরণ শ্লোক—শ্রীগোবিন্দপতিং নত্বা শ্রীচৈতন্যরসপ্রদম্।
শ্রীকৃষ্ণমনুসেবেঽহং গোবিন্দরতিমঞ্জরী॥

অন্যত্র পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোকাংশ দেখা যায়।
শ্রীবৃন্দাবনকেলিবর্ণনবিধৌ শ্রীদিব্যসিংহাত্মজঃ।

বিষয়—সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন; ইহাতে কীর্ত্তন গান অনুসারে প্রথমতঃ গৌরকীর্ত্তন, পরে কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিত হইয়াছে; ইহার কৃত পদ পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আরম্ভ—

সিন্ধুর্বিন্দুমহো প্রযচ্ছতি ন হি স্বৈরী ন ধারাধরঃ
সংকল্পেন বিনা দদাতি ন কদাপ্যম্লঞ্চ কল্পদ্রুমঃ।
সচ্ছন্দোঽপি বিধুঃ সুধাবিতরণে রাত্রিন্দিবাপেক্ষতে
দাতা কোঽপি ন দৃশ্যতে বিনিয়মঃ শ্রীগৌরচন্দ্রং বিনা॥

ইহার অনুরূপ পদ—

কো কহ অপরূপ প্রেম-সুধানিধি
কোই কহত রসমেহ।
সোই কল্পতরু
মঝু মনে হোয়ত সন্দেহ॥
পেখলু গৌরচান্দ অনুপাম।
যাচত থাক মূল নাহি ত্রিভুবনে,
ঐছে রতন হরিনাম॥
যে এক সিন্ধু বিন্দু নাহি বিতরই,
পরবশ জলদ সঞ্চার।
মানস অবধি, রহত কল্পতরু,
কো অছু করুণা অপার॥
যছু চরিতামৃত শ্রুতি পথে সঞ্চরু
হৃদয় সরোবর পূর।
উখড়ই অধম নয়ন মরুভূম হি
হোয়ত পুলক অঙ্কুর॥
নামহি যাক তাপ সব মেটই
তাহে কি চাঁদ উপামে।
কহ ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত,
কোটি কোটি একু ঠামে॥

শেষ শ্লোক— গোবিন্দঃ শরণং স ** গোবিন্দ মীড়েমুদা
গোবিন্দেন বিধাস্যতে ** স্তস্মৈনমঃ সর্ব্বথা।
গোবিন্দাৎ পরমো ন বন্ধুরভিতস্তস্যৈব হেতোরতি
গোবিন্দং খিলকার * ত্বমিতি চেদ্ গোবিন্দকামাৎ ক্রিয়া।

ঠিকানা—শ্রীশশিভূষণ ঠাকুর—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

অলঙ্কারশাস্ত্র প্রবন্ধ।

অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব বর্ত্তমান সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আমাদের প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; ও বহু যত্নে বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রীতিপ্রকরণ মধ্যে প্রবন্ধলেখক মহাশয় বৈদর্ভী রীতি, মাগধী রীতি প্রভৃতির স্বরূপ বুঝাইবার জন্য কতকগুলি বাঙ্গলা রচনার দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বৈদর্ভী মাগধী প্রভৃতি নাম গুলি পারিভাষিক অর্থে নির্দ্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট রচনায় প্রযুক্ত হইলেও সমস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যেই উহাদের উদাহরণ মিলিতে পারে। বাঙ্গালা রচনায় সেই সেই গুণবিশিষ্ট [illegible] সকল নাম প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না। এই কারণে লেখক মহাশয়ের সঙ্কলিত উদাহরণ গুলি [illegible] সংজ্ঞামাত্র প্রকাশ করা গেল।

ইংরাজী সাহিত্যের সংশ্রবে আসিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নূতন নূতন রস, নূতন নূতন গুণ ও নূতন নূতন দোষ ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে বাঙ্গালা রচনা মধ্যেও প্রবেশ করিতেছে। সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সৌন্দর্য্যবুদ্ধির ও রুচিবোধেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অলঙ্কারশাস্ত্র গঠন করিতে হইলে কেবল সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষার এখন গঠনক্রিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনার সহিত কালে বাঙ্গালা সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনার আবশ্যকতা আসিবে।

তথাপি সংস্কৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালাভাষার সম্বন্ধ চিরস্থায়ী। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হইবে আশা করা যায়।

পত্রিকা সম্পাদক।

৫ম ভাগ।] [৪র্থ সংখ্যা।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

বাঙ্গালার আদি রসায়নগ্রন্থ।

কিছুদিন হইল, পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয় হইতে একখানি রসায়ন গ্রন্থ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির সহিত বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে দেখিয়া উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য ইংরাজ মিশনারিদের নিকট নানাকারণে ঋণী। বর্ত্তমান [illegible]ত্যের অভ্যুদয়ের আরম্ভে প্রায় সর্ব্বত্রই মিশনারিদের হাত দেখা যায়। বাঙ্গালা [illegible] এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। সেকালের মিশনারিরা ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে দেশীয়জনগণের সহিত আত্যন্তিকভাবে মিশিতে চাইতেন। একালের মিশনারিরা আর দেশীয়দের সহিত মিশিতে চাহেন না। ইহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই এবং তজ্জন্য আমাদের মাথাব্যথারও প্রয়োজন নাই।

উপস্থিত গ্রন্থ মার্শমান প্রভৃতি মিসনারিদের প্রযত্নেই প্রচারিত। গ্রন্থের নাম Principles of Chemistry by John Mack of Serampur College—কিমিয়া বিদ্যার সার, শ্রীযুত জান মাক সাহেব কর্ত্তৃক রচিত ও গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। গ্রন্থ শ্রীরামপুর যন্ত্রে ১৮৩৪ অব্দে মুদ্রিত। বর্ত্তমান পুস্তক ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র। দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল কি না জানি না। সম্ভবতঃ লঙ্ সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকার মধ্যে এ বিষয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।*

---

* লঙ্ সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকার অনুবাদ পরিষৎ-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিছু দিন হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়াছে। আশা করি, পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় ইহার পুনঃ প্রচারে মনোযোগী হইবেন। উক্ত তালিকা আজকাল দুর্লভ গ্রন্থ। যতদূর জানি, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত একখণ্ড গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষৎকে প্রদান করিয়াছিলেন ও তাহা অদ্যাপি পরিষদের পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে।

ডিমাই বার পেজী আকারে গ্রন্থের পৃষ্ঠসংখ্যা ১৯—১৬৯, প্রথম উনি[illegible] সূচী আছে। ভূমিকা ইংরাজীতে লিখিত। সূচী ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় [illegible] গ্রন্থের দুই ভাগ। প্রত্যেক ভাগ অধ্যায়ে ও প্রত্যেক অধ্যায় প্রকরণে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'কিমিয়া-প্রভাব' chemical forces, যথা "আকর্ষণ", "তাপক", "আলোক", "বিদ্যুতীয়-সাধন", বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়—"কিমিয়া-বস্তু"—Chemical substances ; তন্মধ্যে দুই অধ্যায়ে "বিদ্যুৎ-সম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্তু" (electro-negative substances), "ধাতুভিন্ন বিদ্যুৎসম্পর্কীয় স্বভাবরূপ বস্তু" (unmetallic electro-positive substances) বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ধাতু ব্যতীত অন্য সমুদয় মূল পদার্থ অর্থাৎ non-metal দিগকে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই শ্রে[illegible] বিভাগ আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। প্রথম শ্রেণী বা electro-negati[illegible] শ্রেণী মধ্যে Oxygen, Chlorine, Bromine, Iodine, Fluorine স্থান পাইয়াছে। দ্বি[illegible] বা electro-positive শ্রেণী মধ্যে Hydrogen, Nitrogen, Sulphur, Phosphoru[illegible] Carbon, Boron, Selenium স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ধাতু সকলের ও [illegible] পদার্থের—"সেন্দ্রিয় সম্পর্কীয় বস্তু" সকলের—বিবরণ থাকিবে, গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ আভাস আছে। গ্রন্থশেষে "ক্রোড়পত্র" (Appendix) মধ্যে চিত্রসম্বলিত বাষ্পীয় এঞ্জিনের ব্যাখ্যা আছে।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভূমিকা মধ্যে নিম্নোদ্ধৃতরূপ কথা আছে,—"Mr. Marshman having proposed some years ago, to publish an original series of el[illegible] works on history and science, for the use of youth in Indi[illegible] privilege to be assosciated with him in the undertaking [illegible] mised to furnish such parts of the series as were more intimately con-nected with my own studies. Other engagements have retarded the execution of our project, much against our will. He has therefore been able to do no more than bring out the first part of his Brief Survey of History ; and now, at length, I am permitted to add to it, this first volume of the Principles of Chemistry."

গ্রন্থকার শ্রীরামপুরকলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীরামপুর কলেজে তৎকালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সহকারে শিক্ষাদান ঘটিত। স্কটলণ্ডনিবাসী জেম্‌স্ ডগ্‌লাস্ যন্ত্রাদি ক্রয়োদ্দেশে পাঁচশত পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতিষ, বলবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রচার গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছিল জানি না। বোধ করি, উল্লিখিত লর্ড্ সাহেবের তালিকায় এই বিষয়েরও মীমাংসা হইতে পারে। শ্রীরামপুরে ছাত্রগণের নিকট ও কলিকাতায় গ্রন্থকার রসায়ন সম্বন্ধে যে 'লেক্‌চার' দিতেন, তাহাই অবলম্বনে বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

রসায়ন শাস্ত্রে বাঙ্গালা ভাষায় এই আদি গ্রন্থ। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "Be it understood, the native youth of India are those for whom we chiefly labour [illegible]

their own tongue is the great instrument by which we hope to enlighten them." গ্রন্থকার এক জায়গায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা—এমন কি—কোন শিক্ষাই চলিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য যিনি সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবেত সদস্যবৃন্দের অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে সেদিন বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃস্তন্যের স্থানীয়; কিন্তু জননী বহুদিন হইতে রুগ্না; তাঁহার স্তন্য এখন বিষবৎ পরিহার্য্য। রুগ্নার অন্য চিকিৎসা আবশ্যক, কিংবা রুগ্নাকে একবারে যমমন্দিরের পথ প্রদর্শন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, তাহা চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ সভাপতি মহোদয় স্থির করিয়া বলেন নাই।

এই গ্রন্থখানির অধ্যয়নে প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়। চৌষট্টি বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানের বাল্যকাল ছিল। বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থার একটী ক্ষুদ্র চিত্র বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে অঙ্কিত দেখিতে পাই। তখন যাহা অজ্ঞাত ছিল, তাহা এখন জ্ঞাত; তখন যাহা অস্পষ্ট ছিল, এখন তাহা স্পষ্ট। তাপ তখনও দ্রব পদার্থ মধ্যে গণ্য হইত; আলোক দ্রুতগামী ক্ষুদ্র কণিকার বর্ষণ হইতে উৎপন্ন, এ বিশ্বাস এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই; তাড়িতের অধিকাংশ ধর্ম্মই অজ্ঞাত ছিল। তাড়িতের সহিত রাসায়নিক আকর্ষণের কি একটা রহস্যময় সম্বন্ধ আছে, ইহা ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছিল। রসায়নশাস্ত্রের দ্বৈতবাদ তখন আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, ডাল্টনের পরমাণুবাদ আঁধারে আলোক আনিতে গিয়া আঁধারকে আরও ঘনাইয়া তুলিতেছিল। অধিকাংশই মূল পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব তখনও নির্ণীত হয় নাই। নাইট্রজেনের এক পরমাণুর সহিত অক্সিজেনের পাঁচ পরমাণু যোগে নাইট্রিক এসিড জন্মে। এইরূপ বিবিধ তত্ত্ব তখন রসায়নজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতেছিল। এখন সে সমস্ত মত উল্টাইয়া গিয়াছে। রসায়নশাস্ত্র নানা রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া, নানা তথ্যের আবিষ্কার করিয়া এখন মহাবিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু হায়, বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এখনও অপূর্ণ ও জীর্ণ। বর্ত্তমান গ্রন্থে বাঙ্গালায় রসায়ন শাস্ত্রের যে অবস্থা দেখিতে পাই, তাহা অপেক্ষা বড় অধিক উন্নতির চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাই না।

গ্রন্থের ভাষা সত্তর বৎসরের পূর্ব্বতন বাঙ্গালা; গ্রন্থের বিষয় বিজ্ঞান; গ্রন্থকার ইংরাজ। সুতরাং গ্রন্থের ভাষায় যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাই প্রচুর আমোদের সঞ্চার করে। বাঙ্গালা ভাষা আজকাল সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু তথাপি বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য প্রচারে সাহসী হয় না। এখনও বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালা ভাষা সাধারণের বোধগম্য হয় না। যাঁহারা বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার দৈন্য বুঝিতে পারেন। এখনও এই অবস্থা!—সত্তর বৎসর পূর্ব্বে একজন বৈদেশিক কিরূপে সাহস অবলম্বন করিয়া, এই দীন হীন ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয় বিষয়। তাহাতে শিখিবার কথা আছে। বৈদেশিকের যে

সাহস ছিল, আমাদের সে সাহস আছে কি? থাকিলে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের এরূপ অবস্থা হইত না।

ভাষার নমুনা স্বরূপ দুই এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কিমিয়া বিদ্যা দ্বারা এই এই শিক্ষা হয়, বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তুজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু, যে যে ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে ঐ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা।" ৩ পৃঃ।

"কিমিয়া প্রভাব চারিপ্রকার। ১ আকর্ষণ। ২ তাপক। ৩ আলোক। ৪ বিদ্যুতীয় সাধন। অনুমান হয় যে অপর একপ্রকার চুম্বকীয় গুণ।" ৫পৃঃ।

"দ্রব হওনকালে কতক তাপক দ্রব বস্তু মধ্যে লীন হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা দ্রব বস্তুর তাপের কিছু বৃদ্ধি হয় না এবং সেই দ্রব বস্তু পুনর্ব্বার কঠিন হইলে তাপক বোধ হয়। এই এক মহার্ঘ কথা বিষয়ে পশ্চাৎ স্পষ্টরূপে লেখা যাইবেক।" পৃঃ ৩১।

"এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরমেশ্বর যে আছেন এবং তাঁহার অসীম পরাক্রম ও বুদ্ধি ও ভদ্রতাতে লোক সকলকে দৃষ্টি ও রক্ষা করিতেছেন ঐ সকল প্রমাণেতে তাঁহাকে স্তুতিবাদ কে না করিবে।" ৪১ পৃঃ।

"আলোকের চলন ও কার্য্যদ্বারা অনেকে বোধ করে যে সে একপ্রকার বস্তু। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে সে বস্তু নহে, কেবল বস্তুর মধ্যগত একপ্রকার বিশেষ সংলাড়ন দ্বারা উৎপন্ন।" ৫০ পৃঃ।

"আলোকের চলন শীঘ্র বটে তথাপি মাপিত হইতে পারিবে। অপর আলোক চলত বাধিত কিম্বা অন্য দিগে পরাবর্ত্তিত হইতে পারিবেক।" ৫০ পৃঃ।

"সামান্য আকাশের মধ্যস্থ অগ্নিজানের দ্বারা তাবৎ জীব জন্তুর প্রাণ রক্ষা হয় এবং তাহাতে মনুষ্যের ব্যবহারকর্ম্মনিমিত্তক তাবৎ অগ্নি জাজ্বল্যমান হয়, অতএব আমারদের ভদ্রদ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের হিতজনক কার্য্যের মধ্যে সামান্য আকাশকে বিশেষরূপে গণনা করিতে হয়।" ১১১ পৃঃ।

"সোদিয়মের প্লোরিণ অর্থাৎ সামান্য লবণের ৮ ঔন্স আর গুড়াকৃত মাঙ্গানেসের কালা অক্সিদের ৩ ঔন্স হামামদিস্তাতে গুঁড়া করিয়া, তাহা রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ ঔন্সে মিশ্রিত গান্ধকিকাম্লের ৪ ঔন্স ঠাণ্ডা হইলে, তাহার উপর ঢালিয়া, সে সকল অল্পে অল্পে উত্তপ্ত কর তাহাতে প্লোরিণ আকাশ নির্গত হইবে।" ৭২ পৃঃ।

এই যথেষ্ট। আধুনিক কালে লিখিত কোন কোন পুস্তকের ভাষার সহিত মিলাইলে এই ভাষাকে বড় বেশী দুর্ব্বোধ মনে হইবে না।

রসায়ন খণ্ডের পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে আধুনিক গ্রন্থকারদের যে সমস্যা উপস্থিত হয়, ম্যাক সাহেবেরও তাহা উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"In composing this volume, my primary object has been to introduce chemistry into the range of Bengalee literature, and domesticate its terms and ideas in this language. The attempt will be generally acknowledged to have been attended with no

small difficulties . . . . The names of chemical substances are, in the great majority of instances, perfectly new to the Bengalee language ; as they were but few year ago to all languages. The chief difficulty was to determine, whether the European nomenclature should be merely put into Bengalee letters, or the European terms be entirely translated by Sungskrit, as bearing much the same relation to Bengalee as the Greek and Latin do to the English . . . I have preferred, therefore, expressing the European terms in Bengalee characters, merely changing the prefixes and terminology, so as decently to incorporate the new words into the language."

কটক কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত "সরল রসায়ন" বোধ করি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত রসায়ন সম্বন্ধীয় শেষ গ্রন্থ। ইহার মুদ্রণের তারিখ ১৮৯৮। এই গ্রন্থেও ম্যাক্ সাহেবেরই প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে যোগেশ বাবুর মত, মৎপ্রণীত রাসায়নিক পারিভাষার সমালোচনা উপলক্ষে [illegible] পরিষৎ পত্রিকার ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি কিন্তু অদ্যাপি আমার [illegible] তে পারি নাই।

ইংরাজি পারিভাষিক শব্দগুলিকে অক্ষরান্ত [illegible] উচিত, কি তাহাদের অনুবাদ আবশ্যক, এই কথা লইয়া তর্ক। রসায়নশাস্ত্রে [illegible] রিভাষিক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদের চেষ্টা বৃথা শ্রম মাত্র। এ [illegible] ক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কতকগুলি মূল ও যৌগিক পদার্থ আমা[illegible]ারিক কার্য্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; আমি সেই পদার্থ গুলির নামের অনু[illegible]ক্ষপাতী। অর্থাৎ স্থূলতঃ, যে সকল পদার্থ পৃথিবী মধ্যে তেমন বিরল নহে, প্রচুর পরিমা[illegible]ানে সেখানে পাওয়া যায়, তাহাদের নামের অনুবাদ করিয়া, তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিবে। আর অক্ষরান্তরিত করিবার সময়ে বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণশক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দ গুলিকে একটু কাটিয়া ছাঁটিয়া মোলায়েম করিয়া লইতে হইবে। যোগেশ বাবু কোন স্থানেই অনুবাদে রাজী নহেন ; অক্ষরান্তরিত করিবার সময়ে অধিক কাটা ছাঁটারও পক্ষপাতী নহেন। অন্ততঃ তাঁহার রসায়নগ্রন্থ দেখিলে সেইরূপই বোধ হয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্র মাত্রেরই দুইটা অঙ্গ আছে। একটা অঙ্গ পণ্ডিতদিগের জন্য অর্থাৎ খাঁটী বৈজ্ঞানিকের জন্য, সে অংশে ইতর সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই ; অনধিকারীর পক্ষে সেখানে প্রবেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। বিজ্ঞানের অপর অঙ্গ সাধারণের জন্য। কতকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে সাধারণের জীবনযাত্রাই আজকা[illegible] অচল হইয়া পড়ে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা সকল শাস্ত্রেরই মধ্যে খানিকটা অংশ আছে, যাহা সকলের পক্ষেই অবশ্য জ্ঞাতব্য ; সেটুকু না জানিলে কেবল যে মূর্খ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে হইবে তাহা নহে, সে টুকুর জ্ঞান জীবনধারণ, জীবনরক্ষা ও সংসারযাত্রার জন্যই নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোককে বিজ্ঞানের এই ভাগের সহিত পরিচিত করা লোকশিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণের সহিত বিজ্ঞানের এই ভাগের পরিচয় ঘটাইতে হইলে বিজ্ঞানের

ভাবাকেও সাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে। উৎকট পারিভাষিক-শব্দ-ভীষণ ভাষা পণ্ডিতদের জন্য। সাধারণকে বিজ্ঞান শিখাইতে হইলে পারিভাষিকত্ব যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া, ভাষাকেও সুশ্রাব্য ও মোলায়েম না করিলে চলিবে না। তথাপি বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞান উহার পারিভাষিকত্ব কতকটা থাকিবেই। সেই পারিভাষিকত্ব যদি আবার শ্রুতিকঠোর দুরুচ্চার্য্য বৈদেশিক ভাষার আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে সাধারণের পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষার কোন আশাই থাকিবে না। প্রায় আশী বৎসর হইল, বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম রসায়ন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু আজিও বাঙ্গালীর নিকট রসায়নশাস্ত্র একবারে অপরিচিত; তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, যে ভাষায় রসায়নের গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহা বাঙ্গালীর ভাষা নহে; কোনকালে তাহা বাঙ্গালীর ভাষা হইবে না। যাঁহারা আশা করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন যে, বাঙ্গালী জনসাধারণ এককালে ইংরাজিতে পণ্ডিত হইয়া উঠিবে; তখন আর বাঙ্গালা ভাষায় কোন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রণয়নের আবশ্যকতা থাকিবে না, [illegible] তথা স্বতন্ত্র। আমার সে আশা নাই। বাঙ্গালার জনসাধারণ মাতৃভাষা ত্যাগ [illegible], সে আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজি [illegible] গ্রহণ করিবে, বাঙ্গালী বৈদেশিক ভাষার সাহায্যে শাস্ত্রাধ্যয়নে [illegible] সেই দিনের আশা করি ও আকাঙ্ক্ষা রাখি। এই হতভাগ্য দেশে সে শুভদিন [illegible] কখনই আসিবে না; কিন্তু বাঙ্গালীর চেষ্টার অভাবে বা উৎসাহের [illegible] আসে, তবে বাঙ্গালীর ন্যায় অধম জীব সংসার হইতে লুপ্ত হউক।

যোগেশ বাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "যিনি কেবল সংস্কৃত ভাষাকেই বাঙ্গালা ভাষা করিতে বলেন, তিনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা ভাষাকে মৃতভাষায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন।" যেখানে সংস্কৃতমূলক শব্দ পাওয়া গেল না, সেখানে ম্লেচ্ছভাষায় শব্দ গ্রহণ কর; আপত্তি নাই। কিন্তু যদি একটু চেষ্টা করিলে সংস্কৃতমূলক শব্দ পাওয়া যায়, তাহা না করিয়া একবারে ম্লেচ্ছ ভাষার আশ্রয় লইলেই জীবনী শক্তিটা একবারে বাড়িয়া উঠিবে কিরূপে, বুঝিলাম না। উলঙ্গ হইয়া থাকা অপেক্ষা হাট কোট পরা ভাল; কিন্তু ধুতি চাদর বর্ত্তমান থাকিতে যে হাট কোট পরে, তাহার মনুষ্যত্বটা অনেকটা কপিত্বের কাছাকাছি। এই সোজা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। পুনশ্চ যোগেশ বাবু বলেন, "অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি নামগুলিকে কি কারণে অম্লজান, উদজান প্রভৃতি নাম পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, তাহা আমার সামান্য বুদ্ধিতে উপলব্ধ হইতেছে না।" পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট কারণ আছে। প্রাচীন হিন্দুগণ গ্রীকগণের নিকট রাশিচক্রের বিষয় লিখিয়াছিলেন। দ্বাদশ রাশির নামের জন্য ক্রিয়, তাবুরি প্রভৃতি একসেট যাবনিক শব্দ গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু সে নামগুলি চলে নাই; মেষ, বৃষ প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক নামই চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ভাষারই একটা বৈশিষ্ট্য আছে, ইংরাজিতে যাহাকে বলে genius. কোন শব্দ সেই বৈশিষ্ট্যসঙ্গত না হইলে ভাষার মধ্যে মিশে না ও স্থান পায় না। এই সঙ্গতির জন্য ইংরাজেরা সিপাহী শব্দকে 'সেপাই' করিয়া লইয়া-

ছেন; আমরা স্কুলকে ইস্কুল ও টেব্‌লকে টেবিল করিয়া লইয়াছি। এইরূপ কাটা ছাঁটা না করিলে ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয় না; বৈদেশিক শব্দ বৈদেশিকই থাকিয়া যায়; স্বদেশিকের সহিত মিলিতে পারে না। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাসায়নিক গবেষণা দ্বারা বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাকে পারিভাষিক বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। গত কার্ত্তিক মাসের প্রদীপ পত্রে তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে অনুমোদন করি। দুঃখের বিষয় তিনি বর্ত্তমান পরিভাষার কএকটী ত্রুটি দেখাইয়াছেন মাত্র; সংশোধনের পথ দেখান নাই।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ম্যাক সাহেবের গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষাসমিতির ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণেতাদের প্রয়োজনে আসিতে পারে। অনেকগুলি শব্দ যথেষ্ট কৌতুক উৎপাদন করিবে, তজ্জন্য তাহার একখানি তালিকা সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

Chemistry	কিমিয়া বিদ্যা	Mass	রাশি, বস্তু
Optics	দৃষ্টি বিদ্যা	Volume	অবয়ব, রূপ, পরিসর
Heat	তাপক	Solid	কঠিন
Temperature	তাপ	Liquid	দ্রব
Light	আলোক	Gas	আকাশ
Electricity	বিদ্যুতীয় সাধন	Gaseous	আকাশীয়
Magnetism	চুম্বকীয় গুণ	Vapour	বাষ্প
Element	মূল বস্তু	Common air	সামান্য আকাশ
Compound	সঙ্কর বস্তু	Standard	পরিমাপক
Combination	লয়	Specific gravity	স্বাভাবিক গুরুত্ব
Combining weight	লয়যোগ্য ভাগ	Solution	গলন
Equivalent	তুল্য ভাগ	Crystal	স্ফটিক
Atom	পরমাণু	Water of crystallisation	স্ফাটিক জল
Atomic weight	পরমাণু সম্পর্কীয় ভার	Deliquescent	গলনশীল
Law	ব্যবস্থা	Property	গুণ
Analysis	ব্যস্তকরণ	Decomposition	বিভাগ
Synthesis	সমস্তকরণ	Density	নিবিড়ত্ব
Force	প্রভাব	Pressure	চাপন
Attraction	আকর্ষণ	Barometer	বারোমেতর
Cohesion	সংলাগাকর্ষণ	Thermo-meter	তেরেমোমেতের
Gravity	গুরুত্বাকর্ষণ	Surface	মুখ

Tetrahedron	ঘনাষ্টমুখ
Experiment	পরীক্ষা
Saturation	প্রচুরতা
Proportion	ভাগ
Denominator	হারক
Movement	সংলড়ন
Expansion	বৃদ্ধি
Melting	দ্রবত্ব
Evaporation	বাষ্পীভাব
Ignition	অগ্নীভাব
Freezing point	জমাট অংশ
Boiling point	স্ফোটন অংশ
Contraction	সঙ্কোচন
Melting ice	গলনীয় [illegible]
Freezing water	জমনীয় জ[illegible]
Elasticity	স্থিতিস্থাপকীয় শক্তি
Combustion	দহন
Supporter of combustion	দহনপোষক
Radiation	কিরণত্ব
Source	আকর
Sea-level	সমুদ্রজল তুল্য উচ্চস্থান
Conductor	তাপসঞ্চারক
Metal	ধাতু
Equator	রেখাভূমি
Pole	কেন্দ্র
Lens	মৃদঙ্গাকৃতি বস্তু
Specific heat	স্বাভাবিক তাপক
Heat capacity	তাপকধারণ শক্তি
Latent heat	অব্যক্ত তাপক
Sensible heat	ব্যক্ত তাপক
Condensation	ঘনসার সম্পাদন
Pump	বোমা

Air-pump	আকাশ বোমা
Pure	নিভাঁজ
Alloy	কুধাতু
Salt	লবণ
Acid	অম্ল
Alkali	ক্ষার
Retort	রিটোর্ট
Friction	ঘর্ষণ
Reflection	পরাবর্ত্তন
Orange	নারাঙ্গী
Indigo	বাগুণীয়া
Violet	বিওলা
Solar spectrum	সৌর ব্যস্ত বর্ণ
Positive	সভাবরূপ
Negative	অভাবরূপ
Positive pole	সভাবি পার্শ্ব
Negative pole	অভাবি পার্শ্ব
Cell	কেটুয়া
Sattery	মুর্চ্চা
Conductor	সঞ্চারক
Non-conductor	অসঞ্চারক
Insulated	অলগ্ন
Electric machine	বিদ্যুতের কল
Leyden-jar	লেইডেন পাত্র
Spark	স্ফুলিঙ্গ
Ruantity	যতিতা
Intensity or Tension	তেজ
Dispersion	ভিন্নীকরণ
Amber	কহরুবা
Electrometer	বিদ্যুন্মাপক যন্ত্র
Voltaic pile	বল্‌তার স্তম্ভ
Steam engi[illegible]	কল

Boiler	হাঁড়ি
Cylinder	চুঙ্গি
Beam	আড়া
Furnace	অগ্নিকুণ্ড
Safety valve	রক্ষক কপাট
Tank	কুণ্ড
Piston	পালিস
Condenser	জমায়ন পাত্র
Handle	হাতোল
Lever	তরাজু
Fulcrum	আল
Fly wheel	মহাচক্র
Electro-negative substance	বিদ্যুৎসম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্তু
Electro-positive substance	বিদ্যুৎসম্পর্কীয় স্বভাবরূপ বস্তু
Organic	সেন্দ্রিয়
Strong acid	শক্ত অম্ল
Dilute acid	দুর্ব্বল অম্ল
Ash	ভস্ম
Volatile	উড্ডীয়মান
Neutralise	পরিতৃপ্তকরা
Bleaching	শুক্লকরণ
Oxygen	অক্সিজান
Chlorine	খ্লোরিণ
„ protoxide of	খ্লোরিণের প্রথমাক্সিদ
„ peroxide of	পরমাক্সিদ
Chloric acid	খ্লোরিকাম্ল
Perchloric acid	প্রেখ্লোরিকাম্ল
Bromine	ব্রোমিণ
Iodine	ঐয়োদিন
Iodious acid	ঐয়োদাম্ল
Iodious acid	ঐয়োদিকাম্ল
Chloriodic acid.	খ্লোরিয়োদিকাম্ল
Fluorine	ফ্লুওরিণ
Hydrogen	হৈদ্রজান
„ Deutoxide	দ্বিতীয়াক্সিদ
Muriatic acid	সামুদ্রিকাম্ল
Hydrobromic acid	হৈদ্রব্রোমিকাম্ল
Hydroiodic acid	হৈদ্রিয়োদিকাম্ল
Fluoric acid	ফ্লুওরিকাম্ল
Nitrogen	নৈত্রজান
Nitrous oxide	নৈত্র্যাক্সিদ
Nitric oxide	নৈত্রিকাক্সিদ
Nitrous acid	নৈত্রাম্ল
Nitric acid	নৈত্রিকাম্ল
Chloride	খ্লোরিদ
Iodide	ঐয়োদিদ
Ammonia	আম্মোনিয়া
Muriate	সামুদ্রায়িত
Nitrate	নৈত্রায়িত
Sulphur	গন্ধক
Periodide	প্রৈয়োদিদ
Perchloride	প্রখ্লোরিদ
Hyposulphurus acid	উপগান্ধকাম্ল
Sulphurous acid	গান্ধকাম্ল
Sulphoric acid	গান্ধকিকাম্ল
Hyposulphuric acid	উপগান্ধকিকাম্ল
Sulphate	গান্ধকায়িত
Sulphuretted hydrogen	হৈদ্রজানের গন্ধকুরেত
Phosphorus	ফোস্ফোরস
Hypophosphorous acid	উপফোস্ফোরাম্ল
Phosphorous acid	ফোস্ফোরাম্ল

Phosphoric acid	ফোস্ফোরিকাম্ল	Cyanic acid	কিয়ানিকাম্ল
Phosphuretted hydrogen	হৈদ্রজানের ফোস্ফুরেত	Chloro-cyanic acid	খ্লোরোকিয়ানিকাম্ল
		Hydro-cyanic acid	হৈদ্রকিয়ানিকাম্ল
Subphosphuretted-hydrogen	হৈদ্রজানের উপফোস্ফুরেত	Sulphos-cyanic acid	গান্ধকিয়ানিকাম্ল
		Sulphuret of carbon	অঙ্গারের গন্ধকুরেত
Carbon	অঙ্গার	Boron	বোরণ
Carbonic oxide	আঙ্গারিক অক্সিদ	Boracic acid	বোরাকিকাম্ল
Chloro-carbonic acid	খ্লোরাঙ্গারাম্ল	Fluoboric acid	ফ্লুও বোরিকাম্ল
Phosgene gas	ফোশজান আকাশ	Selenium	সেলেনিয়ম
Carbonic acid	আঙ্গারিকাম্ল	Potassium	পটাষিয়ম
Carburetted hydrogen	হৈদ্রজানের অঙ্গুরেত	Sodium	সোদিয়ম
Bicarburetted hydrogen	হৈদ্রজানের দ্বিটঙ্গুরেত	Antimony	রসাঞ্জন
		Alcohol	মদসার
Coal gas	কয়লার আকাশ	Ether	ইতর

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপসর্গের অর্থ-বিচার অবলম্বন করিয়া পরিষদের দুইটী অধিবেশনে দুইটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উভয় প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটী পত্রিকার ৪র্থ ভাগের চতুর্থ সংখ্যা ও দ্বিতীয়টী ৫ম ভাগের ২য় সংখ্যায় স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ দুইটী প্রবন্ধে উপসর্গ সম্বন্ধে অনেক কথা ও প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৎসমস্তই এই সমালোচনার বিষয়। সমালোচনা কার্য্য বড়ই দুরূহ ও অপ্রীতিকর। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আবার প্রবন্ধকার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক, তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচনা একজন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইলেই ভাল হইত। যাহা হউক এক্ষণে বিচার্য্য বিষয়ের গুরুতা ও নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অল্পতা স্মরণ করিয়া যথাজ্ঞান সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ঃ—

প্রবন্ধকার বলেন যে, তিনি উপসর্গের অর্থনিষ্কাশনের জন্য এক নূতন প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, ঐ প্রণালী আর কিছুই নহে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী। উহা প্রবন্ধে 'সাংসাধিক ও দার্ষ্টান্তিক' প্রণালী নামে অভিহিত হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহাদিগকে এই বলিলেই চলিবে যে, ঐ প্রণালীদ্বয়কে যথাক্রমে ইংরাজীতে 'Deductive ও Inductive'

প্রণালী বলে। আর যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা এই বলিলেই বুঝিবেন যে, প্রথমটী সাধারণতঃ অনুমানপ্রণালী, যেমন—পর্ব্বত বহ্নিমান, কারণ উহাতে ধূম আছে ও দ্বিতীয়টী ব্যাপ্তি-নিশ্চয়প্রণালী, যেমন—গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতিতে বহ্নি ও ধূমের একত্রাবস্থান দর্শন করিয়া যে যে স্থানে ধূম আছে, সেই সেই স্থানেই বহ্নি আছে, এইরূপ সিদ্ধান্তনির্ণয়। নিজে এই প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন, এই কথা বলায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যেরা ঐ প্রণালী অনুসরণ করেন নাই, এইরূপ অনুমান একপ্রকার স্বাভাবিক। স্বাভাবিক হইলেও উহা নিঃসন্দেহ না হইতে পারে; কিন্তু প্রবন্ধকার স্বয়ংই ঐ সন্দেহের ভঞ্জন করিয়াছেন। আমি তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠের দিবস ঐ প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া পরিষদের অধিবেশনে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলাম, তাহার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন (২য় প্রবন্ধের শেষাংশ দেখুন—পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ ২য় সংখ্যা ১৩৭ পৃঃ) যে, এদেশীয় পণ্ডিতেরা আগে একটী সিদ্ধান্ত করেন, পরে সিদ্ধান্তিত বিষয়ের উদাহরণগুলিকে যেরূপে হউক সিদ্ধান্তের অনুগত করিতে চেষ্টা করেন; অর্থাৎ প্রথমে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, বিচার প্রভৃতি না করিয়া একটা সিদ্ধান্ত অর্থাৎ Theory করিয়া বসেন। পরে Faets অর্থাৎ 'বৃত্তান্ত' গুলিকে (এইটী তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত শব্দ) গড়িয়া পিটিয়া তাহার সহিত মিশাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। এই প্রণালীকে তিনি Scholastic প্রণালী নামে অভিহিত করিয়াছেন ও ঐ প্রণালী যে "কঠোর সত্যের অগ্নিপরীক্ষায় জর্জ্জরিত হইয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে" তাহাও বলিয়াছেন। সুতরাং যদি তাঁহার কথা সত্য হয়, অর্থাৎ যদি এ দেশীয় পণ্ডিতেরা উপসর্গের অর্থ নিষ্কাশন বিষয়ে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহারা কেবল ভস্মে ঘৃত প্রক্ষেপ করিয়াছেন ও তাঁহাদের কৃত সিদ্ধান্তগুলি অপসিদ্ধান্ত বলিয়া সকল প্রামাণিক ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধের সমালোচনাকালে শাকটায়ন, গার্গ্য, যাস্ক প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীনতম শব্দাচার্য্যের মতের উল্লেখ করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্তই বোধ হয়, তিনি ঐ সমালোচনার উত্তরে 'বার মুনির বার Theoryর কোন একটীকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করার অপরাধে আমাকে অপরাধী করিয়াছেন।" ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, কেবল এখনকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা নহে, প্রাচীন শাব্দিকেরাও তাঁহার মতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শব্দশাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সকল অপসিদ্ধান্ত ও প্রামাণিক ব্যক্তি মাত্রেরই হেয়। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার নিজের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মূল কত দূর দৃঢ় ও সারসহ। পাঠকগণ তাঁহার প্রথম প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি করিবেন;—

ঐ প্রবন্ধের প্রথমেই বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়দিগের উপর কটাক্ষ আছে। তাঁহারা কোন উপসর্গ বিশেষের অর্থ জিজ্ঞাসিত হইলে, সোপসর্গ কোন একটী শব্দ দ্বারা ঐ উপসর্গের অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ মনে করুন, ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল 'প্র' এই উপসর্গের অর্থ কি? তাঁহারা বলিলেন, 'প্রকৃষ্টরূপে', ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল 'বি' এই উপসর্গের অর্থ কি?

উত্তর, বিশেষরূপে, ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল 'সম্' এই উপসর্গের অর্থ কি? উত্তর, 'সম্যক্‌রূপে' ইত্যাদি। এইরূপ উত্তর তাঁহার মতে "উত্তরই নহে" কারণ যে 'প্র' 'বি' ও 'সম্' এই সকল উপসর্গের অর্থই জানে না, সে আবার ঐ সকল উপসর্গযুক্ত পদের অর্থ কেমন করিয়া জানি এক একটী করিয়া গ্রহণ করা যাউক। 'প্র' ইহার অর্থ প্রকৃষ্টরূপে, কিন্তু 'প্রকৃষ্টরূপে' কি তাহা জানিতে হইলে 'প্র' ও 'কৃষ্ট' এই দুইটী শব্দের অর্থ জানিতে হইবে, সুতরাং 'প্র'র অর্থই যখন অজ্ঞাত তখন প্রকৃষ্টরূপে বলিলে উহার অর্থ কিরূপে জানা যাইবে? এইরূপ অন্যান্য স্থলেও বুঝিতে হইবে। এই যুক্তিটী আপাততঃ শুনিতে বেশ বোধ হয়। যুক্তির মূল কথা এই যে, "প্রকৃষ্ট" শব্দের অর্থজ্ঞান 'প্র' ও 'কৃষ্ট' এই দুই শব্দের অর্থজ্ঞান সাপেক্ষ এবং এই মূল কথা (Major Premiss) সত্য হইলে প্রবন্ধকারের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বলিলে 'প্র'র অর্থ বলা হইল না, ইহাও সত্য হইবে। কিন্তু এক্ষণে কথা এই যে, ঐ মূল যুক্তিটী সত্য কি? প্রকৃষ্ট পদার্থ কি তাহা জানিতে হইলে যে, 'প্র' ও 'কৃষ্ট' এই দুই শব্দের অর্থ জানিতেই হইবে, এ কথাই আমাদের মতে সমীচীন নহে। অনেকে 'প্রকৃষ্ট' পদের প্রকৃতি প্রত্যয় কিছুই জানেননা অথচ প্রকৃষ্ট পদের অর্থ কি তাহা জানেন। 'আহার' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি, তাহা অনেকেই জানেন না, কিন্তু আহার পদার্থ কি তাহা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। মূল কথা এই যে, কোন শব্দের অর্থ জানিতে হইলে যে, উহার প্রকৃতি প্রত্যয় ও ঐ সকল প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ জানিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা অসার কথা আর কিছুই নাই। 'গো' শব্দে কি বুঝায় সকলেই তাহা জানেন, কিন্তু উহা যে গম্ ধাতুর উত্তর ডো প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন তাহা কয়জন জানেন? আর যাঁহারাও জানেন তাঁহাদেরও ঐ জ্ঞাননিবন্ধন অর্থ বুঝিতে সাহায্য না হইয়া বরং বিলম্বই হয়; কারণ তাঁহাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, 'গো' শব্দে যদি গমনকারী জীব বুঝায় তবে মনুষ্যই বা 'গো' না হইবে কেন? এই জন্যই প্রাচীন শাব্দিকেরা বলিয়াছেন, 'অন্যচ্চ প্রবৃত্তিনিমিত্তং শব্দানাং অন্যচ্চ ব্যুৎপত্তিনিমিত্তং' অর্থাৎ শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বা শক্যতাবচ্ছেদক ও ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত এক নহে; অর্থাৎ শব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার সর্ব্বত্র উহার ব্যুৎপত্তির অনুযায় নহে। যাস্কের নিরুক্তে এ বিষয়ের একটী বিস্তৃত বিচার আছে, তাহা পরে উল্লেখ করা যাইবে। ফল কথা এই, যদি প্র ও প্রকৃষ্ট, বি ও বিশেষ, সম্ ও সম্যক্ এই ছয়টী শব্দের প্রত্যেক দুইটীর অর্থজ্ঞান পরস্পরের অর্থজ্ঞানসাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রণালীকে দোষ দিতে পারা যাইত; কিন্তু যখন তাহাদের অর্থজ্ঞান পরস্পরের অর্থজ্ঞানের সাপেক্ষ নহে, তখন তাঁহাদের প্রণালীকে দোষ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। তিনি নিজে যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই, এ বিষয় আরও বিশদ বুঝা যাইবে। 'প্র' কি না 'প্রকৃষ্টরূপে' এইরূপ ব্যাখ্যায় দোষ দিবার সময় তিনি ইহার অনুরূপ বিবেচনা করিয়া, একটী উদাহরণ দিয়াছেন, সেই উদাহরণটী এই,—'ঘোড়া কি?' না 'ঘোড়ার গাড়ি'। 'ঘোড়ার গাড়ি' কি? না 'ঘোড়া পূর্ব্বক গাড়ি' ইত্যাদি। এখানে দেখুন, ঘোড়ার গাড়ি দুইটী শব্দ, ঐ দুইটী শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তুর জ্ঞান করিতে হইলে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে 'ঘোড়া', 'গাড়ি'ও ষষ্ঠী

না। যেমন,—হত, নিহত। এ স্থলে হন্ ধাতুর যাহা অর্থ, 'নি' উপসর্গবিশিষ্ট হন্ ধাতুরও তাহাই। বাধ করে, অর্থাৎ ধাতুর যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহার ব্যত্যয় করে, যেমন,—দান, আদান। বিশেষাধান করে, অর্থাৎ ধাত্বর্থকে কোনরূপ বিশেষণে বিশেষিত করে। যথা কোপ, প্রকোপ ইত্যাদি। কোপ শব্দ কুপ্ ধাতু নিষ্পন্ন, উহার অর্থ ক্রোধ আর প্রপূর্ব্বক কুপ্ ধাতু নিষ্পন্ন প্রকোপ শব্দের অর্থ অত্যন্ত কোপ, অর্থাৎ বিশেষরূপ কোপ। তাঁহাদের মতে 'প্র' এই উপসর্গটীর অনেকগুলি অর্থ আছে, যেমন গতির আরম্ভ, উৎকর্ষ, সর্ব্বতোভাব ইত্যাদি। 'নি' এই উপসর্গের অর্থ নিশ্চয়, আধিক্য, নিষেধ ইত্যাদি। এক্ষণে প্রবন্ধলেখক মহাশয় কি বলিয়াছেন তাহার বিচার করা যাউক। তাঁহার মতে 'প্র' উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে ও 'নি' উপসর্গের লক্ষ্য ভিতরের দিকে, ইংরাজিতে বলিতে গেলে 'প্র'র অর্থ 'Forth' এবং 'নি'র অর্থ 'In'। 'লক্ষ্য সম্মুখের দিকে ও লক্ষ্য ভিতরের দিকে' বলিলে যে উপরি উক্ত উপসর্গদ্বয়ের অর্থ একরূপ বলা হয় না এ কথা বোধ হয় প্রবন্ধকারস্বয়ংই উপলব্ধি করিয়াছেন। এই নিমিত্ত অনেক বিচার আচারের পর 'প্র'*র অর্থ, সম্মুখ-প্রবণতা ও 'নি'র অর্থ অন্তর্নিষ্ঠতা স্থির করিয়াছেন (পত্রিকার ৪র্থ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ২৪৬—২৪৭ পৃষ্ঠা)। আমরাও ঐ দুইটী অর্থই গ্রহণ করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'সম্মুখ-প্রবণতা' এই কথাটীর অর্থ কি? 'প্রবণতা' শব্দের [illegible] অর্থ আছে, এ স্থলে সেই অর্থগুলির মধ্যে কোন্‌টী গ্রাহ্য? যখন প্রবন্ধকার [illegible] কোন্ অর্থ লইতে হইবে তাহা বলিয়া দেন নাই, তখন যে অর্থটী সচরাচর গৃহীত হয় তাহাই বোধ হয় গ্রহণীয়। 'সম্মুখ' শব্দে দিগ্বিশেষের বোধ হয়, সুতরাং 'প্রবণতা' [illegible] 'দৈশিকপ্রবণতা' অর্থাৎ সম্মুখপ্রবণতা শব্দে দিগ্বিশেষের প্রতি প্রবণতা [illegible] বুঝায়। 'প্রবণতা' শব্দে সাধারণতঃ 'স্বাভাবিক গতি বা অনুকূলতা' বুঝায়, যেমন—জল নিম্নপ্রবণ বলিলে নিম্নের দিকে গতি জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা গুণ এইরূপ বুঝায়। কাচ ভঙ্গ-প্রবণ বলিলে কাচ স্বভাবতঃ ভঙ্গের অনুকূল অর্থাৎ কাচে এমন একটী বিশেষ গুণ আছে, যাহাতে উহা সামান্য কারণেই ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ অর্থ বুঝায়। প্রবন্ধকার যখন দৈশিক প্রবণতা অর্থ করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্বাভাবিক অনুকূলতারূপ প্রবণতার দ্বিতীয় অর্থ তাঁহার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, উপরি উক্ত অর্থ দুইটী প্রবন্ধকার মহাশয়ের প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে কিরূপ সঙ্গত হয়। তাঁহার মতে নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি তাঁহার প্রদত্ত অর্থের পোষক। যথা—

প্রশ্বাস	নিশ্বাস
প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি
প্রবাস	নিবাস
প্রবেশ	নিবেশ

* 'সম্মুখ-প্রবণতা' এই পদটী 'প্র' উপসর্গঘটিত, সুতরাং ঐ পদ দ্বারা 'প্র' উপসর্গের পরিচয় দিয়া প্রবন্ধকার শিক্ষকমহাশয়দিগের দলে পড়িলেন না কি? সমালোচনাপ্রবন্ধপাঠের দিবস মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধকারের এই স্বোক্তিবিরোধ প্রদর্শন করেন।

বিভক্তির চিহ্ন 'র' ইহাদের অর্থের জ্ঞান করিতে হইবে, নতুবা অর্থজ্ঞানের উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এ স্থলে 'ঘোড়া' শব্দের প্রতিশব্দে 'ঘোড়ার গাড়ি বলিলে 'ঘোড়া' শব্দের ত পরিচয় দেওয়া হইলই না, অধকন্তু আর দুইটী অতিরিক্ত শব্দ বলা হইল। ঐ দুইটী অতিরিক্ত শব্দের জ্ঞান থাকিলেও 'ঘোড়া' শব্দের জ্ঞান হইবে না। 'প্র'র অর্থ 'প্রকৃষ্ট' এ স্থলে কিন্তু 'প্রকৃষ্ট' একটী পদ, ঐ পদের অর্থজ্ঞান, যে দুইটী শব্দ লইয়া ঐ পদটী গঠিত, তাহাদের অর্থের জ্ঞানের সাপেক্ষ নহে ; সুতরাং এ স্থলে পৃথক্‌ভাবে 'প্র' ও 'কৃষ্ট' শব্দের জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই ; অতএব ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান না হইয়াও অবয়বী 'প্রকৃষ্টের' জ্ঞান হইতে পারে। অতএব দেখা গেল যে, প্র=প্রকৃষ্ট ও ঘোড়া=ঘোড়ার গাড়ি এ দুই কথা এক নহে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটী কথা বলিব, 'প্র'র অর্থ প্রকৃষ্টরূপে এইরূপ সোপসর্গ পদ দ্বারা উপসর্গের অর্থ করিবার প্রণালী অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। এই প্রণালী ভগবান্ ভাষ্যকার পতঞ্জলি ও দার্শনিকপ্রবর ভট্টকুমারিল প্রভৃতি কুশাগ্রবুদ্ধি মহাত্মগণ অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবান্ ভাষ্যকার "সমর্থঃ পদবিধিঃ" (পা, সূ ২।১।১) এই পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যায় 'সমর্থ' পদের অন্তর্গত সম্ উপসর্গের অর্থ কি তাহার নির্ণয় স্থলে সঙ্গতার্থং সমর্থং, সংসৃষ্টার্থং সমর্থং, সংপ্রৈক্ষ্যার্থং সমর্থং, সম্বন্ধার্থং সমর্থং এইরূপ সমর্থশব্দের যতগুলি প্রতিশব্দ দিয়াছেন সকলগুলিই সম্ উপসর্গঘটিত। ভট্টকুমারিল তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকের ৪র্থ সূত্রের ৩য় শ্লোকে বলিয়াছেন, "সম্যগর্থে চ সম্‌শব্দো দুষ্প্রয়োগনিবারণঃ" অর্থাৎ "সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম" এই প্রত্যক্ষ লক্ষণে 'সম্প্রয়োগ' শব্দের অন্তর্গত 'সম্' শব্দের অর্থ 'সম্যক্', সুতরাং 'সম্প্রয়োগ' শব্দের অর্থ 'সম্যক্ প্রয়োগ' ও ঐ শব্দটী ইন্দ্রিয়গণের দুষ্প্রয়োগ নিবারণের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ বলিয়াছেন। যদি ঐরূপ পরিচয় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দুষ্ট হইত তাহা হইলে তাঁহাদিগের ন্যায় মনীষিগণ উহার আদর করিতেন কি ?

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রবন্ধকারের প্রণালী বস্তুতঃই বৈজ্ঞানিক প্রণালী কি না এবং ঐ প্রণালীতে উপসর্গের অর্থ নিষ্কাশনে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সমালোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উপসর্গসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। 'উপসর্গ' এই শব্দটী উপপূর্ব্বক সৃজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। উহার ব্যুৎপত্তি হইতে নিম্নলিখিত অর্থ পাওয়া যায় ঃ— যাহারা ধাতুকে অবলম্বন করিয়া ঐ ধাতুরই নানাবিধ অর্থের সৃষ্টি করে, তাহারা উপসর্গ ঃ— "আখ্যাতমুপগৃহ্যার্থবিশেষমিমে তস্যৈব সৃজন্তীত্যুপসর্গ" ঃ—দুর্গাচার্য্য। আমাদের দেশীয় প্রাচীনতম শব্দাচার্য্যদিগের মতে উপসর্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একই উপসর্গের ধাতুভেদে, প্রয়োগভেদে, নানা অর্থ লক্ষিত হয়। ঐ সকল প্রয়োগের অর্থ অনুগত (Generalise) করিয়া, তাঁহারা এক একটী উপসর্গের কতকগুলি করিয়া অর্থ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু প্রবন্ধকারের ন্যায় এক একটী উপসর্গের সর্ব্বস্থলেই একরূপ অর্থ হইবে, ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে উপসর্গগণ সাধারণতঃ ধাতুর অর্থের অনুবর্ত্তন, বাধ ও বিশেষ করিয়া থাকে। অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ উপসর্গযোগনিবন্ধন ধাত্বর্থের কোন বিশেষ লক্ষিত হয়

প্রক্ষেপ নিক্ষেপ
প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট ইত্যাদি।

তাঁহার মতে 'প্রশ্বাস' শব্দের অর্থ "Breathing forth" ও 'নিশ্বাসের' অর্থ 'Inhaling', 'অর্থাৎ প্রশ্বাসের অর্থ ভিতরের বায়ু বাহিরে ফেলা ও নিশ্বাসের অর্থ বাহিরের বায়ু গ্রহণ করা। 'প্র' ও 'নি'র মধ্যে অর্থগত বিরোধ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই দুই দুইটী শব্দ গৃহীত হইয়াছে। প্রথম শব্দ দুইটী গ্রহণ করা যাউক ঃ—প্রশ্বাস ও নিশ্বাস।—'প্রশ্বাস' শব্দের অর্থ 'শ্বাসত্যাগ' বটে কিন্তু 'নিশ্বাস' শব্দের অর্থ 'শ্বাস গ্রহণ' নহে। উহাও প্রশ্বাসের সমার্থক অর্থাৎ উহারও অর্থ ভিতরের বায়ু বাহিরে ফেলা। এবিষয়ে প্রমাণ ঃ—বাচস্পত্যে ৪১১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সুবিখ্যাত কোষকার হেমচন্দ্রের মতে 'নিশ্বাস' শব্দে প্রাণবায়ুর বহির্গমন রূপ ব্যাপার বুঝায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এই অর্থেই 'নিশ্বাস' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—কুমারসম্ভব ৩য় সর্গ—'ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ' অর্থাৎ যেন দুঃখের নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মেঘদূত—'নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা' অর্থাৎ অধরকিশলয়ের ক্লেশদায়ী নিশ্বাস। দুঃখ ও শোকজ নিশ্বাস উষ্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই জন্যই উহা অধরকিশলয়ের ক্লেশদায়ী। এস্থলে নিশ্বাস শব্দে বাহ্য বা[illegible]ইলে 'অধরকিশলয়ের ক্লেশী' এই বিশেষণটী সংলগ্ন হয় না। মাধবনি[illegible]—২য় শ্লোক ;—'লৌহগন্ধিশ্চ নিশ্বাসো ভবত্য[illegible]মে নিশ্বাস লৌহগন্ধি হয় বা [illegible]শব্দে বাহ্য বায়ুর গ্রহণ হইতে [illegible]' এইরূপ বিসর্গমধ্যও লিখিত [illegible]র ত্যাগ ও বাহ্যবায়ুর গ্রহণ [illegible]য়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible]। শ্বাসের অর্থ বাহ্যবায়ু [illegible]শ্বাসপ্রশ্বাসের

কারণ একই বস্তু একই কালে সম্মুখপ্রবণ ও অন্তর্নিষ্ঠ উভয়ই হইতে পারে
কুম্ভক প্রক্রিয়াস্থলে একই শ্বাস অন্তর্নিষ্ঠও বটে এবং সম্মুখপ্রবণও বটে। তবে যদি
'প্র'র অর্থ বহির্নিষ্ঠতা ও'নি'র অর্থ অন্তর্নিষ্ঠতা বলিতেন, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ বিরোধ থাকিতে পারিত, সে বিরোধও দর্শনশাস্ত্রানুমোদিত বিরোধ নহে। দার্শনিকেরা যাহাকে বিরোধ বলেন, তাহাতে ভাব ও অভাব এই দুইটী কোটি থাকে, যেমনঅন্তর্নিষ্ঠতা, অনন্তর্নিষ্ঠতা, সম্মুখপ্রবণতা, অসম্মুখপ্রবণতা। এরূপ স্থলেই দার্শনিকেরা বিরোধ স্বীকার করেন।

'প্রশ্বাস' শব্দের এক্ষণে পরীক্ষা আবশ্যক। উহার অর্থ 'শ্বাসত্যাগ' বা 'ত্যক্ত শ্বাস' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ঐ অর্থের মধ্যে 'সম্মুখ প্রবণতা' রূপ 'প্র'র অর্থ আছে কিনা তাহাই অনুসন্ধেয়। প্রবন্ধকারের অর্থের অনুসরণ করিলে 'প্রশ্বাস' শব্দে 'সম্মুখপ্রবণতাবিশিষ্ট শ্বাস' অর্থাৎ 'সম্মুখপ্রবণ-শ্বাস' বুঝাইবে। সম্মুখপ্রবণ-শ্বাসের অর্থ বোধ হয় এইরূপ, যে শ্বাসের গতি স্বভাবতঃ সম্মুখের দিকে অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ সম্মুখের দিক্ দিয়া প্রবাহিত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এ কোন্ শ্বাস? যে শ্বাস আমরা শ্বাসযন্ত্র হইতে বাহিরে ত্যাগ করি? না যে শ্বাস আমরা নাসারন্ধ্রাদি দ্বারা শ্বাসযন্ত্রে গ্রহণ করি? কারণ আমরা ত দেখিতেছি যে, উভয়বিধ শ্বাসেরই স্বাভাবিক গ[illegible] সম্মুখের দিকে; কারণ সম্মুখেতর কোন দিক্ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণাদির [illegible] যায় নাই। এস্থলে হয়ত প্রবন্ধকার বলিবেন, আমি ত বলিয়াছি 'প্র[illegible] breathing forth, তাহাতে ব্যক্তব্য এই যে [illegible] দ্বারা শব্দান্তরের অর্থের পরিচয় [illegible] স্থলে 'প্র' অর্থ 'Forth' বলিলে [illegible] প্রভৃতি শত শত স্থলে অসঙ্গতি [illegible] করিয়া 'প্র'র অর্থ সম্মুখ-প্র[illegible] তাহাই বিচার্য্য।

নিযুক্ত থাকিত, তাঁহারা স্ব স্ব প্রভু-বৃন্দের বা অভিভাবক-গণের অনুপস্থিতিতে সমাচার-সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। ইহা প্রথমে কর্ত্তব্যের মধ্যেই বিবেচিত হইত। উহা, পরে যখন ব্যবসায়ে পরিণত হইল, তখনই উহার লিপি-কর্ম্মের জন্য লোকেরা, সময়ে সময়ে চাঁদা আদায় করিতেন। যাঁহার গ্রাহক-সংখ্যা যেরূপ হইত, তাঁহাকে ততগুলি পত্র লিখিতে হইত। এক পত্র লিখিয়া তিনি ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেন না। এই শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা উদ্যম-শীল, তাঁহাদিগের কেহ কেহ সংবাদ-ভবন (Intelligence-office) স্থাপিত করিতেন।

প্রাচীন সংবাদপত্রের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পাঠ করিলে, কৌতূহল চরিতার্থ হইবে।

গ্রেট্-বৃটেনের বার্ত্তাবহের তালিকা।

(ক) সারজন্ ফেনের পাষ্টন্ লেটার্স।

(খ) আর্থার কলিনের সংগৃহীত লেটার্স এণ্ড মেমোরিয়েল্ অব্ ষ্টেট্। (সিড্‌নি পেপার্স)

(গ) নলেজের ষ্টাফোর্ড-লেটার্স এণ্ড ডেস্‌পাচেস্।

(ঘ) ডায়েরি অব্ [illegible]ক্সিস্ লট্রেল্। ইত্যাদি।

সমাচার-পত্রিকায় প্রথমে রাজ্যের অপকীর্ত্তি ঘোষিত হইত।

প্রথম মুদ্রিত সংবাদ-পত্র।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্য-কালে বার্ত্তাবহ, প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। স্পেন কর্ত্তৃক ইংলণ্ড-আক্রমণে উহার সূত্রপাত। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ২৩এ জুলায়ের সংবাদ-সংবলিত মুদ্রিত বার্ত্তা-পত্রিকা, অদ্যাবধি বৃটনের কৌতুকাগারে [বৃটিশ মিউজিয়মে (British Museum)] দৃষ্ট হয়।

এইখানে "এসিয়া" মহাদেশের কথা, পুনশ্চ সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হইতেছে।

১। সুলতান আজিম ওয়াসানের সময় ভারতে সংবাদপত্র ছিল।

২। ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদ-পত্র—"ইণ্ডিয়া-গেজেট"। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহা মুদ্রিত হইত। তৎপরেই "হিকিজ্ গেজেট"। ১৭৮০।৩১এ জানুয়ারিতে উহার প্রবর্ত্তনা। উহার কিঞ্চিৎ পর—অর্থাৎ—

৩। ১৭৮৪। ৪ঠা মার্চ্চে "কলিকা[illegible] গেজেট" প্রকটিত হইতে থাকে।

ঐ তিন-খানিই, ইংরাজি-ভাষায় চালিত হইত। অতঃপর বাঙ্গালা-সমাচার-পত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ আবশ্যক।

১ম। বেঙ্গল্ গেজেট।

(১২২৩ সাল হইতে ১২২৫ সাল,—১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ [illegible]

এত-ক্ষণের পর আমরা, বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রিকার আমলে আসিয়া [illegible]

ভিনিসের সংবাদ-পত্র, ধনবান্‌দিগের পরিচালিত পদার্থ। প্রজাতন্ত্র-রাজত্বের শাসনাধীন বর্ত্তমান যুগের রাজনীতি-বিশারদ-গণের কর্ম্ম-ক্ষেত্র ইটালিতে ভিনিসীয় ধরণে সর্ব্ব-প্রথমে উহা প্রকাশিত হয়। সংবাদ-পত্র, তখন রাজ্যের মুখ-পত্র-স্বরূপে প্রতি-মাসে প্রচারিত হইত। ভিনিসীয় নামের অনুকরণে ও ঠিক্ তাহার ধরণে অপরাপর পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশেও, ইহার পর সংবাদ-পত্র-প্রচারের সূত্রপাত হইয়াছিল।

ভিনিসীয় সংবাদ-পত্রের কলেবরের কথা এখন কহিব। জর্জ্জ চামার্‌স্, ভিনিসীয় এই রাজকীয় সংবাদ-পত্র-সকলের সমালোচনা-সম্বন্ধে স্ব-সঙ্কলিত "রুডিম্যান্-জীবনীতে" বিস্তারিত লিখিয়াছেন।

সংবাদ-পত্র বলিলে, সচরাচর আমরা যে অর্থ বুঝি, আইনে তদপেক্ষা কিছু অধিক বুঝায়। স্বল্প-সময়-ব্যাপক কালে যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় এবং কিছু অধিক মাত্রায় রাজনীতি-সম্বন্ধে সমাচার, যাহার অবয়বীভূত থাকে, আইনানুসারে তদ্বিধ-পত্রকেই সচরাচর সমাচার-পত্র কহে। সাধারণতঃ, কিন্তু বলিতে গেলে, উহার লক্ষণ, সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। রাজ-নিয়মানুসারে ইহার সংজ্ঞা, দ্বিবিধ। যথা,—

(ক) যে সমস্ত প্রকাশ্য-সমাচার, ঘটনা বা সাধারণ বৃত্তান্ত, বৃটন্ রাজ্যের সীমা-মধ্যে পত্রে নিবদ্ধ করিয়া মুদ্রিত হয়, সেই সমস্ত প্রকাশ্য-সমাচার, ঘটনা বা বৃত্তান্ত, যে পত্রিকার উপকরণ ও সমষ্টি, সেই পত্রিকা, "সংবাদ-পত্র" নামে অভিহিত।

(খ) যে পত্র, ২৬ (ছাব্বিশ) দিবস মধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে, আর বিজ্ঞাপনই যাহার প্রধান অবলম্বন, তাহাকেও 'সংবাদ-পত্র' বলা যায়। (১)

বর্ত্তমান কালের বৃহদাকার পত্রিকা-সকলের সহিত, পূর্ব্বতন পত্রিকার অবস্থা, একবার তুলনা করা যাউক। আদালতের সংবাদ-দাতা অপেক্ষা প্রথমকার সংবাদ-ব্যাপার, কিছু ভাল। স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে অতি সামান্য সামান্য সংবাদ-সকল, অসম্বদ্ধ-ভাবে নিবদ্ধ হইত। কোন বিষয়ের প্রয়োজনানুরূপ মতামত থাকিত না। তাহা হইতে স্পষ্ট কোন ভাবার্থের উপলব্ধি করে, সাধ্য কার? রচনার ও সমাচারের অভাবে অলীক অমূলক বিষয়-সকল, পত্রিকায় বিবৃত হইত। এক দিনের এই ঘটনা। পর দিবস হয় তো সেই মিথ্যাব্যাপার, রহিত করিতে হইত।

বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপে রাজত্ব-রক্ষার্থে বা তাহার শাসন-পক্ষে রাজ-ক্ষমতা, পার্লেমেণ্ট ও সৈন্য-দল—এই শক্তি-ত্রয়ের ন্যায়, সংবাদ-পত্র, রাজনীতি-বিশারদদিগের নিকট চতুর্থ শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়।

গ্রেট্-বৃটেনের সংবাদ-পত্র।

যাঁহারা, প্রথমে সংবাদ-পত্র-পরিচালনে ব্রতী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ-সংক্রান্ত লেখক নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বিত্তবান্ ও বিদ্যাবান্‌দিগের অধীনে যে সমস্ত কর্ম্মচারী,

---

(১) ইনটি, কেরুল সংবাদ-পত্রের মাশুল-নির্দ্দেশ-কালে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা।

(কাল-ক্রমানুসারী ইতিবৃত্ত)।

নিতান্ত নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন দুর্গম গিরি-গহ্বর, যেমন ভীষণ,—প্রাচীন সমাচার-পত্রিকার ইতিহাসও, তদ্রূপ দুষ্প্রবেশ্য। সংবাদ-পত্রের ইতিবৃত্ত—কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়—আমাদের সমাদরের সামগ্রী। অশেষ আয়াস স্বীকার করিলে—প্রকৃষ্ট প্রয়াস পাইলে—অসাধ্য-সাধনেও, কৃতকার্য্যতা ঘটে। বিশেষ উদ্যমে সবই সুসিদ্ধ হইয়া উঠে। রীতিমত চেষ্টায় কি না সম্ভবে? ঐ মহাবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া, য়ুরোপীয়গণ, ইতিবৃত্ত-উদ্ধারে সফল-প্রযত্ন হইয়াছেন। আমরাও, প্রয়াস পাইলে, কেনই না সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিব?

এতদ্দেশে যে সমুদায় বঙ্গীয় বার্ত্তাবহের প্রচার হয়, তাহার আদর্শ য়ুরোপে। কিন্তু প্রত্ন-তত্ত্ব-বিদ্-গণ, একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, "এসিয়া"-মহাদেশেই উহার প্রথম প্রকাশ। সমগ্র "এসিয়ায়" কিন্তু উহার প্রভাব, প্রচারিত হইতে পায় নাই। "চীন"-দেশই, সংবাদ-পত্রের জন্মভূমি। ইটালি ও গ্রেট্‌বৃটন্ উহার পরিপুষ্টি-ক্ষেত্র। যখন মুদ্রাযন্ত্রের গন্ধ-বাষ্পও কেহ পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই, তখনও ইটালির অন্তর্গত ভিনিস-নগরী হইতে অ-মুদ্রিত সমাচার-পত্র প্রকটিত হইত।

অতি প্রাচীন কালে য়ুরোপে মুদ্রাযন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। অতএব সেই পুরাকালে মুদ্রিত সংবাদ-পত্রিকার সত্তা অনুসন্ধান করিয়া; কি ফলোদয় হইবে?

বলিয়াছি—সংবাদ-পত্রের প্রথম প্রচার, ইটালি হইতেই হইয়াছিল। এতদর্থে সভ্যসমাজ, ইটালির নিকট কৃতজ্ঞ। সংবাদ-পত্রের উৎপত্তি-বিষয়ে ত্রিবিধ মত প্রচলিত। যথা,—

১। সাধারণতঃ বার্ত্তাবহ-সমূহের মূল—"গেজেটা"। "গেজেটার" মূল—"গেজেরা" (Gazara)—অর্থ ম্যাগপাই। উহা বিহঙ্গম-বিশেষ। বুঝি তাহা সকলেরই জ্ঞাত। "ম্যাগ্‌পাই" শব্দের অর্থ গল্পকারক।

২। লাটিন "গজা" (Gaza) হইতে "গেজেট" উৎপন্ন। "গজা" অর্থে সমাচারের ক্ষুদ্রাকার ভাণ্ডার। স্পেনীয় বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি-নিচয়ের মতে ঐ মতই, সাধু বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩। ভিনিস নগরীতে প্রচলিত সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মুদ্রাই, সাধারণতঃ প্রতি খণ্ড সংবাদ-পত্রের মূল্য-রূপে নির্দ্ধারিত ছিল বলিয়া, কেহ কেহ, উক্ত অর্থজ্ঞাপক শব্দ হইতে সংবাদ-পত্রের নাম-করণ হইয়াছে, এমন অনুমান করেন। অনেকের বিবেচনায় ইহাই সমধিক সঙ্গত।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, লাটিন "গজা" শব্দ হইতে গেজেটের ব্যুৎপত্তি লব্ধ হয়। "গজা" অর্থেসমাচারের অপ্রায়তন ভাণ্ডার। কোন কোন ভাষা-তত্ত্ব-বিদের মতে সংবাদ-পত্রের ঐ আখ্যা, সঙ্গত ও সমীচীন।

শব্দতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অনেক জটিল কথার অবতারণা করিতে হয়, সময়াভাবে অন্ত সেরূপ অবতারণা করা অসম্ভব। যাস্কের নিরুক্তে এই বিষয়ে এক বিস্তৃত বিচার আছে, উহা এতদূর সমীচীন যে, পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলর সাহেব উহার একটী ইংরাজি অনুবাদ করিয়া স্বকৃত History of Ancient Sanscrit Literature অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস নামক গ্রন্থে নিবেশ করিয়াছেন।

প্রথম প্রবন্ধের কয়েকটী কথামাত্র সমালোচিত হইল, অবশিষ্ট সমস্তই অনালোচিত রহিল; দ্বিতীয় প্রবন্ধে ত হস্তক্ষেপই হইল না। কিন্তু ঐ প্রবন্ধের একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঐ প্রবন্ধের ১২৩ পৃষ্ঠায় 'পরামর্শ' শব্দের অন্তর্গত 'পরা' উপসর্গের ব্যাখ্যায় প্রবন্ধকার ভাষাপরিচ্ছেদ নামক ন্যায়গ্রন্থ হইতে একটী শ্লোকার্দ্ধ বিকৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাহার এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ ও তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ :—"নৈয়ায়িক ভাষায় পরামর্শ শব্দের অর্থ ব্যাপ্যস্য পক্ষত্বধর্ম্মধীঃ অর্থাৎ ব্যাপ্য বিষয়ের পক্ষত্বধর্ম্ম অবধারণ। পক্ষত্ব কি না Partyত্ব এখানে পৌরুষেয় ভাব (Personality) বাদ দিয়া Party শব্দের অর্থগ্রহণ করা হউক", ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসল শ্লোকার্দ্ধ কি ও তাহার অর্থই বা কি, তাহার এ স্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রবন্ধকারের ন্যায় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি কিরূপে ঐরূপ বিকৃতভাবে শ্লোকার্দ্ধটী উদ্ধৃত করিলেন ও উহার অর্থাদি একেবারেই পর্য্যালোচনা না করিয়া স্বকৃত অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিলেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এইরূপ গৌতমসূত্র হইতেও স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন ও উদ্ধৃতাংশের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। সময়ান্তরে ও প্রবন্ধান্তরে তৎসমস্ত আলোচ্য। প্রবন্ধকার উপসর্গের অর্থনিষ্কাসন বিষয়ে যত্ন, পরিশ্রম ও গবেষণার ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু আমাদের দেশীয় প্রাচীন শব্দাচার্য্যদিগের প্রতি অনাস্থাবশতঃ শব্দতত্ত্বের মূল পান নাই ও আলোচ্য বিষয়ের গুরুতা হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই উপসর্গের অর্থানুগম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সুতরাং এরূপ স্থলে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। সমালোচকের কর্ত্তব্য বড়ই দুরূহ ও অপ্রীতিকর; কেবল অনুরুদ্ধ হইয়াই এই অপ্রীতিকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সম্মানার্হ প্রবন্ধকারের নিকট অবিনয় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

সন্দেহ নাই। এক্ষণে দুই একটী ক্ষিপ্ ধাতুর প্রয়োগ গ্রহণ করা যাউক "চোর রাজপুরুষদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল"। এস্থলে নিক্ষেপ হইল, কারণ লোকের চক্ষুতে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্যই ধূলির জন্ম ও ধূলির সহিত চক্ষুর আন্তরিক সম্বন্ধ আছে! 'রাত্রিতে শর্করাপ্রক্ষেপ করিয়া দধি ভোজন করা উচিত' এস্থলে প্রক্ষেপ হইল, কারণ শর্করা ত দধিতে প্রক্ষিপ্ত হইবার হয় জন্য উৎপন্ন হয় নাই ও শর্করার সহিত দধির ত কোন আন্তরিক সম্বন্ধ নাই! "তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার অনাথ পুত্রকে দূরস্থ আত্মীয়ের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন" এ স্থলে নিক্ষেপ হইল, কারণ দূরস্থ আত্মীয়ের হস্তে সমর্পিত হইবার জন্যই তাঁহার পুত্রের জন্ম ও সেই আত্মীয়ের হস্তের সহিত তাঁহার পুত্রের আন্তরিক সম্বন্ধ আছে। 'দুগ্ধে দধি প্রক্ষেপ করিয়া ছানা প্রস্তুত করে', এস্থলে প্রক্ষেপ হইল কারণ দধি ত আর দুগ্ধে প্রক্ষিপ্ত হইবার জন্য উৎপন্ন হয় নাই এবং দুগ্ধের সহিত দধির ত কোন আন্তরিক সম্বন্ধ নাই। এক্ষণে শ্রোতৃমহোদয়গণ দেখিলেন, প্রবন্ধকারের অর্থগত ভেদ অনুসরণ করিলে কিরূপ ব্যসনপরম্পরায় পতিত হইতে হয়। তাঁহার নিজের উদাহরণ লইয়াই দেখুন; গোলা নিক্ষেপ হইল, কারণ দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্যই গোলার জন্ম, বেশ্ কথা, কিন্তু তাহা হইলে শ্লোক নিক্ষিপ্ত কেননা হইবে? কারণ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি কেবল পরের পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইবার জন্যই রচিত হয় নাই কি? কে বলিল প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সহিত পুঁথির কোনপ্রকার আন্তরিক সম্বন্ধ নাই—আমরা ত দেখিতে পাই ঐ সম্বন্ধ স্থল বিশেষে এতদূর 'আন্তরিক' যে কোন্‌টী প্রক্ষিপ্ত কোন্‌টী মৌলিক তাহা অনেক সময় নির্ণয় করাই দুরূহ হইয়া উঠে। আর প্রবন্ধকার দার্শনিক হইয়া কি করিয়া ঐরূপ স্থলে 'আন্তরিক সম্বন্ধ' শব্দ প্রয়োগ করিলেন? আন্তরিক সম্বন্ধের অর্থ কি? অর্থবিশ্লেষণের চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে ঐরূপ সম্বন্ধ বিশেষের নির্বচন অসম্ভব। এই ত গেল ভেদের বিচার। এক্ষণে হয়ত প্রবন্ধকার বলিবেন 'নিক্ষেপ', এইস্থলে 'নি'র অর্থ যে in তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। তাহাতে বক্তব্য এই যে ঐ অর্থ ক্ষিপ্ ধাতু হইতে আসিতেছে ও আসিতে পারে। উহার জন্য 'নি'র অর্থ স্বীকারের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। দুর্গে গোলা নিক্ষিপ্ত হইল বলিলেও যাহা বুঝায়, ক্ষিপ্ত বলিলেও তাহাই বুঝায়, আর প্রক্ষিপ্ত শ্লোক এই স্থলে কেন নিক্ষিপ্ত হইল না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল তাদৃশ ব্যবহারের অভাব, অর্থাৎ শ্লোকের সম্বন্ধে 'নিক্ষিপ্ত' শব্দ প্রয়োগের কোনরূপ বাধা বা অসামঞ্জস্য আছে বলিয়াই যে ঐরূপ প্রয়োগ হয় না, তাহা নহে, কেবল অনেকে ঐরূপ স্থলে 'প্রক্ষেপ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের মধ্যে ঐরূপ স্থলে প্রক্ষেপ শব্দ ব্যবহারের একটী রীতি হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে যদি কেহ ঐরূপ স্থলে 'নিক্ষেপ' শব্দের ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে চিরাগত রীতি ভঙ্গের দোষে দুষ্ট হইতে হইবে। এই নিমিত্তই শ্লোকের সম্বন্ধে 'প্রক্ষেপ' শব্দই প্রয়োগ হয়। সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে ঐরূপ শব্দ ব্যবহার idiom হইয়া গিয়াছে। প্রবন্ধকার এক যাত্রায় পৃথক্ ফলের কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ এককার্য্য করিয়াও সময়ে সময়ে ব্যক্তি বিশেষ বা পদার্থ বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন নাম বা আখ্যা হয়, তাহার উপপত্তি অন্যরূপ। ঐ উপপত্তি প্রদর্শন করিতে হইলে

লইয়াই মনুষ্যত্ব' বা 'প্রজ্ঞাই মনুষ্যত্ব'—সুতরাং সে স্থলে প্রজ্ঞা মনুষ্যত্বের নিদান বলিলে 'নিদান' শব্দটীর যথার্থ ব্যবহার করা হয় না। মনে করুন আমি বলিলাম 'The Vow of একাদশী Consists in abstaining from food on a certain day.' অর্থাৎ দিন বিশেষে উপবাস করাই একাদশীব্রত। এস্থলে কিন্তু প্রবন্ধকারের মতে 'দিন বিশেষে উপবাস করাই একাদশীর নিদান'! এইরূপ বলিতে হইবে। মনে করুন আমি বলিলাম অতিরিক্ত জলপান করা অজীর্ণ রোগের নিদান বা হেতু। এস্থলে প্রবন্ধকার বলিবেন 'Dyspepsia consists in drinking a large quantity of water.'! নিদান শব্দের অর্থ কি তাহা একবার অভিধানে দেখিলেই বোধ হয় ঐরূপ প্রয়োগের অসমীচীনতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। আর পূর্ব্বোক্ত অর্থগ্রাহক সঙ্কেত স্থাপন করিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটী স্থলে ঐরূপ consists in বলিলে কিরূপ শুনায়, তাহা পর্য্যালোচনা করা উচিত ছিল। অতএব প্রমাণ হইল যে, প্রবন্ধকারের দ্বিতীয় উদাহরণদ্বয়ের একটীও তাঁহার মতের পোষক নহে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রবন্ধকার বুঝিতে পারিতেন যে প্রখ্যাত, প্রক্ষালিত, প্রধ্বংস, প্রবিরল, প্রতনু, প্রকোপ, প্রমেহ, প্রেত, প্রশংসা, প্রবাদ, প্রচার প্রকম্প, প্রমত্ত প্রভৃতি শত শত স্থলে 'প্র'র সম্মুখপ্রবণতা ও নিগদ, (recitation) নিনাদ, নিবন্ধ, নিগলিত, নিপাত, নিগম, নিবরা প্রভৃতি শত শত স্থলে 'নি'র অন্তর্নিষ্ঠতারূপ অর্থ একেবারেই সঙ্গত হয় না ও তিনি যে অনুগম করিয়াছেন তাহা কয়েকটী মাত্র উদাহরণ পর্য্যালোচনার ফল ও একেবারেই বৈজ্ঞানিক অনুগম নহে। অতঃপর আমরা আর একটী উদাহরণ পর্য্যালোচনা করিব ;—

পরিষৎপত্রিকা ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ২৪৫ পৃষ্ঠার প্রতি শ্রোতৃমহাশয়গণ দৃষ্টিপাত করিবেন,—ঐ স্থলে প্রক্ষেপ ও নিক্ষেপ শব্দের অর্থগত ভেদ প্রদর্শন করিবার সময় প্রবন্ধকার মহাশয় বলিয়াছেন, নিক্ষেপ অর্থাৎ to throw in অর্থাৎ ভিতরে ফেলা। তাঁহার মতে 'নি'র অর্থ in ও ক্ষিপ্ ধাতুর অর্থ to throw বলিয়া সমস্ত শব্দের অর্থ to throw in হইল। কিন্তু 'প্রক্ষেপ' শব্দেও 'ভিতরে ফেলা' রূপ অর্থ বুঝায় যেমন এই শ্লোকগুলি এস্থানে প্রক্ষিপ্ত, সুতরাং 'প্র' ও 'নি' একার্থক হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন, যে স্থলে নিক্ষিপ্ত পদার্থের সহিত স্বকীয় আধারের আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, সেই স্থলেই 'নি' হইবে ও যে স্থলে সেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই সে স্থলে 'প্র' হইবে। 'গোলা দুর্গে নিক্ষিপ্ত' হইল, এই স্থলে গোলা প্রক্ষিপ্ত না হইয়া নিক্ষিপ্ত হইল, কারণ নিক্ষিপ্ত পদার্থ গোলক স্বকীয় আধার অর্থাৎ দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে, ও দুর্গের সহিত উহার আন্তরিক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু 'শ্লোক পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইল' এইরূপ বলিতে হইবে ও এইরূপই উক্ত হয়, কারণ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সহিত নিজ আধার অর্থাৎ পুস্তকের কোনরূপ আন্তরিক সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ত আর পরের পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইবার জন্য লিখিত হয় নাই। 'প্র' ও 'নি'র এইরূপ অর্থগত ভেদ কেবল ক্ষিপ্ বা তদর্থক ধাতুর সহিত যোগ হইলে হয় বা সকল স্থলেই হয় তাহা প্রবন্ধকার বলিয়া দেন নাই। কিন্তু সর্ব্বত্র হউক বা না হউক অন্ততঃ ক্ষিপ্ ধাতুর প্রয়োগ স্থলে যে হয় তাহাতে বোধ হয় কোন

অর্থ উপপন্ন হয় ও 'নি'র অর্থান্তর স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। বরং প্রয়োজন হইলে 'নিতরাং খাত', 'নিতরাং গূঢ়' এইরূপ 'নিতরাং' অর্থেই 'নি'র প্রয়োগ বলা অধিকতর সঙ্গত।

প্রবন্ধকার কিন্তু উপসর্গ ব্যাখ্যা করিবার সময় ধাতুর অর্থের দিকে একেবারেই দৃষ্টি করেন নাই ও এই নিমিত্ত সময়ে সময়ে বড়ই গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। (প্রথম প্রবন্ধের ২৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন)। 'প্রগাঢ়' শব্দের স্থল বিশেষে ইংরাজি প্রতিশব্দ Intense হয়, কিন্তু প্রবন্ধকারের মতে 'নি'র অর্থ In সুতরাং 'প্র'র অর্থও In এই ইংরাজি শব্দ দ্বারা অনূদিত হইলে তাঁহার নিজের মতের অসামঞ্জস্য হয়; এই নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, "একদিক্ দিয়া দেখিলে যাহা 'প্র', অন্যদিক্ দিয়া দেখিলে তাহা 'নি' এইরূপ দিক্ পরিবর্ত্তনের গতিকে অনেকগুলি প্র-পূর্ব্বক দেশীয় শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ In পূর্ব্বক ('নি'-পূর্ব্বক) হইয়া গিয়াছে, তাহার সাক্ষী প্রভাব=Influence, প্রগাঢ়=Intense." এস্থলে দিক্ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা না করিয়া নিজের মত পরিবর্ত্তন করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। প্রগাঢ় শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দে in কোথা হইতে আসিল, আমরা তাহার উপপত্তি করিব। প্রগাঢ় শব্দটী প্র-পূর্ব্বক গাহ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় নিষ্পন্ন। গাহ্ ধাতুর অর্থ ভিতরে প্রবেশ, জলে প্রবেশ—ডুব দেওয়া ও 'প্র' উপসর্গের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে, সুতরাং প্রগাঢ় শব্দের অর্থ দাঁড়াইল ভালরূপে ভিতরে প্রবিষ্ট। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রগাঢ় বিদ্বান্ ইত্যাদি সকল স্থলেই এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অর্থের উপপত্তি করা যাইতে পারে। এক্ষণে বুঝা গেল যে, গাহ্ ধাতুর অর্থ হইতেই প্রগাঢ় শব্দের প্রতি শব্দে in আসিয়াছে, 'প্র'র অর্থ হইতে আসে নাই। 'প্রভাব', এস্থলেও 'প্র'র অর্থের বেশ উপপত্তি করা যায়, প্রকৃষ্টোভাবঃ প্রভাবঃ। ভাব শব্দের অনেক অর্থ আছে, তাহার মধ্যে পদ, সামর্থ্য, শক্তি প্রভৃতি অর্থও লক্ষিত হয়, সুতরাং প্রকৃষ্ট পদ, সামর্থ্য বা শক্তি বলিলেই প্রভাব শব্দের অর্থের বেশ উপপত্তি হয়, দিক্ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হয় না।

অতঃপর প্রবন্ধকারের উদাহৃত 'নিদান' শব্দের অর্থ লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'নিদান' শব্দের অর্থ কি? তাহা প্রবন্ধকার বলেন নাই, কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে, ঐ শব্দে 'নি'র অর্থ স্পষ্ট নহে ও 'নিদান' ভিতরের সামগ্রী। ইহাতেও হয়ত অনেকে বুঝিবেন না, (না বুঝিবারই কথা) এইজন্য প্রবন্ধকার ঐ শব্দের অর্থজ্ঞানের এক সঙ্কেত করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই:—'অমুক' Consisting in 'এই সামগ্রী' বলিলে বুঝায় যে, সেটী তাহার নিদান, তাহার সাক্ষী, "Humanity consists in rationality" বলিলে বুঝায় যে প্রজ্ঞা Rationalityর (মনুষ্যত্বের) নিদান (৪র্থ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ২৪৭ পৃষ্ঠা।) এস্থলে নিদান শব্দ নিতান্ত দুষ্প্রযুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। ঐ শব্দের অর্থ আদিকারণ, কারণ, হেতু, লিঙ্গ, ইত্যাদি, উহা স্থলবিশেষে ভিতরের সামগ্রীও হইতে পারে ও স্থলবিশেষে বাহিরের সামগ্রীও হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সাধারণতঃ উহা রোগের কারণ ও লক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন সকল রোগেই নিদান পরিবর্জ্জন আবশ্যক অর্থাৎ যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই কারণ পরিহার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে তাঁহার কৃত সঙ্কেত পর্য্যালোচনা করা যাউক।—উপরি উক্ত ইংরাজি বাক্যটীর প্রকৃত অর্থ—'প্রজ্ঞা

যে; সেস্থলে 'প্র'র সহিত 'স্থস্' ধাতুর যোগ না থাকিলেও 'গম্' ধাতুর যোগ আছে। কারণ আমাদের মতে সেস্থলে 'প্র'র অর্থ 'প্রগত" সুতরাং উহার উপসর্গ বলিয়া গণ্য হইবার বাধা নাই।

আমাদের মতে 'প্রবৃত্তি', 'নিবৃত্তি'র উপপত্তি অন্যরূপ। 'বৃত্' ধাতুর অর্থ 'বর্ত্তন' বা 'স্থিতি', কিন্তু 'প্র' পূর্ব্বক বৃত্ ধাতুর অর্থ 'আরম্ভ'। এস্থলে "প্র" আরম্ভার্থক ও উহার যোগে ধাত্বর্থের বাধ হইল, সুতরাং 'প্র পূর্ব্বক বৃত্ ধাতুর' অর্থই আরম্ভ হইল। যদি বলেন যে, একল্পেও ত ধাতুর অর্থ রহিল না; তাহাতে বক্তব্য এই যে, আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থলবিশেষে উপসর্গের যোগে ধাত্বর্থের বাধ হয়। প্রাদিসমাস করিয়াও প্রখ্যাদের ন্যায় প্রবৃত্তির উপপত্তি করা যায়, অর্থাৎ 'প্রবৃত্তি' কিনা 'প্রকৃষ্টা বৃত্তি' অর্থাৎ ভাল করিয়া থাকা, এবং ক্রিয়ার অবস্থা (কুর্ব্বদবস্থা) (State of action) কোন বস্তুর স্থিতির বা সত্তার প্রকৃষ্ট অবস্থা বলিয়া প্রকৃষ্ট বৃত্তি শব্দে ক্রিয়ারম্ভ বুঝাইতে পারে। আর প্রবৃত্তি শব্দের আসক্তি (Inclination বা ঝোঁক) অর্থ স্থলে প্রকৃষ্টাবৃত্তি বলিলেই বেশ উপপত্তি হয়। 'নিবৃত্তি' স্থলেও উক্ত দুই প্রকার ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা যাইতে পারে। অথবা নি-নিতরাং বর্ত্ততে ইতি নিবৃত্তি অর্থাৎ নিতরাং সম্পূর্ণ-ভাবে চেষ্টাদি শূন্য হইয়া স্থিতি বা থাকা অর্থাৎ চেষ্টা বিরাম এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিবৃত্তিস্থলে বেশ সংলগ্ন হয়। 'নি' ইহার 'নিতরাং' রূপ অর্থ আমার স্বকপোলকল্পিত নহে; নিরুক্ত ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য নিবিৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে নি-নিতরাং এইরূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'নিবিৎ' শব্দের অর্থ 'বাক্ বা কথা'। উহার ব্যুৎপত্তি দুর্গাচার্য্যের মতে 'নিতরাং বেদয়তি' অর্থাৎ 'যাহা ভাল রূপে—সম্পূর্ণ রূপে মনের ভাব বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম নিবিৎ বাক্ বা কথা'। স্থলান্তরে 'নি'র নিশ্চয়ার্থতাও আছে, যেমন—নিগম। 'নিগম' শব্দের অর্থ 'নিঘণ্টু অর্থাৎ বৈদিক শব্দের কোষ। দুর্গাচার্য্যের মতে ঐ শব্দের অর্থ এইরূপ :—"নিগমা ইমে ভবন্তি, নিশ্চয়েনাধিকং বা নিগূঢ়ার্থা এতে পরিজ্ঞাতা সন্তঃ মন্ত্রার্থান্ গময়ন্তি ততো নিগমসংজ্ঞা নিঘণ্টবো ভবন্তি।" অর্থাৎ যাহারা নিশ্চয়রূপে মন্ত্রার্থের অর্থ বুঝাইয়া দেয়। এই সকল স্থলে প্রবন্ধকারের অভি-প্রেত 'অন্তর্নিষ্ঠতা' বা 'অন্তঃ' রূপ অর্থ সংলগ্ন করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা। যদি বলেন, 'নিবাস' শব্দে 'নি'র অন্তর্নিষ্ঠতারূপ অর্থ বেশ সংলগ্ন হয়; তাহাতে বক্তব্য এই যে, ঐ স্থলে 'নি'র কোন বিশেষ অর্থই দেখা যায় না। বাস বলিলেও যাহা বুঝায়, নিবাস বলিলেও তাহাই বুঝায়। অন্তর্নিষ্ঠ বা ভিতরে বাস বুঝায় না, আর অন্তর্নিষ্ঠ বাসের কোন অর্থই নাই। নিবেশ স্থলেও ঐ কথা। বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা। প্রবেশ করা বলিলে কোন বস্তু বা পদার্থ বিশেষের ভিতরে গমন বুঝায়। সুতরাং তিনি পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন, এস্থলে বিশ্ ধাতুর অর্থ দ্বারা নিবেশের অর্থ বেশ সঙ্গত হয়, 'নি'র কোন অর্থ স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে এই নিমিত্ত নি শূন্য কেবল বিশ্ ধাতুর প্রবেশ অর্থে ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ :—'বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনম্'—কুমারসম্ভব; 'উপদা বিবিশুঃ শশ্বৎ নোৎসেকা কোশলেশ্বরম্'—রঘুবংশ। এইরূপ নিঘাত, নিগূঢ় ইত্যাদি স্থলেও ধাত্বর্থদ্বারাই

প্রবন্ধকারের উদাহৃত আর দুই একটী স্থল পরীক্ষা করিলেই তাঁহার মতের অযুক্তিসহতা আরও বিশদ হইবে। দ্বিতীয় উদাহরণটী গ্রহণ করা যাউক, 'প্রবৃত্তি' 'নিবৃত্তি'। প্রবন্ধকারের মতে 'প্রবৃত্তি' শব্দের অর্থ 'সম্মুখের দিকে ঝোঁক' অর্থাৎ সম্মুখ-প্রবণতা, কারণ তাঁহার মতে 'প্র'র ঐরূপ অর্থ। তাঁহার নিজের কথায় বলিতে হইলে 'ঘোড়ার গাড়ির' অর্থ 'ঘোড়া' বলা যাইতে পারে'। কারণ দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার মত অনুসরণ করিলে 'প্রবৃত্তি' শব্দের অন্তর্গত 'বৃত্তি' শব্দটী নিরর্থক হইয়া উঠে। 'নিবৃত্তি' শব্দের অর্থ তাঁহার মতে 'ভিতরের দিকে বৃত্তি টানিয়া লওয়া'। কিন্তু তিনি 'নি'র যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে অন্তর্নিষ্ঠা বৃত্তি অর্থাৎ যে বৃত্তি ভিতরে আছে এইরূপ হওয়া উচিত। যে বৃত্তি ভিতরে আছে ও বৃত্তিকে ভিতরে লইয়া যাওয়া এই দুইটী কথার অর্থগত ভেদ স্পষ্ট। মনে করুন আমি বলিলাম 'আমি মাংস-ভোজনে নিবৃত্ত হইয়াছি' তাহার অর্থ প্রথম কল্পে আমি মাংসভোজন-বিষয়িনী বৃত্তি বা চেষ্টা ভিতরে লইয়া গিয়াছি ও দ্বিতীয় কল্পে ঐ বৃত্তি আমার ভিতরে আছে। প্রথম কল্পে এককালে ঐ বৃত্তি বাহিরে ছিল অর্থাৎ পরিস্ফুট ছিল, কিন্তু আমি এক্ষণে উহা ভিতরে লইয়া গিয়াছি অর্থাৎ দমন করিয়াছি এইরূপ বুঝায়। কিন্তু দ্বিতীয় কল্পে উহা সর্ব্বদাই আমার ভিতরে আছে, তবে কোন বিশেষ কারণবশতঃ বাহিরে পরিস্ফুট হয় না এইরূপ বুঝায়। অর্থাৎ দারিদ্র্য, রোগ বা অন্য কারণবশতঃ আমার মাংসভোজনের বৃত্তি প্রকাশ হইতে পারে না। এক্ষণে এই দুই কল্পের কোন্ কল্প আমাদের গ্রাহ্য? সম্ভবতঃ শেষ কল্প, কারণ উহা প্রবন্ধ-কারের অনুগমের (Generalisation) ফল। এক্ষণে প্রবন্ধকার যদি প্রথম কল্প আশ্রয় করেন, তাহা হইলে 'নি'র অর্থ 'অন্তর্নিষ্ঠতা' এই মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, আর যদি দ্বিতীয় কল্প গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বজনস্বীকৃত অর্থ জলাঞ্জলি দিতে হয়। এই উভয়তঃ পাশারজ্জু (Dilemma) হইতে উদ্ধারের উপায় দেখিতেছি না।

'প্রবৃত্তি' শব্দের প্রধান অর্থ 'চেষ্টা, কার্য্যারম্ভ, কার্য্যে উন্মুখতা' ইত্যাদি। ইহাদের কোন একটী অর্থ গ্রহণ করিলে প্রবন্ধকার একরূপে 'প্র'র অর্থসঙ্গতি করিতে পারিতেন; কারণ ঐ স্থলে যদি 'প্র'র অর্থ 'সম্মুখপ্রবণতা' গ্রহণ করা যায়, ও 'বৃত্তি' শব্দে চেষ্টা অর্থ করা যায়, তাহা হইলে 'প্রবৃত্তি' শব্দে 'সম্মুখপ্রবণ চেষ্টা' এইরূপ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে চেষ্টা বা কায়িক ব্যাপার বাহিরে পরিস্ফুট হইবার নিমিত্ত উন্মুখ, অর্থাৎ কার্য্যে উন্মুখতারূপ অর্থলাভ করা যায়। প্রবন্ধকার কিন্তু এ অর্থে গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সিদ্ধান্ত 'প্র'র অর্থ 'সম্মুখপ্রবণতা' সুতরাং যখন দেখিলেন, প্রবৃত্তি শব্দের ঝোঁকরূপ একটা অর্থ আছে, তখন বিবেচনা করিলেন ঐ অর্থই তাঁহার মতের অনুকূল ও ঐ অর্থই লইয়াছেন। কিন্তু উহাতে যে ধাত্বর্থের একেবারেই পরিত্যাগ ঘটিয়া উঠে, তাহা অনুধাবন করেন নাই। আর এক কথা, তিনি যেরূপে অর্থ দেখাইয়াছেন, তাহাতে 'প্র' ও 'নি'র সহিত 'বৃত' ধাতুর যোগ নাই, 'বৃত্তি' শব্দের সহিত যোগ, সুতরাং উহারা উপসর্গপদ বাচ্যই হইতে পারে না। যদি বলেন, 'প্রশ্বাস' শব্দের আমরা যে অর্থ দেখাইয়াছি, তাহাতেও ঐ আপত্তি। তাহাতে বক্তব্য এই

বিপরীত 'দূরত্ব' রূপ অর্থ প্রকাশ করে। যাস্কের মতে অনেক স্থলে 'আ' এই উপসর্গের সহিত 'প্র' ও 'পরা' এই দুই উপসর্গের অর্থগত প্রাতিলোম্য অর্থাৎ প্রতিকূলতা লক্ষিত হয়। যেমন আগত শব্দে যে কাছে আসিয়াছে তাহাকে বুঝায় ও প্রগত বা পরাগত বলিলে যে নিকট হইতে দূরে গিয়াছে তাহাকে বুঝায়, যেমন প্রপর্ণ (প্রপতিত পর্ণ)—অর্থাৎ যে পত্র পড়িয়া গিয়াছে, বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে গিয়াছে। প্রবাস অর্থাৎ 'দূরে বাস', সম্মুখপ্রবণ বাস বা যে বাসের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে এরূপ বাস নহে। প্রপাত অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান হইতে দূরে পাত, যেমন জলপ্রপাত, সম্মুখপ্রবণ পতন নহে। প্রণায়ক অর্থাৎ যে নায়ক চলিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ যে স্থানে পূর্ব্বে ছিলেন সে স্থান হইতে দূরে গিয়াছেন। (১।৪।৫৯ পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যায় কাশিকাকার 'প্রনায়কো দেশঃ এই প্রয়োগের 'প্রগতো নায়কোঽস্মাৎ দেশাৎ' অর্থাৎ যে দেশ হইতে নায়ক চলিয়া গিয়াছেন এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। উদাহরণটীতে 'আ'র প্রাতিলোম্য রূপ 'প্র'র অর্থ পরিস্ফুট বলিয়া উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রস্থান—দূরে যাওয়া, প্রচার—দূরে চরণ বা ব্যাপন, প্রয়াণ=দূরে গমন, প্রেত=দূর গত, অর্থাৎ এই জগৎ হইতে বহু দূরে গিয়াছে, আর ফিরিবেনা অর্থাৎ মৃত। ইত্যাদি নানাস্থলে 'প্র'র এই 'দূরত্ব' রূপ অর্থ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তদনুসারে 'প্রশ্বাস' অর্থ 'প্রগত শ্বাস' অর্থাৎ 'যে শ্বাস দেহ হইতে চলিয়া গিয়াছে' অর্থাৎ 'পরিত্যক্ত শ্বাস' বুঝায়। উপরি উক্ত স্থলসমূহে প্রবন্ধকারের উদ্ভাবিত অর্থ অনুগত করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে কি যাস্কোক্ত আঙের প্রাতিলোম্যরূপ অর্থই 'প্র'র একমাত্র অর্থ, ঐ অর্থ দ্বারা কি সকল প্রয়োগের সমাধান করা যাইবে? প্রখ্যাত, প্রকাশ, প্রদীপ্ত, প্রতনু, প্রধ্বংস, প্রক্ষালিত প্রভৃতি শত শত স্থলেও কি 'প্র'র অর্থ দূরত্ব হইবে? দুর্গাচার্য্য উত্তর করেন 'না'। "অনেকার্থত্বেঽপি সত্যুপসর্গানাং একৈকোঽর্থঃ উদাহরণত্বেনোচ্যতে অর্থবত্ত্বপ্রকাশনার্থং" অর্থাৎ উপসর্গসমূহের নানা অর্থ থাকিলেও এস্থলে কেবল অর্থপ্রদর্শনাভিপ্রায়ে এক একটী মাত্র অর্থ প্রদর্শিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল 'আঙের' অর্থ নিকট' ও 'প্র ও পরার' অর্থ 'দূর' এরূপ বলিলে সকল প্রয়োগের উপপত্তি হইবেনা। উপপত্তি সম্ভব হইলে প্রাচীনেরা উপসর্গের নানার্থতা স্বীকার করিতেন না। প্রখ্যাত প্রভৃতি উপরি উক্ত স্থল গুলিতে 'প্র'র সম্মুখ-প্রবণতারূপ অর্থ একেবারেই লাগে না। দুই একটী উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। প্রতনু=অত্যন্ত তনু অর্থাৎ ক্ষীণ; প্রবন্ধকারের মতে উহার অর্থ সম্মুখ-প্রবণ তনু। প্রধ্বংস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস; কিন্তু প্রবন্ধকারের মতে উহার অর্থ সম্মুখ-প্রবণ ধ্বংস। অর্থাৎ তাঁহার মতানুসরণ করিলে, ঐ সকল শব্দের অর্থবোধ এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। উপরি উক্ত স্থলগুলিতে "পণ্ডিত মহাশয়দিগের" পরিগৃহীত 'প্রকৃষ্ট রূপ' অর্থই সংলগ্ন হয়। 'প্রখ্যাত' অর্থাৎ 'প্রকৃষ্টরূপ বা ভালরূপ খ্যাত,' প্রক্ষালিত' অর্থাৎ 'ভাল করিয়া ক্ষালিত'। ফল কথা রূঢ় প্রয়োগ ব্যতীত অন্য সকল স্থলেই 'প্র'র 'প্রকৃষ্ট' রূপ অর্থ অনায়াসেই সংলগ্ন হয়, ইহা সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ৩১এ জানুয়ারিতে এক সংবাদ-পত্রিকার উদ্ভব হয়। উহার নাম "হিকিজ্ গেজেট"। উপরে তাহার কথা এক-বার বলিয়াছি। "হিকিজ্ গেজেট" ইংরাজি-পত্রিকা। সুতরাং উহার সম্বন্ধে আমরা নিঃসম্পর্কীয়। যাহার সঙ্গে আমাদের অব্যবহিত সম্বন্ধ, সেখানি "বেঙ্গল্ গেজেট" বা 'বাঙ্গালা গেজেট'। উহার অর্থ—বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র। নাম শুনিবা-মাত্র উহাকে একখানি বৈদেশিক ভাষার পত্রিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু তাহা নয়।

"মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্" যৎকালে বঙ্গের মস্নদে আসীন, (তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের গবর্ণর জেনেরেলের পদ, সুশোভিত করিয়াছিলেন।) সেই সময়ের অন্তরালে—১২২৩ সালে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) "বেঙ্গল গেজেট" বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, "বেঙ্গল গেজেটের" জনয়িতা। প্রকৃত গঙ্গাধর—মহান্ দেব, দেবাদিদেব শঙ্কর। আদিম গঙ্গাধর, গঙ্গাদেবীর বেগধারণ না করিতে পারিলে, ভগীরথের সাধ্য কি, স্বর্গীয় গঙ্গাদেবীকে—মন্দাকিনীকে—জাহ্নবী কি ভাগীরথী সংজ্ঞার আধার করেন! ভট্টাচার্য্য গঙ্গাধর, না থাকিলেও, বঙ্গ-মণ্ডলে সংবাদ-পত্রিকা-প্রবাহিনীর স্রোতঃ, প্রবহমান হইতে পাইত না। ইংরাজাধিকারে ইংরাজই আমাদের বিবিধ বিষয়ের পথ-প্রদর্শক। কিন্তু বড়ই গুরুতম গৌরবের বিষয় এই যে,—এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয়-বার্ত্তাবহ-প্রবর্ত্তক। আর—বাঙ্গালা-মুলুক, "বেঙ্গল গেজেটের" লীলা-খেলার ক্ষেত্র। এই সংস্রবাধীন দুইটী বিষয়, আমাদের মনে রাখা উচিত,—

(ক) বেঙ্গল গেজেটের নাম, সমাচার-পত্রিকা-তালিকার প্রথমেই উল্লেখ্য।

(খ) ১২২৩ সালে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) উহার প্রথম প্রচার।

বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রিকার ইতিবৃত্তে—

(১) "বেঙ্গল গেজেট"

(২) "১২২৩ সাল"

এই দুইটী, সাতিশয় চিরস্মরণীয় বিষয়।

দুই বৎসরের অনধিক কাল, উহার আয়ুঃ। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে উহার জীবনের অবসান ঘটিয়াছিল।

পাদরি-কুল-তিলক লঙ্ সাহেব, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "ডেস্ক্রিপ্টিভ্ ক্যাটালগ্ অব্ বেঙ্গলি বুক্স্" (Descriptive Catalogue of Bengali books) অর্থাৎ "বঙ্গীয় পুস্তক-চয়ের বিবরণাত্মক তালিকা" নামক পুস্তকে সমাচার-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন্ সুযোগে সাহেব, উহার সঙ্কলন সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত-বর্ণন-কালে সাহেব, পাঠকদিগকে ইহাই জ্ঞাত করিয়াছেন যে, "উত্তর-পাড়ার" বিদ্বান্ রিক্তোৎসাহী ভূম্যধিকারী বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, 'কলিকাতাস্থ প্রকাশ্য পুস্তকালয়ে' ("মেটকাফ্

হলে") যে সমুদায় বাঙ্গালা পুস্তক ও বার্ত্তাবহ সম্প্রদান করেন, সেইগুলির সাহায্যে তাঁহার ঐ পুস্তকখানি সঙ্কলিত হয়; কিন্তু আমরা ভগ্ন ভগ্ন করিয়া অন্বেষণেও "বেঙ্গল্ গেজেটের" সন্ধানে বঞ্চিত হইলাম। যে যে স্থানে প্রাচীন বস্তুর সমাদর আছে, সেগুলির নাম একে একে বলিতেছি।

১। এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল।

২। "কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরি" অর্থাৎ মেটকাফ্ হল।

৩। ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরি।

৪। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ বাবুর পুস্তকালয়।

৫। রাজা রাধাকান্ত দেবের পুস্তকালয়। ইত্যাদি।

ভাল ভাল এই কয়টী পুস্তকাগার। বড়ই দুঃখের বিষয়, কুত্রাপি এই পত্রিকার সংবাদ মিলিল না।

২য়। সমাচার-দর্পণ।

(১২২৫ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ (শনিবার) হইতে ১২৫৮ সাল

অর্থাৎ

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ, ২৩এ মে হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।

"দর্পণে মুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তনিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥"

উক্ত কবিতাটী, সমাচার-দর্পণের মুকুট-মণ্ডন। সুতরাং "দর্পণ" উহাতে বিলক্ষণ শোভমান হইয়াছিলেন। "দর্পণ" প্রথমাবধি ষষ্ঠ বার ঐ শিরোভূষণ বিনা দেখা দিয়াছিল। ফলতঃ, এই কবিতা, মুকুরের মুকুট-প্রদেশের মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকার উদ্ভব। ঐ অব্দ, তিন প্রধান প্রধান কারণে খ্যাতিমান্ ছিল ও আছে।

১ম—শ্রীরামপুর কালেজের প্রতিষ্ঠা।

২য়—স্কুলবুক সোসাইটির স্থাপনা।

৩য়—এই "সমাচার-দর্পণের" উৎপত্তি।

প্রথমটী দ্বারা তদঞ্চলীয় মানব-নিচয়ের অশেষ উপকার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় বিষয়ে ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের বিবিধ-বিষয়িণী উপকার-কারিণী একটী মহতী সমিতির সূচনা করিয়া দিয়াছিল। তৃতীয় বা শেষোক্ত ব্যাপারে বঙ্গ-সাহিত্য, কত উপকৃত, প্রবন্ধের অনুশীলনে তাহারই প্রতীতি করিয়া দিবে।

"সমাচার-দর্পণের" উৎপত্তির পূর্ব্ব-কথা, কথঞ্চিৎ কৌতূহলোদ্দীপিকা। হিন্দু-মুসলমান,

জৈন-বৌদ্ধ, শিখ-মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভারতীয় প্রজা-সাধারণের বিষয় বলিব না। কেন না, তাঁহারা একে বিজিত, তাহাতে আবার বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী। কিন্তু রাজ-পুরুষ-গণের সজাতীয় সুশিক্ষিত—অথচ তাঁহাদের পুরোহিত-সম্প্রদায়ী—পাদরি-পুঙ্গব-পুঞ্জেরও গবর্মেণ্টের প্রতি কীদৃশ ভয়ের ভাব, এই উপলক্ষে তাহার পরিচয় জ্ঞাত করিতেছি।

তৎকালে শ্রীরামপুরই, খৃষ্টান মিসনরিগণের নিবসতি-স্থল ছিল। শ্রীরামপুরেই, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র। উহাই—ডাক্তার মার্শমান, ডাক্তার ওয়ার্ড, ডাক্তার কেরি ইত্যাদি বিদ্বান্ পাদরিগণের লীলা-খেলার ভূমি। বহু-কালাবধি বাঙ্গালা-ভাষায় এক-খানি বার্ত্তা-বিষয়িণী পত্রিকার প্রচার নিমিত্ত তাঁহাদের ব্যাকুলতা ছিল। ইতিপূর্ব্বে যে "বেঙ্গল গেজেটের" প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইল, তাহার প্রাণান্ত না হইলে, হয় তো তাঁহাদের এতটা ব্যগ্রতা ঘটিতে পাইত না। কিন্তু ভীরু বাঙ্গালী অপেক্ষা সাহসিক পাদরিদের আন্তরিক আতঙ্ক অত্যন্ত অধিক।

বঙ্গ-ভাষায় সপ্তাহে সপ্তাহে "রাজনীতি" প্রকাশিত হইতে থাকিলে, পাছে রাজ-পুরুষদের সরোষ বিষ-দৃষ্টিতে নিপতিত হইতে হয়, এই এক আত্যন্তিকী আশঙ্কা, তাঁহাদের অন্তর অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল কল্পনা-মূলক মানসিক বিভীষিকায় তাঁহাদিগকে বিচলিত করে নাই। তাঁহাদের অন্যতম উদ্যোগ-কর্ত্তা ডাক্তার কেরি সাহেবকে একাদিক্রমে ২৫ (পঞ্চবিংশতি) বৎসর ব্যাপিয়া উচ্চতম রাজপুরুষ মহোদয়-গণের একপ্রকার নজর-বন্দীর মত অবস্থায় কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অধ্যবসায়ী অপর পাদরিরা, পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে যুগল উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

(ক) তাঁহারা তদা-প্রচলিত ইংরাজি সংবাদ-পত্রিকা-সমূহে ভবিষ্য "সমাচার-দর্পণের" উদ্দেশ্য ও উহা কি প্রকারের পদার্থ হইবে, তাহার তাৎপর্য্য, বিজ্ঞাপন-ভাবে এবং সংবাদ-স্বরূপে মুদ্রিত করিতে থাকিলেন। কার্য্য-কালের পূর্ব্বে বা পরে বিজ্ঞাপকদিগকে তিরস্কৃত, শাসিত বা কোন রূপেই দণ্ডিত হইতে হইল না!

এইটীই প্রথম উপায়। দ্বিতীয় উপায় এই—

(খ) পত্রিকা-প্রচারের পূর্ব্ব-রজনীযোগে (১২২৫ সাল, ৯ই জ্যৈষ্ঠে অর্থাৎ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ, ২২এ মে শুক্রবারে) কেরি সাহেব, শেষ প্রুফ সন্দর্শন সময়ে নৈশ-সমিতিতে পুনরায় পূর্ব্ব বিভীষিকার কথা উত্থাপিত করিলেন।

ডাক্তার মার্শম্যান, ঐ সংস্রবে কহিলেন, "আগামী কল্য শনিবার প্রাতে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিকে ভাবী পত্রের সূচী সহিত এক খণ্ড নমুনা প্রেরিত হউক।" প্রস্তাব-মতই কার্য্য হইল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে, পদস্থ কোন কর্ম্মচারীই, কোনই আপত্তি জ্ঞাপন করেন নাই। বরং গবর্ণর জেনেরল্, স্বহস্তে সম্পাদককে পত্র লিখিলেন। সেই চিঠিতে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন;—

"It is salutary for the Supreme authority to look to the control of Public Scrutiny."

"সমাচার-দর্পণ" সাধারণ পাঠকের, এমন কি, হিন্দু-ভাবাপন্ন পাঠকেরও, বরাবর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম গ্রাহকশ্রেণীর তালিকার শীর্ষ-স্থানে থাকায়, ইংরাজ-সমাজে বঙ্গবাসি-বৃন্দের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়াছিল। তখন রাজধানী ও তাহার পার্শ্বস্থ স্থান-সমূহে সংবাদ-পত্রের ডাকমাশুল ।০ (চারি) আনা ধার্য্য ছিল। লর্ড হেষ্টিংস্-সমীপে উক্ত ডাক-মাশুল কমাইতে আবেদন প্রেরিত হইলে, তিনি শৈলাবাস হইতে প্রেসিডেন্সিতে আসিয়া উহার সুবিধা করিয়া দেন। স্থির হইয়াছিল, এক আনায় প্রতি-সংখ্যা বিলি হইবে। (১)

পার্সী ও ইংরেজী ভাষা, যখন "দর্পণের" অঙ্কে প্রতিফলিত হইত, তখনকার এই ব্যবস্থা ছিল। ইতিপূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কেরি সাহেব, এই পত্রিকার প্রচারে ব্রতী হইয়া, প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলেন, বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত রাজনীতি-সংক্রান্ত এই সংবাদ-পত্র ("সমাচার-দর্পণ") রাজ-পুরুষ-বৃন্দের তৃপ্তিপ্রদ হইবে না। কেন না, উহা বঙ্গীয় ভাষায় আলোচিত হইবে। ও রকমে আপামর নর-নারী রাজনীতির আস্বাদ পাইয়া এদেশে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি প্রভৃতি উপস্থিত করিবে। কিন্তু শ্রীরামপুরের অন্যতম পাদরি, উক্ত মার্শম্যান্ ("সমাচার-দর্পণের" প্রথম সম্পাদক), সাহস-সহকারে উহার প্রথম সংখ্যা, যেমন লর্ড হেষ্টিংসের গোচরস্থ করিলেন, তিনি স্বীয় রাজোচিত অভ্যর্থনায় ঐ প্রস্তাবের সমাদর করিয়াছিলেন।

এক স্থলে লঙ্ সাহেব, ভ্রম-ক্রমে "সমাচার-দর্পণ" না লিখিয়া, "শ্রীরামপুর-দর্পণ" লিখিয়াছেন। এই ভ্রান্তির হেতু নির্দ্দেশিত হইতেছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের ত্রয়োদশ খণ্ডে "দর্পণ অব্ শ্রীরামপুর" অর্থাৎ 'শ্রীরামপুরের দর্পণ' লিখিত হয়। এখানে "সমাচার-দর্পণকে" সংক্ষিপ্ত ভাবে কেবল "দর্পণ" লেখা হইয়াছে। ইহার পাঁচ বৎসর পর, "দর্পণ অব্ শ্রীরামপুর" সাহেব কর্ত্তৃক "শ্রীরামপুর-দর্পণ" নাম ধারণ করিয়াছিল। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত বলিয়া, স্থূলতঃ উহা "শ্রীরামপুরের দর্পণ" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লঙ্ সাহেবের 'বাঙ্গালা-পুস্তক-বিষয়ক তালিকা' প্রচারের পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তদ্বিষয়িণী এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে 'সমাচার-দর্পণই' লিখিত হইয়াছিল। লঙের পুস্তক, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের (১২৬২ সালের)। গুপ্ত কবির উক্ত সন্দর্ভ, ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখে প্রচারিত হয়। ফলতঃ "সমাচার-দর্পণ" অনেক বিষয়ে 'শ্রীরামপুর-দর্পণই' হইয়াছিল।

"সমাচার-দর্পণ" সাহেব পাদরিদের সম্পাদিত পত্রিকা। সুতরাং ইহার প্রচারের অব্দ, মাস ও দিন পর্য্যন্ত যথাযথ পাওয়া বিধেয়। কিন্তু সেই আশায় আমরা নিরাশ্বাস। এ সম্বন্ধে ৫ (পাঁচ) মত বিদ্যমান।

---

(১) এই বৎসরেই ডাক্তার মার্শম্যান "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" প্রকাশ আরম্ভ করেন। প্রথমে উহার মাসে মাসে প্রচার হইত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেও ঐ ভাবে প্রচার হইয়াছিল। কিছু কাল পরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উহার ত্রৈমাসিক আকার হয়। তৎপরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সাপ্তাহিক হইয়া অনেক দিন চলিয়াছিল। কিছু কাল হইল, ষ্টেট্স্‌ম্যানের সঙ্গে উহা সংলগ্ন হইয়াছে।

(ক) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মে শুক্রবার। | (খ) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৩এ মে শনিবার।
(গ) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৩এ আগষ্ট শুক্রবার। | (ঘ) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৩১এ মে রবিবার।
(ঙ) ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে।

প্রথম মতটী, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বরে প্রচারিত ক্লার্ক মার্শম্যান্ সাহেবের "বাঙ্গালার ইতিহাসে" পরিব্যক্ত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের একাদশ সংস্করণের সাহায্যে ঐ কথা, পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলাম। (১)

দ্বিতীয় মত। "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৯এ সেপ্টেম্বরে "সমাচার-দর্পণের" ইতিহাস দেখিলে, সবিশেষ বিদিত হওয়া যাইবে।

তৃতীয় মত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রচারিত লঙ্ সাহেবের পুস্তকের তালিকার ৬৬ পৃষ্ঠায় ঐ মত ঘোষিত।

চতুর্থ মত। কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত-গ্রন্থে পরিগৃহীত।

পঞ্চম মত। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয়ের পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা"-নামক স্বীয় গ্রন্থে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দকে "সমাচার-দর্পণের" প্রকাশ-কাল বলিয়াছেন। ইহা, হয় মুদ্রাকর-প্রমাদ, না হয় গ্রন্থকারের অনবধানতা। কেন না, লঙ্ সাহেবের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই, তিনি "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা" সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও "১৮১৮ খৃষ্টাব্দই" "সমাচার-দর্পণের" প্রকাশাব্দ নিবদ্ধ।

প্রথমতঃ, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ-সম্বন্ধে কোন গোলমাল নাই। দ্বিতীয়তঃ, "শনিবার" নিশ্চয়ই "সমাচার-দর্পণের" প্রথম প্রকাশের দিন। উক্ত তারিখ-গুলির মধ্যে ২৯এ মে ও ২৩এ আগষ্ট "শুক্রবার"। ৩১এ মে "রবিবার"। ২৩এ মে তারিখই "শনিবার"।

মার্শম্যান্ প্রভৃতি সাহেবদের বিষয়-বর্ণনায় "৩১এ মে" তারিখে "সমাচার-দর্পণের" প্রচার-দিন বলিয়া যে উক্তি রহিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রম-ময়। তাহার কারণ, ৩১এ মে "রবিবার।" ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মে "শনিবার"। লঙ্ সাহেবের আরও একটু ভুল হইয়াছে। তাঁহার মতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ আগষ্ট "সমাচার-দর্পণ" প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাও ভ্রম-মাত্র। কেন না, দেখিতেছি—২৪এ আগষ্ট "শুক্রবার"। "শনিবারে" ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের জীবন-বিবরণ পুস্তকে তাহা স্পষ্টই উল্লেখিত। অতএব ইহাই নির্ভুল (২)।

"সেরিফ সেলের" বিজ্ঞাপন পাইবার নিমিত্ত আবেদন প্রদত্ত হইলে, গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তক-কুলের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন, এবম্ভূত ভরসা ছিল না। তাঁহাদের সেই ভরসা কিন্তু নির্মূল হয় নাই। রাজপুরুষেরা, তাঁহাদিগকে ঐ বাঞ্ছিত বর দিয়া, তাঁহাদের মান বাড়াইয়া দিয়াছিলেন (৩)। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

(১) ঐ পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(২) "সমাচার-দর্পণের" ফাইল পাইয়াও, ঐ বুদ্ধি-বিচারেরই সাফল্য হইল।
(৩) "সমাচার-দর্পণের" প্রবর্ত্তকেরা, প্রকৃষ্ট চেষ্টায় যে প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া গেলেন, সেই পথ দিয়া

তদানীন্তন ভারতেশ্বর (বড় লাট) আমহার্ষ্ট মহোদয়ের আমলের মধ্যে (১৮২০-২৮ খৃঃ) গবর্ণমেণ্ট হইতে ১০০ (এক শত) খণ্ড পত্র ক্রীত ও বিতরিত হইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। তদবধি বহুকাল ঐ নিয়ম অব্যাহত থাকে। রাজ-কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদের ভাগ্য ভাল ছিল। বিনা মূল্যে সংবাদ-পত্রিকা তাঁহারা পাইতেন। মূল্য না দিয়া পত্রিকা পাওয়া কি একটা মহাসুযোগ নয়?

"সমাচার-দর্পণের" ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। তাহার একটা দৃষ্টান্তও, অন্ততঃ দিতে হইল। বর্ষীয়ান্ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন,—

"আমাদের স্মরণ হয়, আমরা বাল্যকালে এই "সমাচার-দর্পণ" অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। আমাদের গ্রামে "বাজারিয়া দল" নামে পরপীড়ক এক দল গাঁজাখোর ছিল। "সমাচার-দর্পণ" তাহাদের বিষয় লেখাতে, দারোগা আসিয়া সুরখাল করে। তাহাতে তাহারা শাসিত হইয়া যায়।"

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১৯এ সেপ্টেম্বরে "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" পত্রে "সমাচার-দর্পণের" ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়। তাহাতে যে সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত-সার এই ;—

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মে তারিখে "সমাচার-দর্পণ" প্রথম প্রকাশিত হইয়া, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দেও বিদ্যমান ছিল। লঙ্ সাহেবের মতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম সম্পাদক জে, মার্শম্যান, অপর কর্ম্মে ব্যাপৃত হওয়ায়, এই পত্রিকার সম্পাদকীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার গ্রাহক, সাড়ে তিন শত (৩৫০)। মফস্বলে এক শত ষাটী ১৬০ জন গ্রাহক ছিল। উহার বার্ষিক মূল্য ১২৲ বার টাকা। চাঁদার টাকায় ও "সেরিফ সেলের" বিজ্ঞাপন দ্বারা ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। "ইংলিশ্‌ম্যান্" পত্রিকা, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারিতে এই কথাগুলি আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন সামগ্রীর কার্য্য-কারিণী ক্ষমতা, অনেক সময় খর্ব্ব হয়। "সমাচার-দর্পণও" পুরাতন হওয়ায়, অল্পে অল্পে উহার কার্য্যকরী ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিল। অবশেষে একেবারেই বিলুপ্ত হইল। প্রবর্ত্তক-গণকে শেষ দশায় "সমাচার-দর্পণের" প্রকাশ রহিত করিতে হইল। ইহার পর কলি-কাতার শিক্ষিত কোন ভদ্র ব্যক্তি, উহার দ্বিতীয় বার প্রচারে মনোনিবেশ করিলে, পত্রিকাখানি পুনর্জ্জীবন লাভ করে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহা হস্তান্তরিত হয়। পাদরিদের সময়াভাবই, এই পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ (১)।

এখানে পাঁচটী বিষয় আমাদের স্মরণীয়।

(ক) "সমাচার-দর্পণ" জন্মাবধি ১১ একাদশ বৎসর (১৮১৮ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) কেবল বাঙ্গালা ভাষারই সেবা করিয়াছিলেন।

পরম আনন্দে তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকেরা চলিতে লাগিলেন। "সমাচার-চন্দ্রিকা" "সংবাদ-প্রভাকর" "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" "সংবাদ-ভাস্কর" এই সকল পত্রও, উত্তর-কালে গবর্ণমেণ্টীয় বিজ্ঞাপন-মুদ্রণে অনুমতি পাইয়াছিলেন। মৃত "ভাস্কর" ব্যতীত অদ্যাবধি ঐ সকল মুমূর্ষু পত্রিকাগুলি, সেই অধিকারে বঞ্চিত নয়।

(1) "Friend of India", 19th Sept. 1850.

(খ) ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে (১২৩৬ সালে) তিনি বিমাতার সেবায় মনোযোগী হইলেন। তবে আশার বিষয়, তিনি গর্ভ-ধারিণীর শুশ্রূষায় অবহেলা করেন নাই। "সমাচার-দর্পণ" যেমন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, অমনই (১৮২৯ খৃঃ হইতে ১৮৪২ খৃঃ পর্য্যন্ত) ১৩ (তের) বৎসর ক্রমাগত তাঁহাকে আমরা মাতা ও বিমাতা উভয়ের সেবক হইতে দেখিলাম। মধ্যে কিছু দিন আবার পূর্ব্ব বিমাতাও (পারসী ভাষাও), উপেক্ষিত হয়েন নাই।

(গ) ১৪৮২ খৃঃ তিনি জন্মদাতৃ-গণের যত্ন-বঞ্চিত হইয়া, কোন এক অজ্ঞাতনামা মানবের হস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন। এই সময়ের পরই "দর্পণের" মরণ।

(ঘ) ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার প্রেতাবস্থা।

(ঙ) ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রেতোদ্ধার-মাত্র হয়। সে কিন্তু নাম-মাত্র নব-জীবন-লাভ। জীবন-দাতারা, জীবন-রক্ষা-বিষয়ে এবার তেমন যত্নবান্ হয়েন নাই। সুতরাং—

"ভগ্নস্নেহেন যা মৈত্রী, ন সা কল্যাণদায়িকা"।

এই মহাবাক্যের সার্থকতা অবলোকিত হইতে লাগিল। যেহেতু, ইহার পর তাহার জীবনী শক্তির পরিচয়াভাব।

বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মফঃস্বল-সংক্রান্ত বিস্তর "প্রেরিত পত্র" ইহাতে প্রকাশার্থ উপস্থিত হইত। বঙ্গ-দেশের প্রত্যেক জেলায় ও ৩৬০টী ষ্টেশনে ইহার বহুল প্রচার হইয়াছিল। ইহাতে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সহর-মফঃস্বলের সমাচার মুদ্রিত থাকিত। তাহা ছাড়া—ইতিহাস, রাজনীতি, ভূগোল-বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে ইহা ভূষিত হইত। সুতরাং সাধারণ জন-গণ, এতদ্দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাইয়াছিল। ইহার প্রকাশ অবধি কলিকাতার—বিশেষতঃ, মফঃস্বলের—অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। রাজ-কর্ম্ম-চারীরাও, নিজ নিজ ত্রুটির প্রকাশ-ভয়ে সদাই সশঙ্ক রহিতেন।

"সমাচার-দর্পণের" কোন ফাইল প্রথমতঃ পাই নাই। এ বিষয়ে আমাদের স্নেহাস্পদ সাহিত্য-জীবী সত্যেন্দ্রনাথ পাইন্‌কে উহার অন্বেষণ-নিবন্ধন ভারার্পণ করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরপাড়ার লাইব্রেরী ও শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরীতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও, কোন সন্ধান পান নাই।

"সমাচার-দর্পণ"-সম্বন্ধে লোকে যে ভুল করিয়াছেন, নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। মার্শম্যান্ সাহেবের ইংরাজি ভাষায় সঙ্কলিত বঙ্গীয় ইতিহাস।

২। "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" (Friend of India) নাম্নী সমাচারপত্রী উহাতে "সমাচার-দর্পণকে" বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম বার্ত্তাবহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।

৩। "কলিকাতা-রিভিউ" পত্রিকার ১৩শ খণ্ডে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে "Early Bengali Literature and Newspaper" অর্থাৎ "প্রাথমিক বঙ্গ-সাহিত্য ও প্রাথমিক বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র"-সম্বন্ধে লঙ্ সাহেবেরও ঐ ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন পুনরায় বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রের বৃত্তান্ত (১) লেখেন, সেই সময় এই ভ্রম সংশোধিত হয়।

পাদরিদের এই অনুত্তম উত্তম, প্রথম ও প্রশংসনীয় নয়। সহমরণের বিবরণে মার্শম্যান্, রামমোহন রায়ের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। ফলতঃ, এ সকলকে ভ্রম, বিদ্বেষ বা অজ্ঞতায় পরিচায়ক বৈ আর কি বলা যাইবে? আমাদের মতের পোষকতার্থে লঙ্ সাহেবের শেষ লেখাই, আমাদের সাক্ষী।

৪। "বেঙ্গল্ একাডেমি অব্ লিটারেচারে" নানা ভুল রহিয়াছে।

"সমাচার-দর্পণ"-পরিচালনায় কেবলই যে পাদরিদের প্রাধান্য ছিল, এমন কথা বলা যায় না। সংস্কৃতজ্ঞ বিস্তর পণ্ডিতের রচনাও, উহাতে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। পাদরিদের চালিত পত্রিকা হইলেও, উহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত, সমর্থিত হইত না। বরং হিন্দুয়ানীর পোষকতা উহাতে দেখিয়াছি।

"সাহিত্য-পরিষদের" অন্যতম উৎসাহশীল সদস্য আমাদের প্রাচীন প্রবীণ সাহিত্য-সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মিত্রজ ও নিপুণ ডাক্তার হেমচন্দ্র চৌধুরী এল্, এম্, এস্, মহাশয়-দ্বয়ের যত্নে আমরা "সমাচার-দর্পণের" প্রথমাবধি কতিপয় বর্ষের মূল পত্রিকা পাইয়াছি। তাহা হইতেই কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল। তাঁহাদের এই সহৃদয়তার যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া, নিঃশেষ করা যায় না। লেখার নমুনা, পশ্চাৎ দেখান যাইতেছে।

"এই সমাচারের পত্র, প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে। তাহার মধ্যে এই এই সমাচার দেওয়া যাইবে।

১। এতদ্দেশের কলেক্টর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।

২। শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব যে যে নূতন আইন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্য অন্য প্রদেশ হইতে যে যে নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪। বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫। লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬। ইউরোপ দেশীয় লোক কর্ত্তৃক যে যে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে যে নূতন পুস্তক, মাসে মাসে ইংলণ্ড হইতে আইসে, সেই সকল পুস্তকে যে যে নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির কথা থাকে, তাহাও ছাপান যাইবে।

৭। এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান্ লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে। তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা।

প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র, বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক, তিনি আপন নাম, শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে, প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।" (২)

---

(1) Descriptive Catalogue of Bengali works.

(২) "সমাচার-দর্পণের" অন্যান্য প্রবন্ধ, "পরিষদ্" হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে।

প্রথম সংখ্যা।

ইস্তাহার।

"এই সপ্তাহের সমাচারের পত্র অতি ত্বরায় ছাপা হইল। সে কারণ অধিক সমাচার নাই। আগামী ২ সপ্তাহেতে অধিক দেয়া যাইবেক।"

দ্বিতীয় সংখ্যা।

ইস্তাহার।

"এই সমাচারপত্র যাহার লইতে অভিলাষ হয়, তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইবেন। তবে তাঁহার নিকটে প্রতি সপ্তাহের সমাচারপত্র পাঠান যাইবে এবং যদি কোন জন এই সমাচারের পত্রে কোন নূতন সমাচার ছাপাইতে ইচ্ছা করেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় তাহা পাঠাইয়া দিবেন ইতি।"

"বিবাহের নূতন ব্যবস্থা।"

"ভূমধ্যস্থ সমুদ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে আলজিয়র নামে এক নগর। সেখানকার রাজা যথার্থ মত চলে না। তাহারও আপন মাথার স্থৈর্য্য নাই। গত বৎসর যে রাজা ছিল, তাহাকে মারিয়া এক ব্যক্তি সিংহাসনে বসিল; পরে তাহাকে অন্য এক জন মারিয়া সিংহাসনে বসিল। শেষ রাজার সমাচার শুনা যায় যে, এক মরক দ্বারা তাহার নগরে অনেক লোক মরিল এবং তিনি আজ্ঞা করিলেন যে, কুড়ি বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক যে সকল লোকের বিবাহ না হইয়াছে, তাহাদিগের বাজারের মধ্যে লইয়া হস্তপদ বন্ধন করিয়া পাদ নীচে দণ্ডাঘাত করা যাইবেক।"

তৃতীয় সংখ্যা।

"দুই সপ্তাহের কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে। পুনর্ব্বার এ সপ্তাহের কাগজও বিনামূল্যে দেওয়া যাইতেছে। আগামী শনিবারের মধ্যে যে যে লোক, বহীতে সহী করিয়াছেন, কিম্বা মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইবেন, সেই সকল লোক নিকটে সপ্তাহ সপ্তাহ কাগজ পাঠান যাবেক।"

এস্থলে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের তালিকা তুলিয়া দিলাম—

বিষয়।	কোন্ দেশে।	খৃষ্টাব্দ।
১। ইংগ্লণ্ডে কর্ম্মারম্ভ	ইংগ্লণ্ডে	৬৪০ *
২। হিসাবের অঙ্কারম্ভ	ইউরোপে	৯৯১ †

* কোন কোন অক্ষর খণ্ডিত।

† ইহার পূর্ব্বে "অক্ষর" দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইত।

	বিষয়।	কোন্ দেশে।	খৃষ্টাব্দ।
৩।	তুলার বস্ত্রের নেকড়া দ্বারা কাগজ	ইংলণ্ড	১০০০
৪।	বাদ্যের তাল-মান-চিহ্ন	,,	১০৭০
৫।	পাট-নির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা কাগজ	,,	১১৭০
৬।	খড়ের গৃহ ছাড়িয়া অট্টালিকা	ইংলণ্ড	১২৩৩
৭।	কোম্পাস প্রকাশ	ইউরোপে	১৩০২
৮।	তোপ ও বারুদ	ইংলণ্ড	১৩৪০
৯।	তৈল রঙ্গ দ্বারা ছবি লেখন	,,	,,
১০।	স্বর্ণমোহর নির্ম্মাণ	,,	১৩৪৪
১১।	কয়লা পোড়ান আরম্ভ	,,	১৩৫৭
১২।	তাস খেলা	ফ্রান্স দেশে	১৩৯১
১৩।	ছাপা কর্ম্ম কাষ্ঠ-হরফ দ্বারা	ইউরোপে	১৪৩০
১৪।	ছবি খোদা আরম্ভ	ইংলণ্ডে	১৪৬০
১৫।	আমেরিকা-দর্শন	—	১৪৯২
১৬।	তামাকু ব্যবহার	ইংলণ্ডে	১৫৮৩
১৭।	গাড়ি সৃষ্টি	,,	১৫৮৯
১৮।	ঘড়ি সৃষ্টি	,,	১৫৯৭
১৯।	ডাক সৃষ্টি	,,	১৬৩৫
২০।	চা খাওয়া	,,	১৬৬৬
২১।	লাটরি আরম্ভ	,,	১৬৯৩
২২।	ষ্টাম্প কাগজ	,,	১৬৯৪
২৩।	বসন্তবারণার্থ টীকা	,,	১৭২৭
২৪।	শ্রীযুত এন্‌সন্ সাহেব জাহাজ দ্বারা পৃথিবী বেষ্টন করে	,,	১৭৭৪

চতুর্থ সংখ্যা।

তিন সংখ্যা বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয়। মাসিক মূল্য ১৷৷০ টাকা। বার্ষিক মূল্য ১২৲ টাকা।

"এই সমাচার-দর্পণ, শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওয়া আবশ্যক থাকে, তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে, সপ্তাহে সপ্তাহে কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাইবেক। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন, যদি হরকরা কাগজ তাঁহার নিকট না দেয়, তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে দেওয়া মাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাইবেক।"

"কলিকাতার নূতন খবরের কাগজ।"

"এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে। সে সপ্তাহে দুই বার ছাঁপা হইবেক এবং যাহারা বরাবর ঐ কাগজ লইবেন, তাহারা মাস মাস ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরাবর না লইবেন, তাঁহারা যে মাস লইবেন, সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবেক।" (১)

সংবাদ-পত্র-খানির নাম কি, বলিয়া দেওয়া হইল না। ভাষাটা ভারি কৌতুকাবহ! "তাঁহারা" সম্ভ্রান্ত-ভাবে প্রযুক্ত। কিন্তু "যাহারা" অসম্ভ্রান্ত!

১২২৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৮১৮, ২৩এ মে) হইতে ১২২৮ সালের ৩২এ আষাঢ় (১৮২১, ১৪ই জুলাই) পর্য্যন্ত কেবল বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত "সমাচর-দর্পণের" ফাইল, আমাদের অধিগত।

১২২৮ সালের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে শেষাশেষি কথার উপর নজর রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ১২২৮ সালের ২৫এ আষাঢ়ের সংখ্যা হইতে—

"সমাচার-দর্পণ.

অর্থাৎ

সর্ব্বহিতপ্রয়োজক সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিষয়সূচক সংবাদপত্র।"

এই কথা কয়টী মুদ্রিত হইতে থাকে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১এ জানুয়ারি তারিখ পর্য্যন্ত যে সংখ্যাগুলির ফাইল, ডাক্তার হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট পাঠার্থ প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহাতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা দুই ভাষার সমাবেশ রহিয়াছে।

৩য়। সংবাদ-কৌমুদী।

(১৮১৯ জুলাই হইতে ১৮৪৭ খৃঃ, অর্থাৎ ১২২৬ সালের, আষাঢ় হইতে ১২৪৪ সাল)।

"দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিণা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥"

এক্ষণে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তিনি যে কেবল ধর্ম্ম-বিষয়েই চিত্তার্পণ করিয়াছিলেন, এমন নয়। ভীষণ কুটিল গতি, যেমন সকলেরই পরিত্যাজ্য,—কুটিল বিষয় যেমন সদাই লোকের চক্ষুঃশূল, সেইরূপ অপ্রশস্ত মত বা সঙ্কীর্ণ কার্য্য, কদাপি তাঁহার অনুষ্ঠান-যোগ্য ছিল না। যাহা কিছু উদার ও উন্নত——বিশাল ও দীর্ঘ——মহান্ ও প্রশস্ত, তাহাই তাঁহার করণীয় ছিল। তাঁহার পবিত্র-চিত্ত, যে নানা বিষয়ে ধাবিত হইত, পূর্ব্ব-কথিত সমাচার-পত্রিকাতেই তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়-মান হয়। যে সংবাদ-পত্র, সভ্য জাতির এক প্রধান অবলম্বন,——যাহা বিদ্যমান জ্ঞান-

(১) দর্পণ, ১২২৫ সাল, ১১ই আশ্বিন (১৮১৮।২৬এ ডিসেম্বর), ১৯ সংখ্যা।

সমুজ্জ্বল কালে রাজত্ব-স্থিতির চতুর্থ পন্থা বলিয়া স্থিরীকৃত ঃ—ভারতের সেই উদারচেতা, শ্রেষ্ঠ-পুরুষ, জননী বঙ্গভাষায় শিশুকালেই তাঁহার ক্রোড়দেশে বর্ত্তমান কালের সেই প্রয়োজনীয় ফল, সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিলেন। এ কথা মনে করিলে, কি আহ্লাদই হয়! অন্তরে কত আশার সঞ্চার হয়! তাঁহার উদ্ভাবিত পত্রিকার নাম "সংবাদ-কৌমুদী"। "ক্রিশ্চিয়ান্ অব্-জার্ভার্" পত্রিকা, লঙ্ সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (Descriptive Catalogue of Bengali works) এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লিখিত সংবাদ-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত-প্রচারের পূর্ব্বে "সংবাদ-কৌমুদী" পুস্তক, কি বার্ত্তা-বিষয়ক পত্রিকা, তাৎকালিক লোকবর্গের তাহার স্থিরতা ছিল না। ঐ সব লেখাতেই লোকের জানিবার সুযোগ হইয়াছে যে, উহা পুস্তকের নাম নহে ; কিন্তু এক খানি সংবাদ-পত্র।

"সংবাদ-কৌমুদীর" অগ্রে "সমাচার-দর্পণ" সম্ভূত হয়। আর "বেঙ্গল্-গেজেট" 'সমাচার-দর্পণের' অগ্রজাত। 'সমাচার-দর্পণের' জন্মকাল ১২২৫ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৮১৮।২৩ মে)। "বেঙ্গল-গেজেট" ১২২৩ সালে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং "বেঙ্গল-গেজেটের" বয়ঃক্রম, "সমাচার-দর্পণ" অপেক্ষা দুই বৎসর অধিক। "কৌমুদী" পত্রিকা, অগ্রজ "দর্পণ" ও সর্ব্বাগ্রজ "গেজেট" অপেক্ষা অল্পই বয়ঃকনিষ্ঠ। ইহা এক্ষণে বোধ হয়, সকলের প্রতীতি জন্মিল।

ইতিপূর্ব্বে রাজধানীতে (কলিকাতা সহরে) "সংস্কৃত-প্রেস" নামে এক মুদ্রাযন্ত্র বিদ্যমান ছিল। "কৌমুদীর" মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য, সেই যন্ত্রেই সমাহিত হইত। উক্ত যন্ত্রের কোন রূপ বিবরণ পাওয়া দুর্ঘট।

এখানে একটা বিচার আবশ্যক। কোন এক গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসায় অভিনিবেশের প্রয়োজন উপস্থিত। অবসর ঘটিতেছে, সুতরাং তদ্বিষয়ের অবতারণা করা দোষাবহ হইবে না। বরং খুলিয়া না বলিলে, তত্ত্ব-বস্তু, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে। তথাবিধ উদ্যম অত্যন্ত অধম। যে উপায়ে নির্ব্বিরোধ অব্দে "সংবাদ-কৌমুদীর" জন্ম ঘোষণা করিয়া আসিয়াছি, সেটী বহুল তর্ক-বিতর্কের ফল। অনেক আয়াসে তাহার সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে।

(১) প্রথমতঃ "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের লেখক, প্রচার করিয়া দেন—১৮২৩ খৃষ্টাব্দ "কৌমুদীর" আবির্ভাব-কাল। ঐ প্রবন্ধ-লেখকের নাম পাদরি লঙ্ সাহেব। প্রবন্ধের কোন স্থানে লেখকের নাম নাই—অথচ আমাদের তাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল—বোধ-গোচরে আসিল, এ কেমন কথা? "রিভিউ" পত্রের অন্য প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই ঘোষণা প্রকটিত হয়।

(২) তৎপরে প্রসিদ্ধ পাদরি লঙ্ সাহেবের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি আপনার ভ্রম বুঝিলেন। বুঝিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দকে "কৌমুদীর" জন্ম-সময় অবধারণ করেন। এটী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের কথা। এখানে একটা কথা বলিতে বাকী থাকিতেছে। সাহেব, কি আপনার পূর্ব্ব ভ্রান্তির উল্লেখে পরাঙ্মুখ।

৩) তাহার পর রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, আসরে নামিলেন। সুতরাং একটা উদ্ভগ সা করিবার অবসর জুটিল। ঈশানচন্দ্র বসুজের প্রচারিত "রামমোহন-গ্রন্থাবলীর" মতে ০ খৃষ্টাব্দ, উহার জন্ম-সাল অবধারিত হইল। এই সুযোগে প্রকাশকেরা, ঐ অদ্ভুত মত র করিতে ত্রুটি করিলেন না।

৪) গতিক দেখিয়া আমিও ইত্যগ্রে প্রচার করিয়া দিয়াছিলাম—১৮২১ খৃষ্টাব্দে মুদী" বঙ্গীয় জনের মানস-ভূমিতে প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত মতামতের সার-সংগ্রহ করিলে, যে যে মতান্তর লব্ধ হয়, তাহা এই,——

১। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ।	৩। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ।
২। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ।	৪। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ।

মামরা অনেক অনুসন্ধানে এখন সাব্যস্ত করিতে পারিয়াছি যে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দই (১২২৬), যথার্থ মত। উহাই "সংবাদ-কৌমুদীর" প্রকৃত প্রকাশাব্দ। ইহাই লঙ্ সাহেবের শেষ । "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে "প্রাথমিক বঙ্গীয় সাহিত্য ও প্রাথমিক সমাচার পত্র" (1) প্রবন্ধে লেখকের নাম না থাকা সত্ত্বেও জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, উহাও লঙের লেখনীমুখ নিষ্ক্রান্ত। সাহেব, ঐ সন্দর্ভের ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদী" প্রথম বৃত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রবন্ধের প্রথমাংশে তিনি বলিয়াছেন,—১৮২১ খৃষ্টাব্দের [redacted] অবলম্বন করিয়া তিনি ঐ প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন! যাহার ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম, র দেখা দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৮২১ খৃষ্টাব্দে) পাওয়া যাইতেছে কিরূপে? এ ব্যাপার বুঝিতে পারেন কি? ১৮২১ খৃষ্টাব্দে লোকের "কৌমুদী"-সংস্পর্শ প্রথম ঘটিয়াছিল। আবার পরে—পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেলে (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি লিখিলেন, এতদ্দ্বারা র অমুক সালের অমুক মত খণ্ডিত হইল না। ফলে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদীর" জন্ম ছিল। অথচ খুলিয়া বলিলেন না, "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকার কথা অগ্রাহ্য। ঐ প্রবন্ধে ৩ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইল। কিন্তু উহার শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা আছে,—

"১৮২১ খৃষ্টাব্দের সংবাদ-কৌমুদী"

অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিতেছি। অথচ তিনি বলিতেছেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদীর" বিকাশ। এখন বিচার্য্য এই;—যদি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দেই "কৌমুদীর" প্রথম প্রকাশ-কাল তিনি স্থির লেন, তবে তাহার দুই বৎসরের পূর্ব্বের (১৮২১ খৃষ্টাব্দের) পত্রিকার কেন আশ্রয় । হয়? তাহা তবে আদর্শ স্থলে কেন গৃহীত? এটা একটা উন্মত্ত-প্রলাপ। এত দূর গলদ্ কেন? উহা লেখাপড়ায় স্থান পাওয়া অনুচিত। বিশেষতঃ, সুশিক্ষিত পাদরি সাহেবের তে এবং "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে তাহার অধিকার হওয়া দুঃখের বিষয়। ফলতঃ, ৯ খৃষ্টাব্দই প্রামাণিক। কেন না, লঙ সাহেবের শেষ মতকে আমরা মস্তকে ধারণ

(1) Early Bengali Literature and News-paper.

করিতেছি না (১)। উহার প্রামাণিকতায় আস্থা-স্থাপনের অপর প্রবল যুক্তির অভাব নাই। সেই কারণেই ঐ খৃষ্টাব্দ, অতিশয় অবলম্বনীয়! ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ইণ্ডিয়া গেজেটে রাজা রামমোহন রায়ের "সহমরণ-সম্বাদ"-নামক ক্ষুদ্র পুস্তকের নির্দ্দেশ আছে। কেবল নির্দ্দেশ নয়—সে স্থানে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, উহা কোন সংবাদ-পত্রের পুনর্মুদ্রণ। সেই সংবাদপত্রের নাম—"সংবাদ-কৌমুদী" বৈ আর কিছুই নয়। কেন না—ইহা অতিশয় প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, রামমোহন রায়ের লেখনী, "সংবাদ-কৌমুদীতে" সতীদাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। "সংবাদ-কৌমুদীর" পিতার সঙ্গে তাঁহার অন্যতম উপযুক্ত সহকারী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্রব রহিত হইবার উহাই প্রধান কারণ। ইহাও ইতিহাস-প্রথিত বিষয়। সুতরাং স্থির হইল, "সংবাদ-কৌমুদীর" ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই বা তৎপূর্ব্বের কোন মাসে প্রচার হইয়া থাকিবে। ইহা অবধারিত যে, ঐ অব্দের জুলাই মাসের পরে কখনই "কৌমুদী" প্রকাশিত হইতে পারে না। কেন না, তাহা না হইলে "কৌমুদী" হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত "সহমরণ-সম্বাদ" কেমন করিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের "ইণ্ডিয়া গেজেটে" উল্লিখিত হইতে পারে? লঙের শেষ মত, প্রধান প্রমাণ নয়। যে সাহেব, এক প্রবন্ধের দুই স্থানে দুই ভিন্ন মত প্রচারিত করিতে পারেন,—যিনি নির্ভুল মত ঘোষণা না করিয়া পূর্ব্ব ভ্রমেরই পুনঃ-প্রসঙ্গ করেন, পাঠক! আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি, বলুন দেখি—তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও সরলতার কত অভাব!

ভাগ্যে "কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান্ অব্জার্" পত্রে "সংবাদ-কৌমুদীর" প্রচার কালের নিদর্শন রহিয়াছে, তাই এ যাত্রা সুনিষ্পত্তির উত্তম অবসর হইল। তাহাতেও ঐ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেই "সংবাদ-কৌমুদীর" প্রচারের প্রকৃত কাল নির্ণীত হইল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ঐ প্রবন্ধটী প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে এই একটী নয়, আরও তত্ত্ব প্রচারিত আছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে "কৌমুদীর" বিলোপ ঘটে। কত পূর্ব্বে নিরূপণের সম্ভাবনা নাই। তবে যে একটা সন্ধান পাইতেছি, তাহাতে কিছু ইঙ্গিত যদি পাই, তাই বা ত্যাগ করিব কেন? "বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের" মতে রামমোহনের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে "কৌমুদী" আর আবির্ভূত হয়েন নাই। এই প্রবন্ধের লেখক বাবু নবগোপাল মিত্র। তিনি এখন জীবিত নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং ইহার বর্ষদ্বয় পরে অর্থাৎ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উহা রহিত হইবার কথাই লেখক বলিয়াছেন। "ক্রিশ্চিয়ান্ অব্জারে" যাহা লেখা আছে, তন্মতের সহিত যেন এই মত মিলিতেছে। কেন না, অব্জারভার বলেন, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে "কৌমুদী" গতাসু। কেন না, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। তা হউক। তথাপি এই মত বিশ্বাস্য নয়। উক্ত প্রবন্ধ—প্রবন্ধ-মধ্যে এত ভুল, অসাবধানতা, অসারতা, অলসতা প্রদর্শিত যে—তাঁহার কোন্‌টী ঠিক্ মত, কোন্‌টী ভুল, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া উঠাই দুরূহ। যাহাতে রাশি রাশি ভ্রম,

(১) সাহেব, আরও এক ভ্রান্তিতে জড়িত। এখানে বলিতেছেন, চন্দ্রিকার প্রভাব খর্ব্ব করিতে "কৌমুদীর" প্রচার। ইহাও ভুল।

(৩) তাহার পর রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, আসরে নামিলেন। সুতরাং একটা উত্তম মীমাংসা করিবার অবসর জুটিল। ঈশানচন্দ্র বসুজের প্রচারিত "রামমোহন-গ্রন্থাবলীর" মতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ, উহার জন্ম-সাল অবধারিত হইল। এই সুযোগে প্রকাশকেরা, ঐ অদ্ভুত মত জাহির করিতে ত্রুটি করিলেন না।

(৪) গতিক দেখিয়া আমিও ইত্যগ্রে প্রচার করিয়া দিয়াছিলাম—১৮২১ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদী" বঙ্গীয় জনের মানস-ভূমিতে প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত মতামতের সার-সংগ্রহ করিলে, যে যে মতান্তর লক্ষ হয়, তাহা এই,—

১। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ।	৩। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ।
২। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ।	৪। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ।

আমরা অনেক অনুসন্ধানে এখন সাব্যস্ত করিতে পারিয়াছি যে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দই (১২২৬ সালই), যথার্থ মত। উহাই "সংবাদ-কৌমুদীর" প্রকৃত প্রকাশাব্দ। ইহাই লঙ্ সাহেবের শেষ লিপি। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে "প্রাথমিক বঙ্গীয় সাহিত্য ও প্রাথমিক সমাচার পত্র" (১) নামক প্রবন্ধে লেখকের নাম না থাকা সত্ত্বেও জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, উহাও লঙের লেখনীমুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত। সাহেব, ঐ সন্দর্ভের ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদী" প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রবন্ধের প্রথমাংশে তিনি বলিয়াছেন,—১৮২১ খৃষ্টাব্দের [illegible] অবলম্বন করিয়া তিনি ঐ প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন! যাহার ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম, তাহার দেখা দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৮২১ খৃষ্টাব্দে) পাওয়া যাইতেছে কিরূপে? এ ব্যাপার কেহ বুঝিতে পারেন কি? ১৮২১ খৃষ্টাব্দে লোকের "কৌমুদী"-সংস্পর্শ প্রথম ঘটিয়াছিল। আবার কিছু পরে—পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেলে (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি লিখিলেন, এতদ্বারা আমার অমুক সালের অমুক মত খণ্ডিত হইল না। ফলে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদীর" জন্ম হইয়াছিল। অথচ খুলিয়া বলিলেন না, "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকার কথা অগ্রাহ্য। ঐ প্রবন্ধে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইল। কিন্তু উহার শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা আছে,—

"১৮২১ খৃষ্টাব্দের সংবাদ-কৌমুদী"

অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিতেছি। অথচ তিনি বলিতেছেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদীর" বিকাশ!

এখন বিচার্য্য এই;—যদি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দেই "কৌমুদীর" প্রথম প্রকাশ-কাল তিনি স্থির করিলেন, তবে তাহার দুই বৎসরের পূর্ব্বের (১৮২১ খৃষ্টাব্দের) পত্রিকার কেন আশ্রয় লওয়া হয়? তাহা তবে আদর্শ স্থলে কেন গৃহীত? এটা একটা উন্মত্ত-প্রলাপ। এত দূর গলদ্ হইল কেন? উহা লেখাপড়ায় স্থান পাওয়া অনুচিত। বিশেষতঃ, সুশিক্ষিত পাদরি সাহেবের লিপিতে এবং "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে তাহার অধিকার হওয়া দুঃখের বিষয়। ফলতঃ, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দই প্রামাণিক। কেন না, লঙ সাহেবের শেষ মতকে আমরা মস্তকে ধারণ

(1) Early Bengali Literature and News-paper.

তাহা কিরূপে বিশ্বাস-যোগ্য হইবে? এতদ্ভিন্ন আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে—দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়া রহিয়াছে যে, তাঁহার বিলাত-গমনের কিছু পরেই পত্রিকার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে।

এইখানে "কৌমুদীর" প্রবন্ধগুলির তালিকা দিলাম।

(১) "সহমরণ-সম্বাদ" নামক এক প্রবন্ধ। "সংবাদ-কৌমুদীতে" ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের "ইণ্ডিয়া গেজেটে" তাহার নির্দ্দেশ আছে।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের প্রথম আট সংখ্যার প্রবন্ধতালিকা আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলিরই উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীন কাহিনী, নিশ্চয়ই এখন মনোহারিণী হইবে। এই কারণে এখানে সে-গুলির সমাবেশ করা গেল। "কলিকাতা-রিভিউ" পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ড হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ-সমূহ সংগৃহীত হইল।

(১৮২১ খৃষ্টাব্দ, প্রথম সংখ্যা)।

(২) গবর্ণমেণ্ট, যাহাতে বিনা বেতনে একটী বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করেন, তজ্জন্য প্রস্তাব। এই প্রবন্ধে কোন ব্যয়-কুণ্ঠ ভূপতির উপাখ্যানও নিবেশিত ছিল।

(ঐ অব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা)।

(৩) সংবাদ-পত্রে বঙ্গবাসীদের উপকার হইবে, এরূপ প্রদর্শন।

(৪) চিৎপুরে জল-সেচনাদির ব্যবস্থার কথা।

(৫) গুরুভক্তি।

পোনের বৎসরে উত্তরাধিকারস্বত্ব না পাইয়া, বাইশ বৎসরে পাইলে ভাল হয়, এ বিষয়ের প্রসঙ্গ।

(৭) কৃপণ বাবুদের উপর বিদ্রূপ-বাণ। তাঁহাদের জীবন-লীলার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিত্ত ব্যয় হয়, ইহা উক্ত প্রবন্ধে প্রদর্শিত।

(ঐ অব্দ, তৃতীয় সংখ্যা)।

(৮) হিন্দুর শবদাহ-স্থান এবং খৃষ্টানদের গোরস্থান প্রশস্ত হওয়ার আবশ্যকতা।

(৯) চাউল হিন্দুর প্রধান ভক্ষ্য দ্রব্য। সুতরাং তাহার রপ্তানি-রাহিত্যের ঔচিত্য।

(১০) হিন্দুরা যাহাতে অর্থ ব্যয় না করিয়াই, ডাক্তারি নিয়মে চিকিৎসিত হইতে পারেন, তদর্থে আবেদন।

(১১) দেবতা-প্রতিমা-বিসর্জ্জনের সময়ে সাহেবেরা যাহাতে দ্রুত শকট-চালনা না করেন, তাহার প্রতীকার-প্রার্থনা।

(ঐ অব্দ, চতুর্থ সংখ্যা)।

(১২) নেটিভ ডাক্তারদের (এতদ্দেশীয় চিকিৎসকদের) পুত্রগণের সাহেব-ডাক্তারদের অধীনে শিক্ষিত হওয়ার প্রস্তাব।

(১৩) কৌলীন্য-মূলক বিবাহের অগুণ।

(১৪) বিভবশালীরা, অর্থের অসদ্ব্যবহার করেন, অথচ শিক্ষাকার্য্যে তাঁহাদের দৃষ্টির অভাব।

(১৮২১ অব্দ, পঞ্চম সংখ্যা)।

(১৫) নূতন উদ্ভাবিত নাটকে কুপথে গমন।

(১৬) কাপ্তেন বাবুগণের অখ্যাতি।

(ঐ অব্দ, ষষ্ঠ সংখ্যা)।

(১৭) স্বদেশগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতির, বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাটীতে নৃত্য-ভোজ্য ও তৌর্য্যত্রিক কার্য্য অর্থাৎ গীত-ভক্ষ্য ভোজ্যাদির প্রসঙ্গ।

(১৮) এক পঞ্চম-বৎসরীয় বালকের বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে অভিজ্ঞতা।

(১৯) বিদ্যা-চর্চ্চায় কি কি সুযোগ হয়।

(২০) আগরার তাজমহলের বিবরণ।

(২১) সত্যপরায়ণতা।

(২২) সাহেব ডাক্তারদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বাঙ্গালী যুবকদের শিক্ষানবিশি।

(২৩) মৃত দুঃখীদিগকে পোড়াইবার জন্য চাঁদা-সংগ্রহ।

(২৪) নিঃসহায়া হিন্দু-বিধবাগণের নিমিত্ত ধন-সংগ্রহের আয়োজন।

(ঐ অব্দ, সপ্তম সংখ্যা)।

(২৫) শবদাহের ঘাটে দস্যু কর্ত্তৃক উৎপীড়ন।

(২৬) দাস-দাসীদিগকে প্রশংসাপত্র-প্রদানের আবশ্যকতা।

(২৭) জ্বালানি কাঠের অধিক মূল্য। তৎপূর্ব্বে এক টাকায় ১০/ দশ মণ বিক্রীত হইত।

(২৮) ইংরেজি ভাষা শিখিবার অগ্রে বাঙ্গালী বালকগণ, যেন বাঙ্গালা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে, এই নিমিত্ত প্রয়াস।

(ঐ অব্দ, অষ্টম সংখ্যা)।

(২৯) পক্ষী কর্ত্তৃক মানব-শিশু-অপহরণ।

(৩০) হিন্দুদের স্থপতিবিদ্যা।

(৩১) "কলিরাজার যাত্রা" নামক নূতন নাট্যাভিনয়।

(৩২) অভয়াচরণ মিত্রের নিজ গুরুদেবকে পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০৲) টাকা প্রদান।

(৩৩) কলিকাতার ধনী বাবুদের নিকটে কোন শিক্ষিত ব্রাহ্মণের অসমসাহসিক কার্য্য।

(১৮২২ খৃষ্টাব্দ)।

এই বার যে অব্দের বর্ণন করিতে হইবে, সে সময়ের কোন নিদর্শন পাইবার সম্ভাবনা নাই। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কি কি প্রবন্ধ বা সমাচার, "সংবাদ-কৌমুদীর" কলেবরে স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহার সূচনার কিছুমাত্র গন্ধ-বাষ্পও পাই নাই।

(১৮২৩ খৃষ্টাব্দ)।

তৎপরে পর বৎসরের কথা অর্থাৎ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের সংবাদ, আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে।

প্রবন্ধের নাম—(৩৪) "বিবাদ-ভঞ্জন"। ইহা, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মুদ্রিত "বঙ্গীয় পাঠাবলীর" তৃতীয় ভাগে ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ইংরাজি প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালা-পাঠ্য পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

(১৮২৪ খৃষ্টাব্দ)।

ইহার পরের (১৮২৪ খৃষ্টাব্দের) তালিকা, অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ। এই বর্ষ, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা প্রবন্ধ সংখ্যায় অধিক। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের চৌদ্দটী সন্দর্ভের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া গেল। কিন্তু ১৮২১ খৃষ্টাব্দের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না।

(৩৫) কোন চর্ম্মকার-পত্নীর যুগপৎ তনয়-ত্রয়োৎপাদন। তীর্থ-ভ্রমণ, ব্রত, নিয়ম এবং উপবাসেও ধনবান্‌দের পুত্র হয় না। সুতরাং ধনাঢ্যেরা পোষ্যপুত্রগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। বর্দ্ধমানের রাজীর পুত্রোৎপাদন-সময়ে দুই জন জ্যোতিষীর বিভিন্ন কাল-গণনা।

(৩৬) চিৎপুরের এক সন্ন্যাসিনী-কর্ত্তৃক সন্ন্যাসীর প্রণয়িনীকামিনীকে সজীব অবস্থায় তাৎকালিক সন্ন্যাসীদের প্রথানুসারে মৃত স্বামীর সহিত মৃত্তিকায় প্রোথিত করার বর্ণনা।

(৩৭) অষ্টাদশ-বর্ষীয়া বালিকার সন্তরণদ্বারা নিমতলার ঘাটে গঙ্গার পর-পারে গমন।

(৩৮) ভাগ্য-গণনা-কারী গুপ্তরত্নোদ্ধারক এক ব্রাহ্মণের শ্রীরামপুরে আগমন। এক গৃহস্থের নিকট তাঁহার ২০৲ কুড়ি টাকার পুরস্কার-প্রাপ্তি। গৃহস্থ, স্থানান্তরে গমন করিল, জ্যোতিষ্ক ব্রাহ্মণ, গৃহস্থের পিত্তল-নির্ম্মিত এক রেকাব, মাটির ভিতর পুঁতিয়া ফেলেন। জ্যোতির্বেত্তার গণনা দর্শনার্থ সাহেবদেরও শুভাগমন হইয়াছিল। কার্য্যান্তর-ব্যাপৃত গৃহস্থ স্থানান্তর হইতে সমাগত হইলে, শঠ গণক, মৃত্তিকা হইতে ঐ রেকাব খুঁড়িয়া বাহির করিয়া তাহাই "গুপ্ত-ধন" বলিয়া পরিচয় দিলেন। দর্শকগণ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতারণা-প্রকাশ হইল। ব্রাহ্মণ স্বয়ং কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে মাটির ভিতর রেকাব পুঁতিয়াছিলেন, তাহা রাষ্ট্র হইয়া গেল। হস্তপদবদ্ধ ব্রাহ্মণকে পথে নিক্ষেপ।

(৩৯) হাতপুর-পরগণায় প্রকাণ্ড সর্প ধৃত হয়। তদর্জ্জনে বৃক্ষ কম্পমান হইয়াছিল।

(৪০) তারকেশ্বরে এক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক জীব-বধ। পত্নীর ধর্ম্মনাশে এই ঘটনা ঘটে।

(৪১) জগন্নাথ-ঘাটে কৃচ্ছ্র-কর্ম্মকারী এক ঊর্দ্ধচরণ সন্ন্যাসী। তৎকালে ঐ ঘাট, সন্ন্যাসীদের আশ্রম-স্বরূপ ছিল।

"বঙ্গীয় পাঠাবলী" পুস্তকের তৃতীয় ভাগ এবং এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক হইতে নিম্নে ৭ সাতটী প্রবন্ধের উদ্ধার করা গিয়াছে। এখানে "পাঠাবলীর" যে ভাগের উল্লেখ করিতেছি, সেই "বঙ্গীয় পাঠাবলীর" তৃতীয় ভাগ, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। আর, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার যে বাঙ্গালা-পাঠ্য-পুস্তকের বিষয় বলিতেছি, তাহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক।

(৪২) প্রতিধ্বনি।

(৪৩) অয়স্কান্ত বা চুম্বক-মণি।

(৪৪) মকর-মৎস্যের বিবরণ।

(৪৫) বেঙ্গুনের বিবরণ।

(৪৬) মিথ্যাকথন।

(৪৭) বিচার-বিজ্ঞাপক ইতিহাস।

(৪৮) ইতিহাস।

রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের সম্পাদিত "কৌমুদীর" প্রবন্ধ-পুঞ্জের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইবার ইহাই প্রকৃত অবসর। অনেক ব্যাপারই, এই সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে। একে একে তত্তাবতের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইতেছে।

(ক) তিনি বিনা বেতনে বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ করেন, অথচ আপনিই এতদ্বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি কর্ম্মোপদেশক, তিনি যদি কর্ম্মের অ-প্রবর্ত্তক হয়েন, তাহা হইলে তাহা কদাচ সুশোভন হয় না—তাঁহার বাক্য লোকের রুচিকর হয় না। সেই কারণেই তিনি কেবল কার্য্যের উপদেষ্টা ছিলেন না, স্বয়ংই তদ্ব্যাপারের প্রবর্ত্তক হইতেন। তাঁহার এক বেতনহীন বিদ্যামন্দির ছিল। ভূদেব বাবু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাবু প্রভৃতি অধুনাতন গণ্য জনগণ, তত্রত্য ছাত্র ছিলেন।

(খ) বিনা মূল্যে দীনহীনদিগকে ডাক্তারি নিয়মে চিকিৎসিত করাইতে তিনি কি কম যত্নশীল ছিলেন?

বাঙ্গালীদের ভিতর সমাচার-পত্রের পাঠক, তখন তেমন আশানুরূপ ছিল না। তাই সংবাদ-পত্রিকায় লোকের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতে, তাঁহাকে যত্নপর হইতে হইয়াছিল।

(গ) উত্তরাধিকারিত্বের বয়ঃক্রম-পরিবর্ত্তনে তাঁহার আগ্রহদৃষ্টে সিদ্ধান্ত করিতে, কাহারই কোন বাধা বা দ্বিধা ঘটিবে না। আইনে, দূরদর্শনে, প্রগাঢ় জ্ঞানে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না।

এই সূত্রে একটা আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ বলিতেছি। তিনি কবিরাজি চিকিৎসার বিপক্ষ কি না—ইহার আলোচনা করা, মন্দ নয়। এখানে না হউক, অন্যক্ষেত্রে আমরা পরিচয় পাইয়াছি। তিনি স্বদেশীয় কবিরাজি চিকিৎসারও ভক্ত ছিলেন। ফলে, প্রকৃত বিষয়ের তিনি গুণ-পক্ষ-পাতিত্ব চিরজীবনই প্রদর্শন করিতেন। তাই বলিয়া বৈদিশিক উপকারী দ্রব্যমাত্রে তাঁহার বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষও দৃষ্ট হইত না। ডাক্তারি চিকিৎসাও, তাঁহার প্রাণের প্রিয় পদার্থ।

(ঘ) দান-শৌণ্ডতা তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ। তাই "কৌমুদীর" নানাস্থানে নানাভাবে তাহার অবতারণা।

(ঙ) দরিদ্রের দুঃখে হৃদয় কাঁদিত বলিয়াইতো শবদাহের সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল?

(চ) কোন্ কালে রামমোহন, স্ব-দেশের প্রবল দুর্ভিক্ষের আতঙ্কে প্রমাদ গণিয়া তণ্ডুলের রপ্তানি বন্ধ করিতে বদ্ধকটী হইয়াছিলেন! এক্ষণে শতাব্দীর ত্রি-চতুর্থ বৎসর পরে সেই অভাব বিদূরিত করিতে কতই গগন-ভেদিনী বাণী, রাণীর নিকট পত্রযোগে ও তার-যোগে প্রেরিত হইতেছে।

(ছ) বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ, যাদৃশ দেব-দেবী-দ্বেষী, রামমোহনের মন, তেমন অগুণে অনৌদার্য্য-দোষে পঙ্কিল ছিল না। তাহা হইলে তিনি দেবতা-প্রতিমার বিসর্জ্জনের সময় য়ুরোপীয়দিগকে বেগে গাড়ী চালাইতে দেখিয়া, মর্ম্মাহত হইতেন না। আর তদর্থে সংবাদ-পত্রের সাহায্য, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইত না।

(জ) তাহার পর বৈবাহিক কৌলীন্য নিয়মের উপর খর দৃষ্টিপাত।

(ঝ) তখনও বাঙ্গালা নাট্যশালার সত্তা ছিল। তিনি ভবিষ্য ইতিহাসের অনেক বিষয়েই পথ প্রদর্শন করিতেন।

(ঞ) তত প্রাচীন সময়েও আগরাস্থিত তাজমহলের বিষয় সংবাদ-পত্রে অবতারণা।

(ট) স্বদেশের গুণ-কীর্ত্তনের অবসর, তাঁহার তীক্ষ্ণদর্শনকে কদাচিৎ অতিক্রম করিয়াছিল কি না, সন্দেহ-স্থল। সেই জন্যেই পাঁচ-বৎসরের শিশু, কোথায় ইংরেজি ও বাঙ্গালা শিখিয়া লোককে বিস্ময়ান্বিত করিতেছিল, তাহার দৃষ্টান্ত সাধারণের চক্ষুর উপর ধরিলেন।

(ঠ) একটী বিষয়, আমাদের বিবেচ্য। হিন্দুর বৈধব্য-দুঃখ, তিনি দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা উন্মোচিত করিতে সচেষ্ট না হইয়া, তদুদ্দেশে কি কারণে ভিন্নপন্থার অনুসরণ করেন?

(ড) অগ্রে স্বদেশীয়ভাষায় জ্ঞান না জন্মিলে, বিদেশীয় ভাষায়—ভিন্ন দেশীয় রীতিতে ব্যুৎপত্তির সম্ভাবনা স্বল্প, এদিকে লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণ।

কি কি উপাদান, রায়মোহনের সংবাদ-পত্রের উপকরণ,—কি কি বস্তুতে "সংবাদ-কৌমুদীর" অঙ্গ আচ্ছাদিত হইয়া অলঙ্কৃত থাকিত, এক্ষণে এখানে তদ্বর্ণনে ব্যাপৃত হওয়ার অবসর উপস্থিত।

সমাজনীতি ও রাজনীতি, ইতিবৃত্ত ও পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান ও দর্শন, সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদিই "কৌমুদীর" সমবায়ী কারণ। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের ইহা মুখপত্র হইয়া উঠিয়াছিল। চিকিৎসা-প্রথা, যাহাতে সমুন্নত হইয়া লোকের মহোপকার-সাধনে ব্রতী থাকিতে পারে, তৎপক্ষেও "কৌমুদীতে" আন্দোলন ও অনুশীলনের আলোচনা ও উদ্দীপনার ত্রুটি ছিল না। ফলতঃ, নানা হিতকর ব্যাপার, বিধিমতে উহাতে সমর্থিত হইত। তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থও না থাকিত, এমন নয়। সংবাদ, প্রেরিত পত্র প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের অস্থি-মজ্জা বলিলেই হয়। সেগুলিও যে উহাতে ছিল না, কে বলিবে? প্রথম শ্রেণীর বার্ত্তাবহে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় "কৌমুদীতে" তাহার অভাব থাকিত, এ কথা-প্রচারে কাহারই সাহস কুলায় নাই।

রামমোহন রায় যে, "সংবাদ-কৌমুদীর" প্রচারের মূলীভূত হেতু—তিনিই উহার প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক, তাহা কাহাকেও জ্ঞাত করিতে কখন্ কালেও তাঁহার স্পৃহা বা প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু তাঁহার নামের ও কার্য্যের যেমন এক কুহক ছিল, যাহাতে প্রায় সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিত। "সংবাদ-কৌমুদীর" সুসম্পাদনে সামাজিক সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—মন ভুলিল। সুতরাং কোন্ মহান্ জন, এই প্রশংসনীয় বিষয়ে লিপ্ত তাহার অবধারণে লোকের মতি হইল। লেখার ভঙ্গী, বিচার-প্রণালী, বিষয়-বিন্যাস প্রভৃতি দেখিয়াই মানুষের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকৃত ব্যাপার হইয়া উঠিল।

রামমোহন রায় "কৌমুদীর" জন্মদাতা। আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উহার পালক পিতা। রায় রামমোহন ও বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীচরণ, এই দুই জন "কৌমুদীর" জন্মাবধি প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। এটী একটী মণি-কাঞ্চন-মিলন "কৌমুদীর" প্রথমকার এই অদৃষ্ট লিপি, বিধির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বুঝি বিরিঞ্চি বিরলে থাকিয়া নৈপুণ্য-সহকারে উহার লিপি-রচনায় মন দিয়াছিলেন। কিন্তু অতি অধিক দিন "কৌমুদীর ভাগ্যে যুগলের যুগ্ম যত্ন সান্ত্বনা-সম্ভোগ লেখেন নাই। অল্প কাল পরেই "কৌমুদীকে" এক সাঙ্ঘাতিক আঘাত সহিতে হইল।

প্রথম জনের অভিলাষ হইল, "কৌমুদী" সহমরণ-বিদ্বেষিণী হয়েন। দ্বিতীয়ের চিত্তপ্রবৃত্তি তদ্বিপরীত। সুতরাং কার্য্য-গতিকে ঘটনা-চক্রে উভয়ের মনোবাদ ঘটিল। এই বারই "কৌমুদীর" প্রমাদ-ঘটনার সম্ভাবনা হইল।

প্রথম প্রথম সহমরণ-আন্দোলনে ভবানীচরণকে তত বিচলিত করিতে পারে নাই। অথবা তিনি "কৌমুদীর" মমতায় মোহান্ধ ছিলেন, তাহার জন্যই তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। পরে যতই আন্দোলন-তরঙ্গের বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল, তখনই দুয়ে ছাড়াছাড়ি ঘটিল। বিরহ-বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম সুর উঠিল। প্রবল কোলাহল ও ক্রন্দনের কাতর রোল, গগনভেদ করিয়া অনন্তশূন্যে মিশিল।

চারি বৎসর পূর্ণ না হইতেই, পালক পিতা, অসময়ে "কৌমুদী" ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি "কৌমুদীর" অনুজাতা "চান্দ্রিকার" সৃষ্টি করিয়া, তাহারই সংবর্দ্ধনায় প্রবৃত্ত রহিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দ "চন্দ্রিকার" জন্মবৎসর।

"কৌমুদী" হইতে রচনার নমুনা-স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত হইল।

সংবাদ-কৌমুদী ১৮৩২।৪ঠা ফেব্রুয়ারির পূর্ব্ব-ঘটনা।

"শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয়েষু—

আমারদের দেশ এবং আমরা যে পর্য্যন্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার অধীন হইয়াছি ও হইয়াছে, সেই অবধি আমরা অনেক উৎপাত হইতে মুক্ত হইয়াছি। বরং বরগী হঙ্গাম এবং মারহাটার অত্যাচার আমারদের অনেকের মনেও উদয় হয় না। কিন্তু ডাকাইতের ভয়ে আমরা চিরদিনেই শশব্যস্ত রহিয়াছি। যদিও ডাকাইতি অবিরতই হইতেছে। বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস অর্থাৎ আষাঢ়াবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ভয়ের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। যেহেতুক ঐ কএকমাস নদী প্রভৃতি প্রায় জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং ক্ষেত্রাদিতেও ধান্য ও জল রহিয়া থাকে। সুতরাং ডাকাইতেরা সেই কএক মাস পাথর দুর্গমতা হেতুক প্রায় যাতায়াত করিতে পারে না; কিন্তু অবশিষ্ট সাত মাস অর্থাৎ অগ্রহায়ণ অবধি জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত দস্যুরদের অত্যন্ত অত্যাচারের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ কএক মাস বিশেষতঃ অন্ধকাররজনীতে গৃহস্থেরা রাত্রিকালে প্রায় নিদ্রাবস্থায় থাকেন না। যদিও আমরা ইহা স্বীকার করি যে, পূর্ব্বাপেক্ষা ডাকাইতের অনেক মতে দমন হইয়াছে, তথাচ আমরা তাহারদের অত্যাচারের ভয়কে অত্যন্ত নিকটে দেখিয়া থাকি। এক্ষণে ডাকাইতের এবং রাত্রিরও দীর্ঘতা বিলক্ষণ আছে। সুতরাং এ সময় ডাকাইতেরদের সুসারের সীমা নাই। এমতে আমরা অধিপতিরদের

প্রার্থনা করিতে পারি যে, অন্য অন্য বিষয়ে যেরূপে আমারদের ক্লেশের শান্তি করিয়াছেন, সেই দের এই দুঃখেরও বিমোচন করুন। যেহেতুক ডাকাইতিকে আমরা সাধারণ জ্ঞান করি না। তুইলে আমারদের বিভবেরই হানি হইবেক, এমতও নহে। বরং তাহারা জীবনেরও একবারে অনেক মতে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে। অতএব শরণাগত প্রজারদের এরূপ দুঃখের একেষা করা গবর্ণমেণ্টকে ন্যায্য হয়। কিমধিক নিবেদনমিতি। পল্লিগ্রামনিবাসিনঃ।"

আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্দ্বারা তৎসময়ের ভাষা ও লোকে বুঝিতে পারা যাইবে। যে সময়ের রচনা প্রদর্শিত হইল, তখন "কৌমুদী" স রামমোহন রায়, বিলাতপ্রবাসী। পাঠকগণ মনোযোগ করিলে লক্ষ্য করিতে তাঁহার রচনা অপেক্ষা এই রচনা প্রাঞ্জল।

"শ্রীযুত কৌমুদী প্রকাশকেষু।

"গত বৎসর কলোনিজেসিয়নের উপকার বিষয়ে আপনি যথেষ্ট লিখিয়াছেন, তথাচ আমি পাঠাই, আপনি প্রকাশ করিবেন। কোন কোন ব্যক্তি সংশয় করিবেন যে ইঙ্গরেজ লোকের দীন-দরিদ্র প্রতি দৌরাত্ম্য করিবেন, এরূপ চিন্তা বৃথা; যেহেতু তাহাতে তাঁহাদের কি ফল দর্শি অকারণে কে কাহাকে পীড়া দিয়া থাকে। গোরা লোকেই এতদ্দেশীয়দিগকে প্রহার ক এদেশীয়েরাও ঝগড়াতে ন্যূন নহেন। পোলিসের নিষ্পত্তিপত্র পুস্তক প জানিতে পারিবেন যে, কত মোকদ্দমা গোরাসংক্রান্ত থাকে, আর কত যে [illegible] গোরা দেখিয়া সকলেই ইচ্ছা করেন যে, প্রতারণা করিব, সুত

বৈষ্ণব-কবি জগদানন্দ।

(তাঁহার খসড়া ও পদাবলী)।

বিগত কার্ত্তিক মাসে সাহিত্য-পরিষৎ-সভার শাখা প্রাচীন গ্রন্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মৃণালকান্ত ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড প্রভৃতি গ্রামে গমন করি। সেই প্রদেশে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার তালিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়-সমীপে প্রেরিত হইয়াছে।

এই শ্রীখণ্ড গ্রামে বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নরহরি সরকার, রায়শেখর ও জগদানন্দ প্রভৃতি বঙ্গভাষার কবি। জগদানন্দ ঠাকুরের জীবনী তাঁহার খসড়া ও পদাবলী যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, অদ্য আমরা তাহাই পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিব।

বৈষ্ণব-গ্রন্থে লিখিত আছে, শ্রীখণ্ড গ্রামে পাঁচজন মহাপ্রভুর প্রধান ভক্ত ছিলেন—এই [illegible]দ, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন। নরহরি ও মুকুন্দ উভয়ে [illegible] পুত্র, ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য, উপাধি সরকার, বর্ত্তমান কালে [illegible]ত ভূষিত হইয়াছেন। আমাদের বর্ণনীয় জগদানন্দ [illegible]

এইমাত্র প্রমাণ পাইয়াছি। রঘুনন্দনের জন্ম যদি ১৪৪০ শকাব্দ ধরা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ১৮২০ শকাব্দের ৩৮০ বর্ষ পূর্ব্বে রঘুনন্দনের জন্মকাল নির্ণীত হয়। বর্ত্তমান কালে তদ্বংশীয় ঠাকুরসন্তানগণ রঘুনন্দন হইতে দশম পুরুষ এবং জগদানন্দ হইতে পঞ্চম পুরুষ, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ৩৮০ বর্ষের অর্দ্ধেক ধরিয়া লইলে ১৯০ বর্ষ পূর্ব্বে জগদানন্দের জন্মকাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১৬৩০ শকাব্দের পর তিনি জীবিত ছিলেন।

মালিহাটীনিবাসী রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্র নামক একখানি পদের সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলন করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণের পদসংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু জগদানন্দ ঠাকুরের পদাবলী তখনও প্রচারিত হয় নাই বলিয়া ঐ গ্রন্থে জগদানন্দের একটী পদও সংগৃহীত হয় নাই। পদামৃত-সমুদ্রের অব্যবহিত পরেই বৈষ্ণবদাস (নামান্তর গোকুলানন্দ সেন) পদকল্পতরু সংগ্রহ করেন। তাহাতে দেখা যায়, তিনি জগদানন্দের চারিটীমাত্র পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। অতএব রাধামোহন ও গোকুলানন্দের সময় নিরূপিত হইলেও জগদানন্দের সময় নিরূপিত হইবে।

রাধামোহন ঠাকুর মহারাজ নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। তিনি একবার শাস্ত্রার্থ বিচারে জয়লাভ করিয়া মীরজাফরের মোহরাঙ্কিত একখানি জয়পত্র লাভ করেন, তাহাতে বাঙ্গালা ১১২৫ সালের উল্লেখ আছে এবং রাধামোহনের জন্মস্থান মালিহাটীতে গমন করিয়া, আমরা শুনিলাম রাধামোহন মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির পরেও ২।৩ বৎসর জীবিত ছিলেন।

১১২৫ সালে (১৬৪০ শকে) রাধামোহন শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া জয়পত্র লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির কাল ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ বা ১৬৯৭ শকাব্দ। ইহার ২।৩ বৎসর পরে যদি তাঁহার মৃত্যুকাল ধরা যায়, তবে রাধামোহন ১৭০০ শকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

পদকল্পতরুসঙ্কলয়িতা গোকুলানন্দ মালিহাটীর এক ক্রোশ পূর্ব্বে টেঞা নামক গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাধামোহনের সমকালবর্ত্তী ছিলেন; সম্ভবতঃ গোকুলানন্দ রাধামোহন ঠাকুরের সহিত কীর্ত্তন গান করিতেন। পদকল্পতরুর উপসংহারে গোকুলানন্দ লিখিয়াছেন—

"শ্রীআচার্য্য প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন। কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
যাঁহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের বিলাস। যেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত-সমুদ্র আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। তাঁহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল। প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈলুঁ সার। পূর্ব্ব রাগাদিক্রমে চারি শাখা যার॥"

এই সকল প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইল যে জগদানন্দ গোকুলানন্দের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৩০ শকের পূর্ববর্ত্তী কোন সময়ে বা পরে জীবিত ছিলেন।

জগদানন্দ পদাবলী ব্যতীত অন্য কোন মূলগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না;

তবে তাঁহার খসড়াখানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তিনি "ভাষাশব্দার্ণব" নামক একখানি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল কি না তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই। এই গ্রন্থের ২, ৩ ও ৪ সংখ্যক পত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পত্রখানি পাওয়া যায় নাই। কাব্যখানির যতদূর পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কবিবর জগদানন্দ ককার অনুপ্রাসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কতকগুলি পদ নিবদ্ধ করিয়া তাহাই প্রথম কল্লোল নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই কল্লোলের (অধ্যায়ের) নাম কাদি দিগ্দর্শন। এই প্রথম কল্লোলের দ্বিতীয় পত্রের প্রথম দুই পংক্তি এই—

"কংস-কুঞ্জর-কেশরী করি-কুম্ভ করজে বিদার।
করভ করভুজ কোরে কুলবতী করব কেলি বিহার॥"

এই কল্লোলের শেষ দুই পংক্তি পাঠ করিলে, এরূপ গ্রন্থপ্রণয়নের কারণও জানিতে পারা যায়—

"করহ কবিকুলকণ্ঠে কবিতা করিতে মন যদি ধায়।
কৃষ্ণকৌশল কাব্য করইতে জগত-আনন্দ গায়॥"

প্রতি অধ্যায়ের শেষে—

'ইতি শ্রীমন্নরহরিচরণকমলাশ্রিতেন কেনচিদ্বিরচিতে ভাষাশব্দার্ণবে
কাদি-দিগ্দর্শনোনাম প্রথমঃ কল্লোলঃ।'

ইহার দ্বিতীয় কল্লোলের নাম খাদি-দিগ্দর্শন। তাহার প্রথম দুই পংক্তি এই—

"খলখগেশ্বর খোয়লি এত দিনে খঞ্জনলোচনী রাই।
খীন খঞ্জননয়নী খনে খনে খনিক নিরখহ যাই॥"

শেষ দুই পংক্তি—

"খোভ খীটব খেদ কর চিতে সকল কবিকুলচন্দ্র। খণ্ডবাসিয়া খণ্ডকপালিয়া কহল জগদানন্দ॥"

তৃতীয় কল্লোলের নাম গাদি-দিগ্দর্শন, তাহার প্রথম দুই পংক্তি—

"গঙ্গাগরভ গভীর গহ্বরে গদাই গৌর বিরাজ। গৌরগণ মেলি গৌর গুণগণ গড়ল গান সমাজ॥"

প্রাপ্ত খসড়াখানিতে ভাষাশব্দার্ণব কাব্যের তৃতীয় কল্লোল গাদিদিগ্দর্শন সম্পূর্ণ হয় নাই, এ জন্য শেষের অংশটী দেখান হইল না।

যে খসড়াখানির কথা বলা যাইতেছে, তাহার পত্রসংখ্যা ২১, ইহা পাঠ করিলে জগদানন্দের কাব্য রচনার অনেক রহস্য অবগত হইতে পারা যায়। যেমন মালাকরগণ কতকগুলি নানা জাতীয় কুসুম চয়ন করিয়া একখানি ডালার উপরে সংস্থাপনপূর্ব্বক মালাগুম্ফনে প্রবৃত্ত হয় এবং যেখানে যে ফুলটী গাঁথিলে ভাল দেখায় সেই স্থানে সেই ফুলটী গুম্ফন করে। আমাদের কবি জগদানন্দও সেই প্রকার প্রথমত কতকগুলি শব্দ সঞ্চয় করিয়া তাঁহার খসড়ায় লিখিয়া রাখিতেন, পরে কবিতারচনাকালে যেখানে যে শব্দটী প্রয়োগ করিলে পাঠকের শ্রবণ প্রীতিকর হয়, তিনি তাহাই করিতেন। তাঁহার খসড়াখানিতে তিনি যে সকল শব্দ সংগ্র

[redacted] ঠাকুর

[redacted] ১৪৩৭ অব্দ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পরে (১৪৩১ শকাব্দের পরে) জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর, কানাই ঠাকুরের পুত্র মদনরায় ঠাকুর। এই মদনরায়ের পাঁচ পুত্র, যথা—

"জয় জয় মুকুন্দ দাস শ্রীনরহরি। জয় শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্পমাধুরী॥
জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাই। ত্রিভুবনে যাঁর বংশে তুলনা দিতে নাই॥
জয় শ্রীরায়ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ সর্ব্বগুণধাম॥"

(রসকল্পবল্লী।)

এই ভ্রাতৃপঞ্চকের অন্যতমের চারি পুত্র জন্মে—প্রথম জগদানন্দ, দ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ, তৃতীয় সর্ব্বানন্দ এবং চতুর্থ কৃষ্ণানন্দ। ইঁহাদিগের পিতা কোন বৈষয়িক কার্য্যবশতঃ শ্রীখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী আগরডিহি নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি তাঁহার ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত পৃথক্ হইয়া বীরভূমির অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীন জোকলাই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই জোকলাই গ্রামে জগদানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। এখানে প্রতি বর্ষের ভাদ্রশুক্লা দ্বাদশীতে জগদানন্দের তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে।

জগদানন্দের জন্মকাল সম্বন্ধে আমরা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তবে তিনি রঘুনন্দন ঠাকুরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র এবং বর্ত্তমান কালের তদ্বংশীয়গণের বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন

[illegible] করে, ক্রমত নহে।
[illegible]াকন করুন, তাহাতে অনায়াসে
[illegible]কদ্দমাতেই বা এদেশীয়েরা বেষ্টিত।
[illegible]রাং কাহার অন্তায় অধিক, বিবেচনা করিবেন। কয়েক দিন হইল একজন জাহাজাধ্যক্ষকে [illegible] এদেশীয় লোক, এমত প্রহার করিয়াছিলেন যে, সন্তরণ দ্বারা আপন প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, ইহা কি সংশয়কারী অবলোকন করেন না। কলিকাতার বাঙ্গালিরা সম-সমাধি-রূপে ইঙ্গরেজদের সহিত কারবার করিতেছেন, তাহার কারণ এই যে, অনেকানেক ইঙ্গরেজ, প্রতিদিন দেখিতে পায়, পল্লীগ্রামে ইঙ্গরেজ নাই।—ইঙ্গরেজ সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে এরূপ ভয় চিত্ত হইতে বহিষ্কৃত হইবেক। তাহা অপকার জন্ত নয়, গোরা আসিয়া কৃষিকর্ম্ম করিবেক; এরূপ অলীক বার্ত্তা কাহার নিকট শুনিয়াছেন। ও সকল গোরা কৃষকের প্রতিপালন ৩০।৪০ মুদ্রা ন্যূনে হইতে পারে না। আর প্রদেশীয় কৃষাণ, অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং গোরা কৃষাণ কেন আনিবেন? কোন নীলকর সাহেব, গোরা কৃষাণে কর্ম্ম করাইতেছেন। কলোনিজেসিয়ান্ দ্বারা উপকার এই যে, কৃষাণেরা অধিক মূল্য পাইবেক, অথচ শ্রমের অনেক খর্ব্বতা আছে। নানা কর্ম্মে শিক্ষিত হইবেক ও কর্ম্মের পারগতাতে পুরস্কার সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্যেই ইঙ্গরেজের কর্ম্ম করিতে সকলে ইচ্ছুক। অন্য পরে কা কথা? ইঙ্গরেজের মধ্যে চর্ম্মকারকের কর্ম্মেতেও নিযুক্ত হইতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন ও তৎপ্রসাদাৎ এক্ষণে নামলস্ক অক্লেশে হইয়াছেন। অধিক লিখিবার প্রয়োজন হয়, ভবিষ্যৎ লেখা যাইবেক।"*

১২৩৭ সালে (১৮৩১খৃষ্টাব্দে) "মোসলমানের শরারা† হিন্দুদের দোষের বিচার বা দণ্ড-বিধান"-নিবন্ধন এই "সংবাদ-কৌমুদীর" সম্পাদক ও কতিপয় পত্র-লেখক ইহাতে অনেক লেখালেখি করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

---

* সংবাদ-প্রভাকর, (১২৪৭ সাল), ২৪এ ফাল্গুন।

† "শরা" অর্থে "কোরাণের" অধ্যায়।

করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা অনেক। তবে তাহার একখানি পত্রে যে শব্দগুলি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহাই লিখিত হইল,—

"কৃষ্ণ, বিষ্ণু, তৃষ্ণ। দীন, খীন, চীন, হীন, মীন, পীন, ভীন, লীন। কাম, ধাম, গ্রাম, জাম, ঠাম, দাম, নাম, রাম, শ্যাম। কোক, টোক, লোক, শোক। খেদ, ছেদ, বেদ, ভেদ, স্বেদ। কঞ্জ, খঞ্জ, গঞ্জ, ভঞ্জ, রঞ্জ। কুঞ্জ, গুঞ্জ, জুঞ্জ, পুঞ্জ, ভুঞ্জ, মুঞ্জ। গঞ্জি, পঞ্জি, ভঞ্জি। ওর, কোর, গোর, ঘোর, চোর, ছোর, জোর, ঝোর, ঠোর, ডোর, তোর, থোর, ভোর, মোর, নোর, সোর, হোর। কীর, খীর, গীর, চীর, তীর, থীর, ধীর, নীর, পীর, ফীর, বীর, হীর। কেশ, বেশ, ঠেশ, দেশ, রেশ, লেশ, শেষ। তোষ, দোষ, পোষ, রোষ, শোষ। আশ, ত্রাশ, দাস, নাশ, পাশ, ফাশ, বাস, ভাষ, লাস, মাস, রাস, শ্বাস, হাস। খণ্ড, গণ্ড, চণ্ড, দণ্ড, ভণ্ড। অমল, বিমল, কমল, যুগল, চপল, টলল, তরল, ঘামল, ঘুমল, চুমল, ধুমল, ধমিল, ধোয়ল, বিরল, সরল, গরল, ঘেরল, হেরল, কষিল, ঘষিল, ধসিল, পসিল, রসিল, হসিল, মিলল, খলল, গলল, চলল, ছলল, জ্বলল, ঝলল, টলল, দলল, ফলল, বলল। কোল, গোল, চোল, ডোল, ঢোল, দোল, রোল, ভোল, মোল, লোল, বোল। কোপি, গোপি, রোপি, সোঁপি। গহন, দহন, বহন, সহন। অলক, ঝলক, তিলক, ভালক, পলক, ফলক, ললক, হলক। খুধা, সুধা, বিবুধা। কামিনী, গামিনী, জামিনী, দামিনী, ধামিনী, ভামিনী, ভামিনী, সামিনী। অঞ্জন, ঞ্জন, গঞ্জন, ভঞ্জন, রঞ্জন। অঞ্জল, গঞ্জল, ভঞ্জল, মঞ্জুল। কুঞ্জর, গুঞ্জর। গঞ্জিত, ভঞ্জিত, রঞ্জিত, সঞ্জিত। পঞ্জর, ঞ্জর, মঞ্জরী। গঞ্জক, ভঞ্জক, রঞ্জক। অঞ্চল, চঞ্চল, বঞ্চল, সঞ্চর, বঞ্চক, কঞ্চুক, পঞ্চক, চঞ্চুক, কাঞ্চন, বঞ্চন, সঞ্চয়, চঞ্চলা, বঞ্চিত, কুঞ্চিত, মুঞ্চিত, পিঞ্চ। বসুধাসুধাকর। পতিতকগতি। তাপিপতিত, কুমুদকুমুদপতি। গুণগণউদধি। রসিক-হৃদয়পয়োনিধি। ভকতক নয়ন-চকোর-সুধাকর। কুলবতি-নয়ন-চকোর-সুধাকর। কুলবতি-তৃষিত-নয়ন-মধুপাবলী-চুম্বিত-মুখ-অরবিন্দ। অরুণ, করুণ, তরুণ, বরুণ। প্রেম, হেম। বিগলিত, বিচলিত। মাধুরি, চাতুরী। কম্প, চম্পক, ঝম্প। অন্ত, অন্তিক, অন্তর, কান্ত, কান্তি, শ্রান্ত, শান্ত, সন্ততি, নিতান্ত। মন্ত্র, তন্ত্র। কুণ্ডল। আনন্দ, নন্দনন্দন। চন্দ্র, চন্দন, দ্বন্দ্ব, ধন্ধ, বন্দিত, নন্দিত, নিন্দিত, মন্দমন্দ, বৃন্দ, বৃন্দাবন, সুন্দর। কুন্দ, বিন্দুবিন্দু, কন্দ, কান্দে। অন্ধ, গন্ধ, ধন্ধ, বন্ধ, রন্ধ।"

খসড়ার অন্যান্য পত্রগুলিতে কোন স্থানে কবিতার এক চরণ, কোন স্থানে দুই চরণ, বা কোন পদের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি পত্রে এইরূপ পদের দুইটী করিয়া চরণ দেখা যায়—

"রুচি জিতল দামিনী, ব্রজকুলজ-কামিনী॥ চকিত মৃগলোচনী, নব যুবতিসঙ্গিনী॥
নিখিল দুখমোচনী, গুপত চলুঁ রঙ্গিণী। মদন মনোমোহিনী, মিলিত মধুভাষিণী॥
মদন-মনুহারিণী, মধুর মৃদুভাবিণী। নীলপটধারিণী, চরণ-মণিকিঙ্কিণী॥
চলনি গজগামিনী, মৃদুলতর ঝঙ্কিণী। মধুর মধুযামিনী, জিতল জগ-লাবণী॥
বরশবদ কামিনী, রণিত মণিকিঙ্কিণী।—"

অন্যত্র কোন কোন স্থানে পদের শেষ চরণ দুই চারিটী রচনা করিয়া রাখিয়াছেন তাহাও দেখিতে পাওয়া পাওয়া যায়,—

"তরল গুরু কদল তরু জিতল উরুরাজে।"

বোধ করি এটী কবির মনোনীত হয় নাই বলিয়া, ইহার পরেই এই পদাংশই অন্য প্রকার লিখিয়াছেন,—

"যুগল গুরু কদল তরু জিতল উরুরাজে। সুতনু তনু অতনু মনুমথন মনুহারী।"

ইহারও অন্য প্রকার আবার এইরূপ—

"অখিল মনুমথন মনুমথনমনুহারী। তরণিকর তরুণবর অরুণকরধারী।"

আর একখানি পত্রে কতকগুলি পদের কেবল শেষ চরণ লিখিত আছে—

"ভবনতেজি আবই রে। মধুর অধরে ধরি বাওই রে। পরিমল দশদিশে ধাবই রে। আকুল স্থললিত গাবই রে। আকুল কুল নাহি পাবই রে। মুরতি সঘন দরশাবই রে। জগদানন্দ চিতে ভাওই রে। মনমথ মন মুরছাবই রে। ভুরু ধনু সঘন ধুনাবইরে।"

এই প্রকার যে পত্রখানি পাঠ করা যায়, তাহাতেই জগদানন্দের নূতন নূতন পদের এক চরণ দুই চরণ বা চারি চরণই দেখিতে পাওয়া যায় এবং কোন কোন পত্রে পূর্ণ পদও পাওয়া যায়। একস্থানে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনের একটী পদ দেখিলাম তাহা সম্পূর্ণই আছে; পদটী এই—

"ইন্দীবর বর, গরভ গরবহর, রুচির কলেবর কাঁতি।
চাঁচর চিকুর চূড়পরি চঞ্চল মোর শিখণ্ডক পাঁতি॥
জয় জয় জয় বিরিন্দাবন চন্দ।
কুলবতিতৃষিত-নয়ন-মধুপাবলী-চুম্বিত-মুখ-অরবিন্দ॥ ধ্রু॥
উছলিত অলিক সঝম্পিত চুম্বনে কম্পই লম্বিত মাল।
অধর সুধাকণ মিলিত সমীরণে বাওই বেণু রসাল॥
ভাবিনী সরম-ভরম-ভয়-ভঞ্জন ভূষণে ভরু সব অঙ্গ।
জগদানন্দ চিতে নিতি পহুঁ বিহরতু ঐছন ললিত ত্রিভঙ্গ॥"

"এই পদটীর প্রথম চরণ ও অন্যান্য কোন কোন অংশ এই খসড়ার স্থান বিশেষে রূপান্তরে দৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় কবি প্রথম সেই রূপই বর্ণন করিয়াছিলেন, পরে পদ নিবন্ধনকালে। সেই অংশই আবার প্রকারান্তর করিয়া ইহাতে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

এই পদের প্রথম চরণটী প্রথম লিখিবার সময়ে "নব ইন্দীবর-উদর-গরবহর" এইরূপ লিখিয়াছিলেন, পরে যখন তাহা একটী পূর্ণ-পদরূপে লিখিয়া শেষ করিলেন তখন উহাতে—

"ইন্দীবর বর, গরভ-গরব-হর"

এইরূপ লিখিত হইল। জগদানন্দের খসড়ার বিষয়ে বলিবার অনেক কথা থাকিলেও আমারা অদ্য এই স্থানেই তাহার উপসংহার করিলাম।

এক্ষণে আমরা জগদানন্দের পদাবলীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

জগদানন্দের পদাবলী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, বাহ্যচিত্র, অন্তশ্চিত্র, অনুকৃত ও সাধারণ। একই বর্ণের অনুপ্রাসযুক্ত পদগুলি বাহ্যচিত্র নামে অভিহিত, ইহা কবির নিজের লেখা দৃষ্টে অনুমিত হয়। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"অথ বাহ্যচিত্র গীতং" তিরোথা ধানসী।

কিতব কেশব কুশল কি কহব কঞ্জলোচনী রাই।
কি জনি কতি খনে কব কি হোওব কহিতে আয়লুঁ ধাই॥
কুসুম কার্ম্মুক কোপে কাতর কেলিকুঞ্জে লোটাবই।
কুলকলঙ্কিনী কি কহু কা দেই কহিতে কিছুই না ভাওই॥
কান্তকাহিনী কহিতে কান্দই কহই ঐছন তোয়।
কুলজ কামিনী কুপথগামিনী কয়লি কী ফল মোয়॥
কঞ্জনয়নীক কণ্ঠে কেবল কেলি করত পরাণ।
কোরে করইতে কাঁপে কলেবর জগত আনন্দভাণ॥

এই পদটী কেবল "ক" বর্ণ দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে—

"খেম কি কহব খলখগেশ্বর খোয়লি এতদিনে ভাই।
খীন খঞ্জননয়নি খনে খনে খনিক নিরখহ নাই॥
খলিত দিঠিজলে খৌম ভীগল খোভ কোন মিটাবই।
খেদ কি কহব খিপত সমগতি খীর-নীর না খাবই॥
খসল কুন্তল খৌনি বিলুঠই পেখি ঐছন ভায়ই।
খসঞে খিতিতলে খীন শশি খসি পড়ি ধূলি লোটাবই॥
খোলি খরতর খরগ খঞ্জর মদন মারত ধাবই।
খণ্ডকপালিয়া খণ্ডবাসিয়া জগত-আনন্দ গাবই॥"

ইহা "খ" বর্ণ দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে। এইরূপ গ ও ঘ প্রভৃতি বর্ণ দ্বারা চিত্রিত পদাবলীও দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্য প্রকার যথা বিভাষ—

উদিতারুণ হসিত নলিন, মুদিত কুমুদ চাঁদ মলিন,
হতশায়ক দুখদায়ক রতিনায়ক ভাগে।
শীতল থলজলরুহদল, তড়িত জড়িত জলধরতুল,
মুখঝামর ধনি শ্যামর নিশিপ্রাতর ভাগে॥
বিগত বসন-ভূষণ সাজ, অচেতন রহু নিলজ-রাজ,
গিরিধারিম বহুগারিম, রহু কারিম দাগে।
বদন জিতল শরদ-ইন্দু, ছরম ঘরম বিন্দু বিন্দু,
নিশিজাগরি রসসাগরি বরনাগরি আগে॥

ফুকরত শুকসারিক বহু, কোকিল কুল কুহরই মুহু,
দেখ ভাবিনি গজগামিনি নহি কামিনি জাগে।
কহ সহচরি শ্রবণ ওর, পরিহর ধনি হরিক কোর,
কিএ দোষব তব তোষব যব রোষব রাগে॥
কি হেরসি হঁসি শয়ন রঙ্গ, বর নিরমল কুলকলঙ্ক,
যশধামিনি রুচিদামিনি কুলকামিনি লাগে।
সাজি কবরি ভূষণবাস, জগদানন্দ নবীন দাস,
কুরু চেতন সুনিকেতন চলু বেতন মাগে॥

তাঁহার কোন কোন কবিতায় "জগদানন্দ নবীন দাস" এইরূপ লিখিত আছে; ইহাতে বোধ হয় যে সেই সকল কবিতাই তিনি প্রথম রচনা করেন।

তথা—

"অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদ বদন,
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদ্মিনীক সদন সাজে।
কিঙ্কনি সজনি রজনী ভোর, ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর,
গতযামিনী জিত দামিনী কামিনীকুল লাজে॥
ফুকরত হত-শোক কোক, অব জাগব সবহুঁ লোক,
শুকশারীক পিক কাকলি নিধুবন ভরিও আজে।
গলিত ললিত বসন সাজ, মণিযুত বেণী ফণি বিরাজ,
উচ কোরক রুচি চোরক কুচ জোরক মাঝে॥
তড়িত জড়িত জলদ ভাঁতি, দুঁহু শুতি সুখে রহল মাতি,
জিনি ভাদর রস-বাদর পরমাদর শেজে।
বরজ কুলজ জলজ নয়নি, ঘুমল বিমল কমল বয়নি,
কৃত লালিস ভুজ বালিশ, আলিশ নাহি তেজে॥
টুটল কিএ ঘুণ ধনুগুণ, কিএ রতি রণে ভেল তুণ শূন,
সমর মাঝ পড়ল লাজ রতিপতি ভয়ে ভাজে।
বিপতি পড়ল যুবতিবৃন্দ, গুরুগণ অতি কহই মন্দ,
জগদানন্দ সরস বিরস রসবতী রসরাজে॥"

কবিবর জগদানন্দের বাহ্যচিত্রকাব্যের নমুনা দেখান হইল। ইহার পর অন্তশ্চিত্র কাব্য দেখান যাইতেছে।

আমরা দুইটী মাত্র অন্তশ্চিত্রপদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তাহাও ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য নহে। দুই এক স্থানের অর্থও সঙ্গত হয় না। তথাপি আমরা যেরূপ পদ দুইটী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই পাঠকমহোদয়গণ সমীপে উপস্থিত করিলাম।

"নর হ রি নাম অস্ত রে অছু ভাবহ হ বে ভবসাগ রে পার।
ধর রে শ্রবণে জীব হ রিনাম সাদ রে চিন্তামণি উ হ সার॥
যদি ক্ব তপাপী আদি রে কহ মন্ত্রক রা জ শ্রবণে ক রে পান।
শ্রীক্ব ষ্ণ চৈতন্য বল্যে হ য় সেহ দুর্গ ম পাপ তাপ স হ॥
কর হ গৌর গুরু বৈ ষ্ণ ব আশ্রয় ব হ নরহরি ম হার।
সংসা রে নাম লই স ক্ব ত হইয়া ত রে আপামর দু রা চার॥
ইথে ক্ব ত বিষয় তৃ ষ্ণ পহুঁ নাম হ রা ত্তি ধারণে শ্র ম তার।
কু তৃ ষ্ণ জগদানন্দ ক্ব ত কর্ম্ম দুস্থ ম তি রহল কা রা গার॥"

এই কবিতাটীর প্রতি পঙ্‌ক্তির তৃতীয়, নবম, পঞ্চদশ এবং একবিংশ বর্ণে চিত্র আছে। ইহা অবরোহ আরোহ ক্রমে পাঠ করিলে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই কলিযুগ-পাবন মন্ত্র পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় চিত্র।

ন বীন মি লনে ত মুধ রি তুহুঁ স পতি অ নেক কেলি।
র সিক আ সয়ে ন গণি ধ রম মা নিনী গা রিমা গেলি॥
হ সিত ব দনে ম ঞ্জুল্যে ল লনা প রব ন্দ কত করি।
রি তিঅ লি সম ন কর গ মন ন ন্দের ন ন্দন হরি॥
প্র ণত ব নিতা এ সব যু বতি তু লনা আ সিবে কিসে।
ভু লাঞা র মণী ক মল ন য়নী আ শাহ ত কল্যে শেষে॥
তু ষিয়া আ দরে ক তপ র কারে পা সর গ রব অন্ধ।
মি নতি কি কর রি তিনা চ লহ অ সুখী জ গদা নন্দ॥

এই পদ্যের প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম, ত্রয়োদশ ও ষোড়শবর্ণে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় অবরোহ আরোহ ক্রমে পাঠ করিলে—

"নর হরি প্রভু তুমি। কি আর বলিব আমি॥
তন মন এক করি। চরণ যুগল ধরি॥
সমাপন তুয়া পাঅ। জগত আনন্দ গাঅ॥"

এই কবিতাটী লাভ করা যায়। কবিতা দুইটীতে যে নরহরি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার দ্বারা কবির পূর্ব্ব পুরুষ নরহরি সরকার ঠাকুর এবং শ্রীগৌরাঙ্গ। নরহরি শব্দের অর্থ যে গৌরাঙ্গ, তাহা মুরারি গুপ্ত কৃত কড়চায় লিখিত আছে। ইহার পরে কবির অনুকৃত পদের কথা বলা যাইতেছে—

জগদানন্দ প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের অনুকরণ করিয়া যে সকল পদাবলী রচনা করেন, তাহাই অনুকৃত পদাবলী নামে অভিহিত। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবে শ্রীরাধিকার ভাব উল্লাসের একটী পদ আছে, এই পদটী সিংহভূপতির ভণিতাযুক্ত। কবিবর ঠিক এই পদের অনুরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভাব উল্লাসের একটী পদ রচনা করিয়াছিলেন, এই পদটীর ছন্দঃ, ভাষা, সুর ও বিষয় সবই একপ্রকার আদর্শপদের কিঞ্চিদংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"রে রে পরম প্রেম সজনি, নয়নগোচর কৌন দিন জনি,
নাহ নাগর গুণক আগোর কলাসাগর রে।
যবহুঁ পিয়া মঝু ভওনে আওব, দূরে রহি মুঝে কহি পাঠাওব,
সকল দুখন তেজি ভূখন সমক সাজব রে॥
লাজ নতি ভয়ে নিকট আওব, রসিক ব্রজপতি হিয়ে সান্তায়ব,
কাম কৌশল কোপ কারজ তবহুঁ রাজব রে।" ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত পদের অনুরূপ জগদানন্দের পদ—

"হোত মনহুঁ হুলাস সুলছন, বাম নিজভুজ উরজ ঘন ঘন,
ফুরই দূরসঞে প্রাণ পিউ কিএ অদূর আওব রে।
যবহুঁ পহুঁ পরদেশ তেজব, আগে নি লিখন সন্দেশ ভেজব,
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূখণ সবহুঁ ভাওব রে॥
ত্রিপথ গামিনী তীর পিউ যব, অচিরে আওব শুনত পাওব,
অলস তেজি কুচ কলস জোর অগোরি সাজব রে।
তবহিঁ হিয় মাহ হারপহিরব, বেণী ফণীমণি মালে বিরচব,
চলব জলছলে কলস লেই সব কলেশ ভাজব রে॥
নদীয়াপুর জয়তুর বাওব, হৃদয় তিমির সুদূর ধাওব,
ভকত নখতর মাঝ যব দ্বিজরাজ রাজব রে।
গৌর অঁগ যব আঁগন আওব, ঘুঁঘুঁট দেই তব নিকট যাওব,
দিঠি জলছলে কলধৌত পগ করি ধৌত মাজব রে॥
রঙণ শয়নক ভঙন পৈঠব, পীঠ দেই হসি পালটী বৈঠব,
কছু বিরস ভৈ কছু সরস দৈ দশদোথে দোখব রে।
পীন কুচ করকমলে পরশব, ক্ষীন তনু মঝু পুলকে পূরব,
ভাখি নহি নহি আঁখি মুদি রস রাখি রোখব রে॥
বাহগহি তব নাহ সাধব, সময় বুঝি হাম সব সমাধব,
সুধই সুধাময় অধর পিবি পিউ পুন পিয়াওব রে।
মীন কেতন সমরে চেতন' হীন হোওব নিশি নিকেতন,
অবিরোধ বিন অনরোধ পিউ পরবোধ পাওব রে॥

মিটব কি হিয় বিষাদ ছল ছল, নয়নে পহুঁ যব তবহিঁ কল কল,
নাদ সুখদ সম্বাদ এক ধনি ধাই লাওল রে।
নাহ আওল এতনি ভাখন, মৃত সঁজীবন শ্রবণে পিবি পুন,
জগত ভনজমু জীবন মৃততনু জীবন পাওল রে॥

গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণ যথা—

অভিসার।

অবিরত বাদর, বরিখত দরদর, বহই তরলতর বাত।
বিষধরনিকর ভরল পথ অরুকত অজর বজর বিনিপাত॥
হরি হরি কৈছে চলব কুহরাতি।
না বুঝত কণ্টক শঙ্কট বাটহি মার গোঙার বররাতি॥
যোপদ শরদ-কোকনদ দলহিঁ ধূলি পরশে সীতকার।
উচ নীচ কিচ বীচ অব সোপদ কৈছনে করব সঞ্চার॥
চলইতে চঙকি নগর পুর বাহির গুরু দুরুজন দুরবার।
গতি অতি গোপত বেকত ভয়ে ভাবিত জগদানন্দ নাচার॥

সাধারণ পদাবলী।

অভিসার।

মুঞ্জ বিকচ কুসুমপুঞ্জ, মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ, কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘন গঞ্জিত চিকুরপুঞ্জ, মালতি ফুলমালে রঞ্জ, অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জন-গতিহারী॥
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে ভঁরু অনঙ্গ, কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনোহারী।
নাচত যুগ-ভ্রূ-ভুজঙ্গ, কালী দমন-দমন রঙ্গ; সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীলশাড়ী॥
দশন কুন্দ-কুসুমনিন্দু, বদন জিতল শরদ ইন্দু, বিন্দু বিন্দু ছরম ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস, দেহ দীপিত তিমির নাশ, নিরখি রূপ রসিক ভূপ ভূলল গিরিধারী॥
অমরাবতী যুবতীবৃন্দ, হেরি হেরি পড়ল ধন্দ, মন্দ মন্দ হসনা নন্দ-নন্দন সুখকারী।
মণিমাণিক্য নথ বিরাজ, কনকনূপুর মধুর বাজ, জগদানন্দ স্থল-জল-রুহ চরণক বলিহারী॥

আমরা যথাসাধ্য জগদানন্দ ঠাকুরের জীবনচরিত ও তৎপ্রণীত পদাবলীর সঙ্কলন করিলাম। কিন্তু যে পরিমাণে তাঁহার জীবনীর উপাদান আমরা সঙ্কলন করিতে সমর্থ হই নাই, তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক পরিমাণে তাঁহার কবিত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্ব বড় সাধারণ নহে। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত হিতোপদেশসঙ্কলয়িতা বিষ্ণুশর্ম্মা মহোদয়ের মতে যে কাব্যশাস্ত্র-বিনোদনে ধীমান্‌গণের কাল সুখে কাটিয়া যায়, জগদানন্দের কাব্য তজ্জাতীয় কাব্যনিচয়ের মুকুটমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্ল্লভা।
কবিত্বং দুর্ল্লভং তত্র শক্তি স্তত্র সুদুর্ল্লভা॥

অশীতি কোটি জীবের মধ্যে নরজন্ম দুর্ল্লভ। বিদ্যার অবিদ্যমানে সেই নরজন্মও অকিঞ্চিৎকর। সহস্র সহস্র বিদ্বন্মনুষ্যের মধ্যে একটি কবি মিলে কি না সন্দেহ। আবার সহস্র সহস্র কবির মধ্যে একটি শক্তিমান্ কবি অধিকতর সুদুর্ল্লভ। এখন যে কবিত্ব চারিদিকে ছড়াছড়ি যাইতেছে। সঞ্চরমান ভূবায়ুর শিরোভাগে যে শক্তি অনুক্ষণ তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্ব ও শক্তি সে শ্রেণীর নহে। জগদানন্দের বাহ্যচিত্র, অন্তশ্চিত্র, অনুকৃত ও সাধারণ এই চারি শ্রেণীস্থ পদাবলীরই নিদর্শন উপরিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল পদাবলীতে যে কবিকুল-দুর্ল্লভ অত্যদ্ভুত কবিত্ব ও কবিলোকবিজয়িনী অসামান্যশক্তির পরিচয় আছে, কাব্যসমালোচক পণ্ডিতমাত্রই তাহা প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিবেন। কোন কোন সংস্কৃত কবি ও কোন কোন বঙ্গীয় কবি অন্তশ্চিত্রপদাবলী গ্রন্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে জগদানন্দের ন্যায় প্রচুরশক্তি প্রদর্শনে কেহই সমর্থ হন নাই। বাহ্যচিত্রাবলী প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু জগদানন্দের চিত্রপদের নিকট তাহাও অকিঞ্চিৎকর। অন্যান্য অন্তশ্চিত্র কবিতার চিত্রবর্ণাবলী দ্বারা দুই একটী শব্দ অধিকতঃ কবির নামেই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুললিত ছন্দো বন্ধের কবিতা এবং দ্বাত্রিংশদ্বর্ণাত্মক তারকব্রহ্ম নাম জগদানন্দের চিত্র গাথা ভিন্ন অন্যের চিত্র কবিতায় কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? কি কবিত্ব, কি ছন্দোলালিত্য, কি রচনা চাতুর্য্য, কি শব্দবিন্যাস, কি চিত্র, বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য। যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ও যে রসে ডুবিয়া মানুষ কিয়ৎকালের জন্য শোক তাপ ভুলিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর। যেমন প্রস্ফুটিত ও সৌরভময় গোলাপকে নাড়াচড়া করিতে ভয় করে; পাছে তাহার সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের হানি হয়, জগদানন্দের কবিতা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির তাদৃশ ভয় হইতেছে, এজন্য এই স্থলেই নীরব হইলাম।

উপসংহারে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। কোন কোন লেখক ও সমালোচক জগদানন্দের দুই একটী পদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস জগদানন্দের পদের সংখ্যা দুই চারিটীর অধিক নহে এবং কেহ ইহাকে মহাপ্রভুর পার্ষদ জগদানন্দ পণ্ডিত বলিয়াছেন, কেহ বা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশীয় রাধামোহন ঠাকুরের পিতা জগদানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার প্রথমাবস্থার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাইয়াছি এবং সেই পাণ্ডুলিপির "খণ্ডবাসিয়া খণ্ডকপালিয়া জগদানন্দ ভাষই" এই পদানুসারেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। তিনি যে কে এবং কোন বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এখন তাহা জানিতে শুনিতে কাহারই কষ্ট হইবে না।

শ্রীকালিদাস নাথ।

বাঙ্গালা পুথির বিবরণ।

দীঘাপতিয়া-রাজবংশীয় শ্রীমৎ কুমার শরৎকুমার রায় কএকখানি বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিয়া আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। পুথিগুলির পাতা বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকায় মিলাইতে কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। মিলাইয়া যে কএকখানি পুথি বাহির হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। দুঃখের বিষয় অনেকগুলি পুথি খণ্ডিত। যে পাতাগুলি নাই, তাহার উদ্ধারের আশাও অল্প। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা রক্ষাও উপযুক্ত বোধ করিয়া নিম্নের বিবরণ প্রকাশার্থ পাঠাইলাম।

১। রামায়ণ—কৃত্তিবাস প্রণীত আদিকাণ্ডের কিয়দংশ, প্রথম ১৫ পত্র মাত্র। শেষ পাতায় হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান চলিতেছে। তারিখ নাই। প্রচলিত কৃত্তিবাসের সহিত মিলাইবার অবকাশ ঘটে নাই। আরম্ভে বন্দনাদি পর কৃত্তিবাসের এইরূপ পরিচয় আছে—

পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে। জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর। নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর॥
পঞ্চভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী। অনেক পাত্র পড়্যা রবে শ্রীরামপাঁচালি॥
শুনিতে অমৃতধারা লোকেত প্রকাশ। ফুলিয়া[illegible] বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

২। রামায়ণ—অদ্ভুত আচার্য্যের রচিত। এই রামায়ণের চারিখানি পুথির কিয়দংশ করিয়া পাওয়া গিয়াছে। দুই খানিতে আদিকাণ্ডের আরম্ভ, তৃতীয় খানি উত্তরকাণ্ডের কিয়দংশ, চতুর্থ খানি উত্তরকাণ্ড প্রায় সম্পূর্ণ। ভণিতায় "অদ্ভুত আচার্য্যের কবিত্ব মধুর ভারতী" ইত্যাদি আছে। অদ্ভুত আচার্য্যের অন্য পরিচয়াদি কোথাও নাই। কোন পুথিরই তারিখ নাই। পুথির বয়স আনুমানিক দেড় শত বৎসর। কাগজের অবস্থা দেখিয়া এইরূপ অনুমান করিলাম।

একটা বিচ্ছিন্ন পত্রে রামায়ণ আরম্ভ হইয়া যেন গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে বোধ হইল। কিন্তু সেই কাণ্ডটা এই রামায়ণের অন্তর্গত কিনা এবং সেই গ্রন্থকর্ত্তা অদ্ভুত আচার্য্য কিনা স্থির করিতে পারিলাম না। নিম্নে সেই অংশ টুকু তুলিয়া দিলাম। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতম্।

ব্রহ্মার ভোগের বস্তু অমৃতের ভাণ্ড। অতি অনুপাম বাণী পোথা আইদ কাণ্ড।
দেবগণ সহ বন্দ শ্রীরামের চরণ। বামেত জানকী বন্দ দক্ষিণে লক্ষ্মণ।
কপিকুল সহ বন্দো পবননন্দন। জাহার হৃদয়ে প্রভু থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥
বাল্মিক মুনি বন্দো ত্রিভুবনের সার। জাহার প্রসাদে পোথা বুঝিল সংসার॥
প্রপিতামহ গুরু বন্দো জার আইদ খণ্ড। তাহার তনয় বন্দো নামেত প্রচণ্ড॥
তাহার তনয় বন্দো নামেত শ্রীনিবাস। গুণের সাগর তেহোঁ নারায়ণের দাস॥

তার পুত্র উপজিল মাণিক জঠরে। জন্মীল চারিপুত্র চারি সহোদরে॥
চারি সহোদর তারা পণ্ডিত গুণনিধি। ভারতপ্রসাদে পাই অপক্ষিত সিদ্ধি॥
আত্রাই কুলেত বাস বড়বড়িয়া গ্রাম। সুভক্ষণে জন্মিল পুত্র নিত্যানন্দ নাম॥
মহাপুরুষ জন্মিল জদি পৃথিবি মাঝার।—

ইহার পর সহসা "আজ্ঞাকারি কস্ত শ্রীরামকান্ত দাসস্ত প্রণাম সত কোটয়োকোটি নিবেদনঞ্চ মহাশয়ের" বলিয়া শেষ।

আর একটা পাতাতেও সম্ভবতঃ অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণ যেন আরম্ভ হইয়াছে, সেখানটা এইরূপ—

ওঁ নমো গণেশায়॥ রামং লক্ষ্মণং পূর্ব্বজং * * ॥
রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন। জে রাম স্মরণে হয় পাপ বিমোচন॥
রাম রাম বোল ভাই মুক্তি হওক পাপী। অন্তকালে উদ্ধারিতে রাম বিষ্ণুরূপী॥

* * * * *
* * * * *

রাম জন্মিতে ছিল সাটি সহস্র বৎসর। অনাগত রচিল বাল্মিক মুনিবর॥
বাল্মিকে রচিল কাব্য ভবিষ্যপুরাণ। লোক বুঝাইতে হইল সুস্ম বাখান॥
অদ্ভুত আচার্য্যের কবিত্ব [illegible] হাসয়। রচিলেন রামায়ণ শ্রীরামের জয়॥
বিষ্ণুর এক নাম চারিবেদের তুল্য। হেন সহস্র নাম রামনামের-ঘোষণা॥
মহামুনি জানিয়া কহিল সকল। রাম পরমব্রহ্ম কহিলা মহেশ্বর॥ ইত্যাদি।

উপরে যে চারি খণ্ড পুথির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার দুই খণ্ডে আদিকাণ্ডে রামবনবাসের উদ্যোগ-পর্য্যন্ত আছে। তৃতীয় খণ্ডে উত্তরকাণ্ডের ৪৭ পর্য্যন্ত (প্রথম পত্র নাই)। চতুর্থ খণ্ডে উত্তরকাণ্ড প্রায় সমগ্র ভাগ আছে। ইহার ৪ হইতে ১৭৬ পর্য্যন্ত পত্র বর্ত্তমান। প্রত্যেক পত্রের দুই পৃষ্ঠে লেখা। শ্লোকসংখ্যা প্রতি পত্রে প্রায় পঁচিশ। শেষ পাতায় লবকুশের যুদ্ধ চলিতেছে। সমগ্র উত্তরকাণ্ড প্রায় ২০০ পাতা ধরিলে শ্লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হয়। অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণে অন্যান্য কাণ্ড এইরূপ বৃহৎ হইলে সমগ্র গ্রন্থ প্রকাণ্ড কলেবর হইবার সম্ভব।*

---

* "অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ। উহার আদিকাণ্ডে ৫৮, অযোধ্যাকাণ্ডে ৯, অরণ্যকাণ্ডে ৯, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ১৪ পাতা, মোট ৩০৭ পাতা পাইয়াছি। প্রতিপাতে গড়ে ৬৬ শ্লোক আছে। সুতরাং শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০২৬২। গ্রন্থারম্ভে অদ্ভুতাচার্য্য এইরূপ আত্মপরিচয় লিখিয়াছেন—

"প্রপিতামহো বন্দ্যো জাহার খণ্ড। তাহার পুত্র উপজিল নামেত প্রচণ্ড।
তাহার তনয় হ'ল নামে শ্রীনিবাস। গুণ মহাশয় তেঁহো নারায়ণের দাস।
তাহে উপজিল পুত্র মাণিক প্রচারে। জন্মিল চারি পুত্র চারি সহোদরে।
চারি সহোদর পণ্ডিত গুণনিধি। ভারতীর প্রসাদে হইল অপক্ষিত সিদ্ধি।

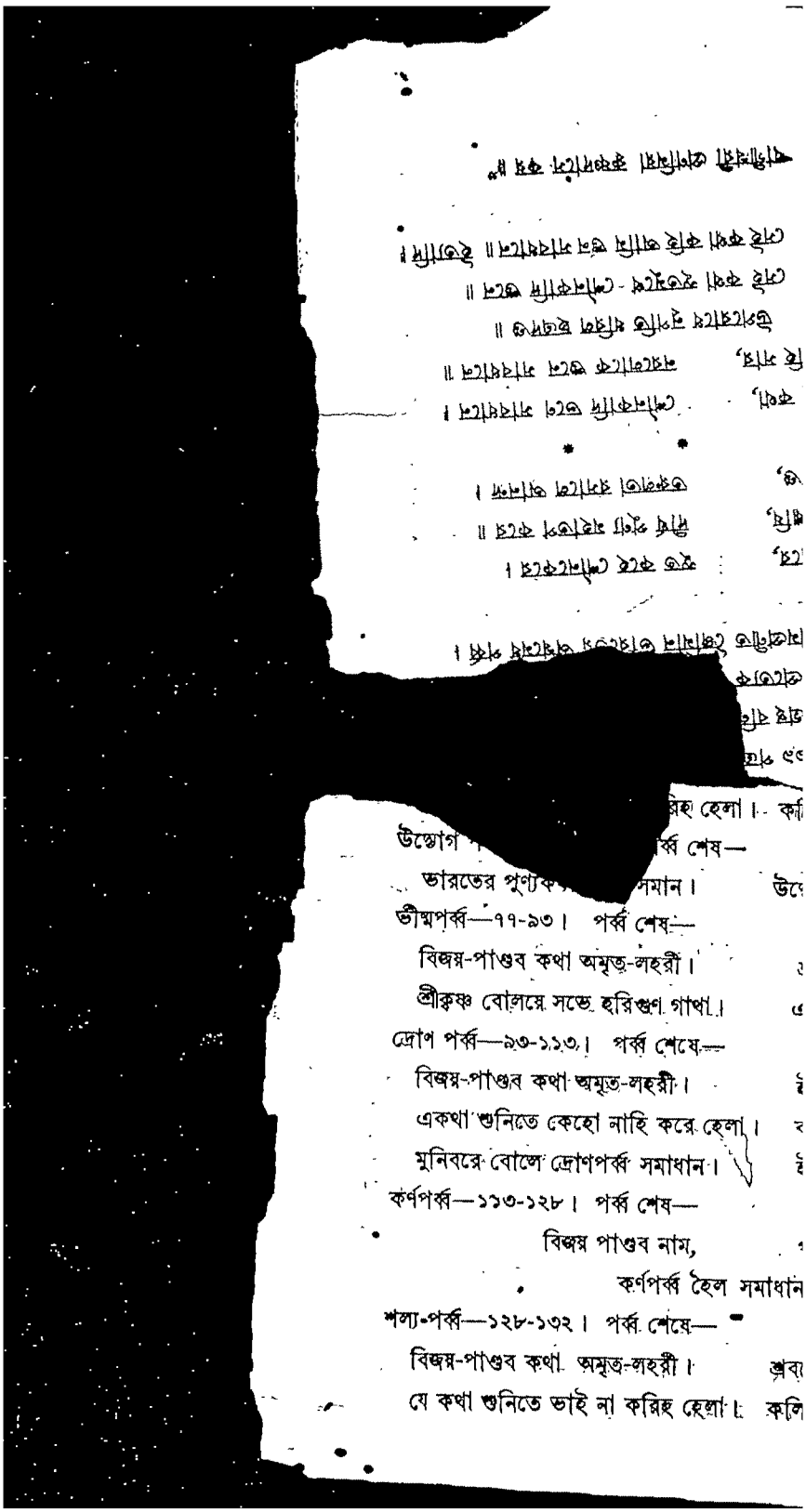

রহ হেলা। কলি

উদ্যোগ [illegible] র্ব্ব শেষ—

ভারতের পুণ্যক[illegible] সমান। উদ্যো

ভীষ্মপর্ব্ব—৭৭-৯৩। পর্ব্ব শেষ—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃত-লহরী।

শ্রীকৃষ্ণ বোলয়ে সভে হরিগুণ গাথা।

দ্রোণ পর্ব্ব—৯৩-১১৩। পর্ব্ব শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃত-লহরী।

একথা শুনিতে কেহো নাহি করে হেলা।

মুনিবরে বোলে দ্রোণপর্ব্ব সমাধান।

কর্ণপর্ব্ব—১১৩-১২৮। পর্ব্ব শেষ—

বিজয় পাণ্ডব নাম,

কর্ণপর্ব্ব হৈল সমাধান

শল্য-পর্ব্ব—১২৮-১৩২। পর্ব্ব শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃত-লহরী। শ্রবা

যে কথা শুনিতে ভাই না করিহ হেলা। কলি

নগরীস্থ শোভাবাজারের রাজবংশের আদিপুরুষ মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র রাজা বাহাদুরের আদেশে দ্বিজ রামচন্দ্র "মাধব-মালতী" গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা কালী-দুর ১৮০৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ অব্দে পরলোক গমন করেন; সুতরাং লতীর" কবি দ্বিজ রামচন্দ্রকে রাজা বাহাদুরের সমসাময়িক বলা যায়। তৎপরে উক্ত ার আরও একটু পরিচয় লউন,—

* * * * * *

াপনার পরিচয় দিতে কিছু হয়। সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি নিজ পরিচয়॥
ানাইঠাকুর বংশে গোপাল মুখটী। ইষ্ট নিষ্ঠ দাতা ধীর কিবা সে গরিটী॥
লিয়া বিখ্যাত কুল ভঙ্গি নিজে হন। সত্যপুত্র রামধন কুলঘাটি নন॥
াহার তনয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবি। ভাষায় রচিলা কত কবিত্ব সুচ্ছবি॥"

কয় ছত্র হইতে আমরা কবি সম্বন্ধে জানিতে পারিলাম যে গরিটীসমাজস্থ কানাই-বংশে গোপাল মুখোপাধ্যায় ফুলিয়ার মুখটী কুল ভাঙ্গিয়া "স্বকৃতভঙ্গ" হন। তাঁহার ন ঔরসে কবি রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সহোদরদিগের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, "দুর্গামঙ্গল" প্রণেতার সহিত "মাধব-মালতী" প্রণেতার [redacted] সাদৃশ্য হইতেছে। উভয়েই দ্বিজ, গরিটী সমাজস্থ মুখোপাধ্যায় বংশীয়। ম রামচন্দ্র, উভয়েই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, উভয়েরই পিতার নাম রামধন। প্রভেদের ঙ্গল"-প্রণেতার জন্মস্থান হরিনাভি গ্রামে; কিন্তু "মাধব-মালতীর" কবির জন্মস্থানের দ্দেশ নাই। হয়ত শেষ দশায় আর্থিক অসচ্ছলতার কারণ বিদ্যোৎসাহী রাজা কৃপায় কলিকাতায় কালাতিপাত করিতেন এবং সেই অবস্থায় "মাধব-মালতী" । এই কারণে "দুর্গামঙ্গল"-প্রণেতা দ্বিজ রামচন্দ্র কবি ও মাধব-মালতীর কবি দ্র যে একই ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

কবি জয়ানন্দের আর একটু পরিচয়।

গত বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকায় 'কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্য-মঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত পর, আমাদের কোন কোন সুহৃদ্ কবি জয়ানন্দ ও তাঁহার গ্রন্থের প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন মাসিক পত্রের লেখকও জয়ানন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপ আমাদিগের প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষও করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে বিচারবৈঠকে আমাদের দ করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সদুদ্দেশ্যেই নানাকথা ছেন, নহিলে হয়ত কবি জয়ানন্দ সম্বন্ধে আর আমাদের কোন কথা লিখিতে প্রবৃত্তিই হই

প্রাচীন বাঙ্গলা পুথির অনুসন্ধানের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিনই আম প্রাচীন বঙ্গীয় কবি ও কতশত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের সন্ধান পাইতেছি। পরিষৎ- ঐ সকল পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। তাহা হইতেই আম জয়ানন্দ রচিত আরও কএকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ব্য চরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি আরও কএকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মঙ্গল কেবল যে আমরাই পাইয়াছি, তাহা নহে, তাহা অপর স্থানেও আছে, তাহার পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিষ্ণুপুর অঞ্চল হইতে জয়ানন্দ-রচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের আর খানি অসম্পূর্ণ পুথি সংগ্রহ করিয়াছি এবং আমাদের কবি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে মান্যগণ্য ও পরিচিত ছিলেন, তাহারও কতক পরিচয় পাইয়াছি। অদ্য এই সম্ব সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিতে হইতেছে।

জয়ানন্দ আপনার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থানেই পরিচয় দিয়াছেন—

"গদাধর-পণ্ডিত-গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কিছু গীত প্রচরি॥"

এখন আমরা অপরাপর প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিতেছি, যে তিনি গদাধ তেরই শাখাভুক্ত ছিলেন। যথা—শ্রীযদুনাথদাস কৃত শাখানির্ণয়ামৃতে—

"বন্দে চৈতন্যদাসাখ্যং জয়ানন্দমহাশয়ম্।
প্রকাশিতো যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকঃ॥৫৭

সম্রাট শব্দের সাহি ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে ও ধর্ম্মদেবতার ধ্যানে

আদিপর্ব্ব—১৩—৩০০ পৃষ্ঠা। ইহার অর্থ কি?

বিজয়-পাণ্ডব কথা শুনের প্রশ্ন—

কহ বুঝাইয়া। কেমতে হইল নাদ সুমেরু ভেদিয়া॥
বিন্দু হইল ভুবন জুড়িয়া। কোন মত মুদ্রা হইল ভুবনেত মায়া॥

বিজয়-পাণ্ডব

* * * * *

মুনিবরে বেদ অজপা বলি কারে। এ সকল কথা জিজ্ঞাসি কহিবে॥

* * * কর্ম্মের সন্দর্ভ আসি জানিব কি মতে॥

গঙ্গা যমুনার ভেদ কেমতে জানিব। ত্রিবেণীর ঘাটে আসি কেমতে ভেদিব॥
কোথা বৈসে মনরাম (?) কোথা তার স্থিতি। কোথা বৈসে রতিশচী রহে কোথা হস্তী।

* * * * * *

তোমার বচনে নাথ অচলা ভকতি। চারিচন্দ্র ভেদ কথা কহ রঘুপতি॥
কেমন চন্দ্র জানিবেক গুরু সন্নিধানে। কেমন চন্দ্র রক্ষা করি রাখিআছে প্রাণে॥
মন চন্দ্র শরীরেত চন্দ্র বোলায় সাবধান। কেমন চন্দ্র আত্মনাথ করিয়াছে পান॥

ইত্যাদি।

যমুনা', ত্রিবেণীর ঘাট', 'চারি চন্দ্র ভেদ' প্রভৃতি শব্দের রহস্যাবৃত গূঢ় এমন কি অর্থ আছে। এই সকল অর্থের ঐতিহাসিক আলোচনা আবশ্যক।

তবর্ষের ইতিহাসের একটা প্রকাণ্ড পরিচ্ছেদ এই আলোচনা হইতে উদ্ঘাটিত হইবে। স্থখানির—এই জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। আশা করি বঙ্গীয়-সাহিত্য-ঙ্গালা দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে যে সকল সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রচলিত আছে, দ্ধারের ও প্রচারের ভার শীঘ্র গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের ইতিহাস-আবিষ্কারে সাহায্য স্বদেশের ইতিহাস না জানিলে স্বদেশের উদ্ধারের অন্য আশা নাই। আমরা যথেষ্ট হলায় কাটাইয়াছি। আর অবহেলার সময় নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মালতী" কথিত গ্রন্থসূচনা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, [illegible]

"মাধব-মালতীর" কবি রামচন্দ্র একই ব্যক্তি।

"মাধব-মালতীর" কবি দ্বিজ রামচন্দ্র উক্ত গ্রন্থসূচনায় স্বীয় পরিচয় দিতেছেন ;—

"মহারাজ নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী। তাঁহার বর্ণনা আমি কিরূপেতে করি॥
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব। সে সব বর্ণনা হবে নহে অসম্ভব॥
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন্ জন্ম। সেই মত তাবত ইহার দেখি কর্ম্ম॥
তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ। সভাস্থলে কিবা কব নিজে বিদ্যারূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ। তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত
মহাকবি বাণেশ্বর ভূদেব শঙ্কর। বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিশুরাম পসতুরে সাথ কৃপারাম। শান্তিপুরে বাস গোসাঞি ভট্টাচার্য্য না
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ। আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥
মান্তের কি কব যার উজিরত্ব পদ। হুকুম আছিল যার করিবারে বধ॥
বিলাতের বাদসাহ করিল সম্মান। গবর্ণরের ঘরে জিনি সদা চৌকি পান॥
অধিকার হাতে গড় গঙ্গমাণ্ডলাদি। হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী॥
রূপেতে তুলনা নাই মানে গোষ্ঠীপতি। মুখ্য বিনা কর্ম্ম নাই তাঁহার সন্ততি॥
তাঁর পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ। কি কব তাঁহার গুণ ন শ্রুত ন দৃষ্ট॥
পিতা তুল্য মান্তবান্ তাবৎ কর্ম্মেতে। বিশেষ তাঁহার গুণ দয়ার ধর্ম্মেতে॥
দেবীবর বল্লালের যেবা ছিল ঘাটি। কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটী॥
তাঁর পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম। নবীন প্রবীণ যিনি সর্ব্বগুণধাম॥
আদ্যাশক্তি কমলার কবিত্ব বিশেষ। কবি রামচন্দ্র প্রতি করিলা আদেশ।

(গ্রন্থসূচনার শেষাংশ এইরূপ) ঃ—

"আছয়ে অর্থের ক্লেশ, পশ্চাতে ছাপিব শেষ, চন্দ্র কহে কর অবধান॥"

এই কএক ছত্রে পাঠক! গ্রন্থকর্ত্তার জীবিত কালের নিরূপণ হইতেছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণদাসের স্বরূপ-বর্ণন মধ্যেও জয়ানন্দের পি[redacted] মিশ্রের উল্লেখ আছে—

"চিক্কণ সুবলদেহ নামে সুবলিতা।
তাঁর স্বরূপ সুবুদ্ধিমিশ্র সুবিখ্যাতা॥"

(স্বরূপবর্ণন)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ

বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা।
মহাভাব-চমৎকার-গৌরভাব-কলেবরম্ ॥"৫৮*

বঙ্গবর যদুনাথ, জয়ানন্দ ও তাঁহার বিরচিত "শ্রীচৈতন্যবিলাস" নামক গ্রন্থের উল্লেখ

এই শ্রীচৈতন্যবিলাস-রচয়িতা জয়ানন্দ ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ উভয়ে ক্তি, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। আমাদের সংগৃহীত র চৈতন্যমঙ্গলের দুইখানি পুথিতে চৈতন্যমঙ্গলের পরিবর্ত্তে "চৈতন্য-প্রেমবিলাস" বিলাস" নামই লেখা আছে। এইরূপ সুপ্রসিদ্ধ যদুনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃতও ংগৃহীত একখানি আড়াই শত বর্ষের প্রাচীন পুথিতে 'গোবিন্দবিলাস' নামেই পরি-ত। এরূপ স্থলে শ্রীচৈতন্যবিলাস ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এই উভয় গ্রন্থই যেমন একই ; যদুনাথ-দাস বর্ণিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত জয়ানন্দ ও আমাদের প্রকাশিত বিবৃত গদাধর-আদিষ্ট জয়ানন্দ উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে, আপত্তি নাই।

র্ব আমরা জয়ানন্দের এক আত্মীয় ইন্দ্রিয়ানন্দ-কবীন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছি ‡। হইতে সংগৃহীত আর একখানি প্রাচীন শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পুথিতে 'ইন্দ্রিয়ানন্দ' নন্দ' পাঠ দেখিতেছি। এই হৃদয়ানন্দ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়; কারণ রাঢ়া-ংগৃহীত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকার মধ্যেও জয়ানন্দের পরমাত্মীয় বাণীনাথের পরে হৃদয়ানন্দ নামে বন্দ্যঘটীয় এক ব্যক্তির কুলপরিচয় আছে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল জানিয়াছি, এই বাণীনাথ ও জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধিমিশ্র একবংশজাত §। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতের মূল শাখাবর্ণনার মধ্যে সুবুদ্ধি মিশ্র ও একত্র উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক মধ্যে শ্রীযদুনাথ জয়ানন্দের ানন্দের পরিচয় দিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস তিনিই জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ও

াথ দাসের শাখানির্ণয়ামৃতের প্রায় শতাধিক বর্ষের একখানি প্রাচীন পুথি আমরা সংগ্রহ নিত্যানন্দদায়িনী মাসিকপত্রিকার ২য় খণ্ডে (১২৮০ সালে) ২৵০ পৃষ্ঠাতেও উপরোক্ত উদ্ধৃত হইয়াছে।

। পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৪ সাল, ৩১১ পৃষ্ঠা দেখ।

§ পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৪, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

জাতীয় ইতিহাসে ইঁহার বিস্তৃত বংশ-তালিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।